ইতিহাস

নবপর্যায়

খণ্ড ৭ সংখ্যা ১ ঃ ১৩৭৯ বৈশাখ-আষাঢ়

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমলেন্দু দে শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত শ্রীশোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটী

৩৩১ আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩.০০
বার্ষিক চাঁদা ১০.০০
রেজেষ্ট্রী ডাকযোগে ১৪.০০
ছাত্র সদস্য ৬.০০

মুদ্রক
শ্রীনলিন রায়
অটো-প্রিণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৬

ইতিহাস

সপ্তম খণ্ড ॥ প্রথম সংখ্যা
বৈশাখ-আষাঢ় ॥ ১৩৭৯

সূচীপত্র

স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের জনশিক্ষানীতি ॥ শীলা পুরকায়স্থ ১
কয়েকটি অপ্রকাশিত বাংলা পুঁথির বিবরণ ॥ বিনোদশঙ্কর দাশ ১৩
মহারাজা চন্দুলাল ॥ ননীগোপাল চৌধুরী ২০
কেশব-সহচারী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ॥ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও
দেবজ্যোতি দাশ ৩১
মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : পর্যালোচনা ॥ অনিরুদ্ধ রায় ৪৭
রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৫৯
পুস্তক-পরিচয় ॥ নিশীথরঞ্জন রায় ৭০
উনবিংশ শতকে বাংলার চৌকিদারী প্রথা ও ভূমাধিকারি সভা ॥
বিনয়ভূষণ রায় ৭১

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি সব ঘরে ঘরে।
রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে॥
সঞ্চয়ের পন্থা ইহা জানিবে সকলে।
অসময়ে উপকার পাবে এর ফলে॥

॥ ব্রতকথা ॥

টাকা জমানোর পথও একটাই -- একমুঠো চালের মত, নিয়মিত যত টাকা সম্ভব ইউবিআইতে রাখা। ইউবিআইতে আপনার সঞ্চয় সংসারে চিরকাল লক্ষ্মীশ্রী বজায় রাখবে। ইউবিআইতে টাকাটা নিরাপদ থাকবে, সুদে বাড়বে আর তোলাও বেশ সুবিধেজনক।

ইউবিআই আপনার শুভার্থী প্রতিবেশী।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

(ভারত সরকারের একটি সংস্থা)

ইতিহাস

নবপর্যায়

খণ্ড ৭ সংখ্যা ২ ॥ ১৩৭৯ শ্রাবণ-আশ্বিন

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমলেন্দু দে শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত শ্রীশোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩.০০
বার্ষিক চাঁদা ১০.০০
রেজেস্ট্রী ডাকযোগে ১৪.০০
ছাত্র সদস্য ৬.০০

মুদ্রক
শ্রীনলিন রায়
অটো-প্রিণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৬

ইতিহাস
সপ্তম খণ্ড ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন ॥ ১৩৭১

সূচীপত্র

যোগেশচন্দ্র বাগল ॥ গৌতম নিয়োগী ৮১
বিশপ উইলসন : নদীয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার ॥ রাধাবল্লভ সাহা ১০২
কেশব-সহচারী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল ॥ সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দেবজ্যোতি দাশ ১১৩
স্মৃতিকথা ॥ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১২৯
পুস্তক-পরিচয় ॥ রমেশচন্দ্র মজুমদার বিনয়ভূষণ রায় ॥ নিখিলেশ গুহ ১৪৭

With the compliments of

Metal Box

ইতিহাস

নবপর্যায়

খণ্ড ৭ সংখ্যা ৩ ॥ ১৩৭৯ কার্তিক-পৌষ

সম্পাদক

শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমলেন্দু দে শ্রীদেবজ্যোতি দাশ

শ্রীঅরুণকুমার দাশগুপ্ত শ্রীশোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি

৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩.০০
বার্ষিক চাঁদা ১০.০০
রেজেস্ট্রী ডাকযোগে ১৪.০০
ছাত্র সদস্য ৬.০০

মুদ্রক
শ্রীনলিন রায়
অটো-প্রিণ্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৬

ইতিহাস
সপ্তম খণ্ড ॥ তৃতীয় সংখ্যা
কার্তিক-পৌষ ॥ ১৩৭৯

সূচীপত্র

রাজা রাধাকান্ত দেব । ভবতোষ দত্ত ১৫৭

অক্ষয় দত্ত ও উনবিংশ শতকের বাংলার ধর্মচিন্তা । প্রসিত ভট্টাচার্য ১৭৬

স্মৃতিকথা ॥ রমেশচন্দ্র মজুমদার ১৯৪

বাংলার নব জাগরণ : কয়েকটি প্রশ্ন । অমলেন্দু দে ২১৭

ইতিহাস

নবপর্যায়

খণ্ড ৭ সংখ্যা ৪ । ১৩৭৯ মাঘ-চৈত্র

সম্পাদক

শ্রীহরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

শ্রীঅমলেশ ত্রিপাঠী

সহকারী সম্পাদক

শ্রীঅমলেন্দু দে শ্রীজ্যোতিঃ ঘোষ

শ্রীঅরুণকুমার গাঙ্গুলী শ্রীশোভন বসু

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটী

৩৫।১ আমহার্স্ট ষ্ট্রীট

কলিকাতা ৯

প্রকাশক
শ্রীসোমেন্দ্রচন্দ্র নন্দী
৩০২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা ৯

মূল্য প্রতি সংখ্যা ৩.০০
বার্ষিক চাঁদা ১০.০০
রেজেস্ট্রী ডাকযোগে ১৪.০০
ছাত্র সদস্য ৬.০০

মুদ্রক
শ্রীনলিন রায়
অটো-প্রিন্ট অ্যাণ্ড পাবলিসিটি হাউস
৪৯ বলদেওপাড়া রোড
কলিকাতা ৬

ইতিহাস সপ্তম খণ্ড ॥ চতুর্থ সংখ্যা
মাঘ-চৈত্র ॥ ১৩৭৯

সূচীপত্র

স্মৃতিকথা ॥ রমেশচন্দ্র মজুমদার ২৩৭
অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসন পদ্ধতির স্বরূপ ॥ শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকার ২৪৭
'ইক্‌মিক্‌ কুকার' প্রসঙ্গে ॥ সুবীর রায় চৌধুরী ২৭১
তিব্বত-বাণিজ্যনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহার ও ভুটান ॥ অরবিন্দ দেব ২৮৯
পটুয়া সমাজের রেখাচিত্র এবং ইসলামীকরণ সম্পর্কে একটি অনুমান ॥
বিনয় ভট্টাচার্য ২৯৮

গ্রন্থ সমালোচনা :
সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং ॥ শঙ্করী প্রসাদ বসু, জয়শ্রী প্রকাশন ৩১৩

ইতিহাস

৭ম খণ্ড | বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৯ | ১ম সংখ্যা

স্যার জর্জ ক্যাম্পবেলের জনশিক্ষানীতি

শীলা পুরকায়স্থ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত তথা বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত হচ্ছিল। বেন্টিঙ্কের শিক্ষানীতি ভারত সরকারের আর তেমন গ্রহণযোগ্য বোধ হচ্ছিল না। ভারত সরকার প্রচলিত শিক্ষানীতির আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে জনশিক্ষানীতির উপর গুরুত্ব অর্পণ করতে পুনঃ পুনঃ বাংলা সরকারকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন।[১] শিক্ষাক্ষেত্রের এরূপ পরিস্থিতিতে ১৭৭১ সালের ১লা মার্চ ক্যাম্পবেল বাংলার পঞ্চম লেফটেনাণ্ট গভর্ণর রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি প্রায় চার বৎসর কলকাতার উচ্চ আদালতে বিচারপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন।[২] সম্ভবতঃ সেই সময়েই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশার মূল কারণ হচ্ছে নিরক্ষরতা এবং সেইজন্যই পরবর্তী জীবনে অনুন্নত শ্রেণীর মানুষকে 'বুদ্ধিমান মানুষে' পরিণত করাই তাঁর কাম্য হয়। গ্রাম-বাংলার উপেক্ষিত সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা তাঁর অন্তরে গভীর রেখাপাত করেছিল।

প্রাথমিক শিক্ষাকে ক্যাম্পবেলই সর্বপ্রথম 'জনশিক্ষা' নামে অভিহিত করেন,[৩] যদিও সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পরিকল্পনাটি সর্বপ্রথম লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক উত্থাপিত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ১০১টি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে বিদ্যালয়গুলি অল্পকালের মধ্যেই বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডেসপ্যাচের মাধ্যমে কোর্ট অব ডাইরেকটার্স স্বীকার

করেন যে, জনশিক্ষা বিস্তারকল্পে বাংলাদেশে বিশেষ কিছুই করা হয়নি, এই কারণে অনুন্নত শ্রেণীর জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্যে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য তাঁরা বাংলা সরকারকে নির্দেশ দিলেন।[৩] সেইজন্যই জনগণের মধ্যে শিক্ষাদানের প্রয়াস ১৮৫৪ সালের পর থেকেই শুরু হয়েছিল।

১৮৫৫ থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির প্রচলন করা হয়। তার মধ্যে ১৮৫৬ সালের 'সারকেল সিস্‌টেমই' সর্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই পদ্ধতিতে একজন যোগ্য শিক্ষকের অধীনে চার অথবা পাঁচটি পাঠশালা স্থাপন করা হত। ঐ শিক্ষক তাঁর অধীনস্থ পাঠশালায় পালাক্রমে শিক্ষা দেওয়া ছাড়াও পাঠশালা পরিচালনায় গ্রাম্য শিক্ষককে সহায়তা করতেন। ১৮৫৯ সালের ডেস-প্যাচে এই পদ্ধতিটির প্রতিই বিশেষ সমর্থন লক্ষ্য করা গিয়েছিল। এই ডেসপ্যাচের একটি প্রত্যক্ষ ফল হিসাবে বাংলাদেশে দেখা দেয় 'নরম্যাল স্কুল সিস্‌টেম' নামে এক নতুন পদ্ধতি এই পদ্ধতি অনুসারে যে সকল গ্রামে পাঠশালা আছে বা যাদের পাঠশালা স্থাপনের ইচ্ছা আছে, তাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হত গ্রামের বর্তমান গুরু-মহাশয়কে অথবা ভবিষ্যতের জন্য মনোনীত কোন শিক্ষককে নরম্যাল স্কুলে এক বৎসরের প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাতে। গ্রামের মনোনীত ব্যক্তি যদি ইন্সপেক্টারদের অনুমোদন লাভ করতেন, তবে তাঁকে মাসিক পাঁচ টাকা বৃত্তি দেওয়া হত এবং একটি লিখিত চুক্তি অনুসারে একদিকে গ্রামের প্রধানকে এই মর্মে অঙ্গীকার করতে হত যে তাঁরা এই বৃত্তিধারী ব্যক্তিকে এক বৎসরের প্রশিক্ষণ অন্তে উপযুক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর তাঁদের গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষক হিসাবে গ্রহণ করবেন, অন্যদিকে বৃত্তিধারী ব্যক্তিকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হত যে, তিনি প্রশিক্ষণ অন্তে যে গ্রাম তাঁকে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠিয়েছে সেখানে প্রত্যাবর্তন করবেন ও নিজের সাধ্যমত সেই গ্রামে শিক্ষাদান করবেন।[৪]

প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের ব্যয়ের পরিমাণও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয় লেফটেনাণ্ট গভর্নর স্যার পিটার গ্রাণ্ট ১৮৫৯ সালে গ্রামের বিদ্যালয়-গুলিকে আর্থিক সাহায্যদানের পরিবর্তে সরকারী তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শনের অধীনে নিয়ে আসার এক পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত অর্থের অভাবে তাঁর সেই চেষ্টা সফল হয়নি।[৫] ১৮৬৭ সালে ভারত সরকার পাঠশালা পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত অর্থ মঞ্জুর করতে অস্বীকৃত হন।[৬] ১৮৬৮ সালে ভাইসরয় লর্ড লায়েল বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রের শোচনীয় দুর্দশা দূর করবার উদ্দেশ্যে জমিদারদের উপর শিক্ষাকর ধার্য করার নির্দেশ দেন, কিন্তু জমিদারগণ রাস্তাঘাটের সুবিধার্থে

কর দিতে সম্মত হলেও শিক্ষাকর প্রদান করতে সম্মত হননি। তদানীন্তন বাংলা সরকারও সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি অপেক্ষা বৈষয়িক উন্নতির উপর অধিকতর গুরুত্ব দিতেন।[৮]

জর্জ ক্যাম্পবেল কর্মভার গ্রহণ করে পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুকরণ না করে সম্পূর্ণ ভিন্ন নীতির সূচনা করেছিলেন। তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনায় জনশিক্ষার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ক্যাম্পবেলের পূর্বে শিক্ষাখাতে বরাদ্দ অর্থের অধিকাংশই ব্যয় করা হত উচ্চ-শিক্ষার জন্য ; প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অঙ্ক ছিল নিতান্তই নগণ্য। কিন্তু বাংলাদেশের ৬৫ লক্ষ লোকের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে যে বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল, তা সরবরাহ করার মত কোন পৌর কিংবা স্থানীয় তহবিল তখন ছিল না। কাজেই ক্যাম্পবেলের শিক্ষানীতির সার্থক প্রয়োগের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল আর্থিক সমস্যা।[৯] অবশেষে ভারত সরকারই এই সঙ্কট মোচনে এগিয়ে এলেন। ১৮৭১ সালে প্রাথমিক শিক্ষাবিষয়ক এক প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত সরকার ঘোষণা করলেন যে, সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল যারা নিজব্যয়ে শিক্ষাগ্রহণে অসমর্থ তাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সংস্থান করা। এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হল যে, সরকারী তহবিলের উপর জনশিক্ষা সম্প্রসারণের দাবিই সর্বাধিক। আরও বলা হল যে, যদিও স্থায়ী কর স্থাপনার দ্বারাই প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয়নির্বাহের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, তবুও সরকারী তহবিল থেকেও আর্থিক সাহায্যদান অব্যাহত রাখা উচিত। এই প্রস্তাবে এটা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা হয় যে, প্রাথমিক শিক্ষাখাতে ব্যয় বৃদ্ধি করার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রাদেশিক সরকারের আছে। এই ব্যয়বৃদ্ধি অন্য বিভাগে ব্যয়সঙ্কোচন দ্বারা অথবা শিক্ষাবিভাগের অন্যান্য শাখায় আর্থিক সঞ্চয় দ্বারা মেটানো যেতে পারে।[১০]

১৮৭০ সালে ভারত সরকারের প্রবর্তিত বিকেন্দ্রীকরণের নীতি হিসাবে শিক্ষা প্রাদেশিক বিষয়রূপে গৃহীত হয়েছিল। কিন্তু কতকগুলি বিষয়, যেমন বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পর্কিত আইন প্রণয়নের অধিকার পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী শুধুমাত্র ভারত সরকারের হাতেই ছিল। তাছাড়া সামগ্রিক ভাবে তদারকি করার অধিকার ভারত সরকারের উপর ন্যস্ত থাকাতে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি অনুমোদন করার অধিকারও কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল। অধিকন্তু শিক্ষার জন্য বরাদ্দ অর্থ ছাড়া প্রাদেশিক সরকার অন্যান্য ক্ষেত্র থেকেও রাজস্ব সংগ্রহ করার অধিকারী ছিলেন।[১১] সেই নীতি অনুযায়ী ক্যাম্পবেলের বাংলায় কার্যভার গ্রহণের সময়েই 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল

ফাণ্ড নামে একটি সরকারী তহবিল গঠিত হয়েছিল। ১৮৭২ সালে ক্যাম্পবেল এই তহবিলের সাহায্যেই প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।[১২]

১৮৭১ সালের আগষ্ট মাসে ভারতসচিব এক ডেস্পাচের মাধ্যমে ঘোষণা করলেন যে, তিনি বাংলার জনগণের শিক্ষাব্যবস্থা লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের বিবেচনাভার উপরেই ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক।[১৩] সেই অনুযায়ী ক্যাম্পবেলের উপরেই শিক্ষার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আসে। ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে তিনি শিক্ষাবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ দুটি প্রস্তাবনা করেন। একটির দ্বারা তিনি শিক্ষাবিভাগের কাঠামোতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আনয়ন করেন এবং অপরটির দ্বারা প্রাদেশিক সরকার থেকে চার লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে মঞ্জুর করেন।

ক্যাম্পবেল শিক্ষাবিভাগকে কেবলমাত্র ডাইরেক্টারের অধীনস্থ না রেখে প্রত্যেক জেলার শিক্ষার দায়িত্ব জেলা কর্তৃপক্ষের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। ডাইরেক্টারের ক্ষমতাকে বহুলাংশে কমিয়ে "একজন কেরানীর সমপর্যায়ভুক্ত" করেছিলেন। তাঁর নতুন ব্যবস্থার সমর্থনে তিনি এই যুক্তি পেশ করেছিলেন যে, জেলা ও মহকুমা শাসক নিজ নিজ এলাকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত এবং স্থানীয় সমস্যাবলীর সঙ্গে ডাইরেক্টার অপেক্ষা অধিকতর পরিচিত। ক্যাম্পবেলের যুক্তি অনস্বীকার্য। কিন্তু এটা সুস্পষ্ট যে, ডাইরেক্টারের পদমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে তিনি ১৮৫৪ সালের ডেসপ্যাচের শর্তকে লঙ্ঘন করেছিলেন।[১৪]

ক্যাম্পবেল তাঁর শিক্ষানীতির সার্থক প্রয়োগের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছিলেন। জেলা ও মহকুমা শাসককে শিক্ষাবিষয়ক কার্যে সহায়তা করার জন্য প্রতি জেলায় একটি "ডিস্ট্রিক্ট স্কুল কমিটি" স্থাপন করেন। সরকারী বিদ্যালয়গুলিকেও এই জেলা স্কুল কমিটির তত্ত্বাবধানে আনা হয়। জেলা-শাসকদের হাতে শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। পুরাতন বিদ্যালয়গুলির সংস্কার ও উন্নয়ন, বিদ্যালয়ের মাসিক সাহায্যদানের পরিমাণ ও শিক্ষকভাতা নির্দ্ধারণ, সরকারী সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিত্তশালী ব্যক্তিদের নিজগ্রামে নতুন শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত করা প্রভৃতি ছিল জেলাশাসকের কর্তব্য।

ক্যাম্পবেল ১৮৭৩ সালের ৭ই জানুয়ারি এক আদেশ দিয়েছিলেন যে, সরকারী ও সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনকার্য ডেপুটি ইন্সপেকটার ও সাব-ইন্সপেকটার দ্বারা সম্পন্ন হবে।[১৫] এর জন্য প্রতি জেলায় একজন উচ্চস্তরের

ডেপুটি ইন্সপেকটার নিয়োগ করা হয়েছিল এবং সাব-ইন্সপেকটারদের হাতে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের ভার অর্পণ করা হয়েছিল।[১৬] প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ত্রৈমাসিক রিপোর্টগুলি ইন্সপেকটারের কাছে পাঠান হত। ক্যাম্পবেল স্কুল ইন্সপেকটারদের কাজের গুরুত্ব অনেকাংশে কমিয়ে দিয়েছিলেন, যদিও তাঁরা জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় জেলাশাসক অথবা অন্য সরকারী কর্মচারী অপেক্ষা কোন অংশেই নিকৃষ্ট ছিলেন না। এই বিষয়েও ক্যাম্পবেল ১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডেস্‌প্যাচের উদ্দেশ্যবিরোধী কাজ করেছিলেন বলা যেতে পারে।

ক্যাম্পবেল তাঁর নীতিকে দোষমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। জেলা স্কুল কমিটি স্থাপন করে জেলাশাসকের শিক্ষাসংক্রান্ত কার্যকলাপ কিছু পরিমাণে কমিটির নিয়ন্ত্রণাধীন করেন। ডেপুটি ইন্সপেক্টারগণ জেলাশাসকের সম্পূর্ণ অধীন ছিলেন এবং নিজ জেলার শিক্ষাবিভাগের প্রকৃত দায়িত্ব তাঁর উপরেই ন্যস্ত করা হয়েছিল। পরিদর্শন ছাড়া শিক্ষকদের বেতন, বিদ্যালয়ের হিসাবপরীক্ষা এবং জেলাশাসকের অনুমতিসাপেক্ষে বিদ্যালয়ের জন্য অর্থ মঞ্জুর করা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ছিল তাঁর উপর। কিন্তু ডেপুটি ইন্সপেক্টারগণের কাজের পরিমাণ ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পেলেও তাদের আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়নি।[১৭] ক্যাম্পবেল নবনিযুক্ত ডেপুটি ইন্সপেক্টারের মাহিনা ৮০৲ টাকা মাত্র স্থির করেছিলেন এবং সাব-ইন্সপেক্টারের মাহিনা ৩০৲ টাকা স্থির করা হয়েছিল।[১৮]

ক্যাম্পবেলের নতুন শিক্ষাবিভাগীয় নীতি সর্বত্র সমাদৃত হয়নি। সমসাময়িক পত্রপত্রিকাগুলি তাঁর শিক্ষানীতির তীব্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। তিনি ডাইরেকটার-অফ-পাবলিক-ইন্সট্রাকশন মিঃ এটকিনসনের উপর থেকে জনগণের শিক্ষার ভার সরিয়ে নিয়ে জেলা ও মহকুমা শাসকদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু এই সকল সরকারী কর্মচারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও শিক্ষার মত একটি সমস্যাসঙ্কুল বিষয়ের প্রতি উপযুক্ত মনোযোগ দেবার অবসর তাঁরা পেতেন না।[১৯] ফলে তাঁরা ডেপুটি ইন্সপেক্টারদের রিপোর্টের উপরেই নির্ভর করতেন, কিন্তু ডেপুটি ইন্সপেক্টারদের পদমর্যাদা ও দায়িত্ব অনুযায়ী পারিশ্রমিক ধার্য না হওয়াতে ঐ পদের জন্য যোগ্য লোকেরা আকৃষ্ট হতেন না।[২০] ক্যাম্পবেলের শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল অল্প ব্যয়ে সহজ সরল শিক্ষার সুষ্ঠু পরিচালন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর শিক্ষানীতি সরকারের ব্যয়ভার অনেক বাড়িয়ে দিয়েছিল ; তিনি ডাইরেকটার, ইন্সপেক্টার প্রভৃতি উচ্চবেতনভুক অফিসারদের উপর কোন সুস্পষ্ট

দায়িত্ব না দিয়ে তাঁদের সরকারী অর্থে ভরণপোষণ করেছিলেন,[২১] অপরদিকে ডেপুটি ইন্সপেক্টার, সাব-ইন্সপেক্টার প্রভৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি করে শিক্ষাবিস্তারের সুরুহ কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন—এতে ব্যয়সঙ্কোচ তো হয়নি, উপরন্তু সরকারকে বার বার প্রাদেশিক সঞ্চয় থেকে ঋণ গ্রহণ করে আর্থিক ঘাটতি মেটাবার চেষ্টা করতে হয়েছিল।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার অনুপাতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ছিল খুবই কম। সেইজন্যই দেখা যায়, ১৮৭১ সালের শেষের দিকে সংস্কৃত কলেজ, বহরমপুর কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে কিছু পরিমাণে ব্যয়-সঙ্কোচ করেও মাত্র ১,৩০,০০০ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মঞ্জুর করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু ক্যাম্পবেলের শিক্ষা-পরিকল্পনার জন্য এই অর্থের পরিমাণ ছিল অত্যন্ত সামান্য। সেইজন্য ১৮৭২ সালে তিনি 'বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল ফাণ্ড' থেকে অতিরিক্ত ৪ লক্ষ টাকা প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মঞ্জুর করেছিলেন এবং বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শনের জন্য অতিরিক্ত এক লক্ষ টাকাও এই তহবিল থেকে দেওয়া হয়েছিল। ১৮৭২ সালের ২৯শে জুলাই 'মিউনিসিপ্যাল বিল'-এর সাহায্যে ক্যাম্পবেল প্রতি জেলার বিভিন্ন শহরে ও গ্রামে পৌর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।[২২] পৌর প্রতিষ্ঠান-গুলির অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে আর্থিক সাহায্য করা। স্থির হয়েছিল, যে সকল স্থানে বিদ্যালয় স্থাপনে সত্বর সরকারী সাহায্য পাবার সম্ভাবনা কম, সেখানে পৌর প্রতিষ্ঠান গঠন করতে স্থানীয় জনগণকে অনুমতি দেওয়া হবে। তবে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গঠিত হবার আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, তাঁরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আর্থিক সাহায্য করবেন। ক্যাম্পবেল আশা করেছিলেন যে, পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কিছু পরিমানে আর্থিক দায়িত্ব বহন করার ফলে যে সরকারী অর্থের সাশ্রয় হবে, সেই অর্থ অনুন্নত জেলাগুলির উন্নতিবিধানের জন্য ব্যয়িত হবে। কিন্তু ক্যাম্পবেলের এই মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়নি, কারণ তাঁর প্রবর্তিত 'মিউনিসিপ্যাল বিল' ১৮৭৩ সালের ৩০শে জানুয়ারি ভারতের গভর্ণর জেনারেল কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়।[২৩]

ক্যাম্পবেল লোকসংখ্যার ভিত্তিতে শিক্ষাখাতে অর্থমঞ্জুরের ব্যবস্থা করেছিলেন। উচ্চ, মাধ্যমিক এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সরকারী সাহায্যের পরিমাণও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল।[২৪] কিন্তু ক্যাম্পবেলের অর্থবণ্টন নীতিতে নতুনত্ব থাকলেও দেশের সামগ্রিক শিক্ষাবিস্তারের ক্ষেত্রে এই নীতি সার্থক হয়নি—কোথাও প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়েছিল,

আবার কোথাও বা অর্থের অভাবে বিদ্যালয়ের পরিচালন বিঘ্নিত হয়েছিল।[২৪]

ক্যাম্পবেলের পরিকল্পনার আর একটি ত্রুটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনাটি প্রদেশের আয়ের উপর ভিত্তি না করে প্রাদেশিক সঞ্চয়ের উপর ভিত্তি করেই প্রস্তুত করেছিলেন। সুতরাং পরবর্তীকালে প্রদেশের আয়ের অনুপাতে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বেশি হওয়ার জন্য ১৮৭৮ সালে বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্ণর স্যার এ্যাসলী এডেন শিক্ষাখাতে সরকারী সাহায্যের পরিমাণ কমিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।[২৫]

ক্যাম্পবেলের শিক্ষানীতির মূল অভিপ্রায় ছিল জনগণের মধ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রচলন করা। পুথিগত বিদ্যার উপর বিশেষ প্রাধান্য না দিয়ে তিনি হাতেকলমে শিক্ষা দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। সেইজন্য তিনি গ্রামের বিভিন্ন জীবিকাধারী ব্যক্তির পুত্রগণ যাতে পিতৃপিতামহের জীবিকাতে নব উদ্যম ও উৎসাহ খুঁজে পায় সেই অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে লেখা, পড়া ও অঙ্ক, অল্পস্বল্প জমিদারী হিসাব, জমিসরীক্ষা প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এইসকল বিদ্যালয়ে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত। তাঁর লক্ষ্য ছিল এমন শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন, যার ফলে বালকেরা কায়িক পরিশ্রমে বিমুখ না হয় এবং যে কোন সাধারণ কাজে অকুণ্ঠিত চিত্তে এগিয়ে যেতে পারে।[২৬]

ক্যাম্পবেল প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অল্পসংখ্যক সহজ ও সাধারণ বিবরণপূর্ণ পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন। প্রকৃত মেধাবী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালকদের শিক্ষার জন্য তিনি পাঠশালায় মেধাবৃত্তির প্রচলন করেন। এই মেধাবৃত্তি বিভিন্ন পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক মেধাবৃত্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল। ক্যাম্পবেল আশা করেছিলেন যে, মেধাবৃত্তি প্রবর্তনের ফলে মেধাবী কৃষক ও শ্রমিক-পুত্রগণেরও চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, জজ প্রভৃতি উচ্চ জীবিকা গ্রহণে কোন আর্থিক সমস্যা দেখা দেবে না। ১৭৭২ সালের ৪১০টি পাঠশালা বৃত্তির জন্য ৩ টাকা হারে তিনি ২৯৫২০ টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনায় এই বৃত্তি ছিল অত্যন্ত অল্প। সুতরাং বৃত্তিপরীক্ষার্থী ছাত্রদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে তিনি পরীক্ষার্থীদের বয়সের সীমা চৌদ্দ বৎসর নির্দিষ্ট করে দেন।[২৮]

ক্যাম্পবেল সহজ সরল শিক্ষার মাধ্যমে জনগণকে 'বুদ্ধিমান মানুষে' পরিণত

করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটাবার কোন ব্যবস্থা তিনি করেননি। তিনি যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করেছিলেন, সেগুলি সমসাময়িক শিশুবোধ অপেক্ষা কোন অংশেই উৎকৃষ্টতর ছিল না।[২৯] তিনি পাঠশালায় মেধাবৃত্তির প্রচলন করে তাঁর দরদী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন সত্যি, কিন্তু বিদ্যালয়ের সংখ্যার তুলনায় বৃত্তির সংখ্যা এত অল্প ছিল যে এই বৃত্তি দ্বারা খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রই উপকৃত হয়েছিল। তাছাড়া যদিও ক্যাম্পবেল পাঠশালার মেধাবৃত্তিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এই মেধাবৃত্তি শুধু প্রবেশিকা মেধাবৃত্তি পরীক্ষা পর্যন্তই যুক্ত ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পরীক্ষার সঙ্গে এর কোন সংযোগ ছিল না। সুতরাং কৃষক ও শ্রমিক-পুত্রগণের পক্ষে উচ্চ জীবিকা গ্রহণ করাও সহজ ছিল না।[৩০]

১৮৭২ সালের পাঠশালা আইন দ্বারা পাঠশালায় সর্বাধিক পাঁচ টাকা সরকারী সাহায্যের পরিমাণ ধার্য করা হয়, সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী পরিদর্শন ও তত্ত্বাবধানের অধীনে আনা হয় এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়কে একটা ত্রৈমাসিক রিপোর্ট জেলা কমিটিকে প্রেরণ করা বাধ্যতামূলক হয়। কোন বিদ্যালয়ের দান উপযুক্ত বিবেচিত না হলে সরকারী সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া হত। ১৮৭৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঠশালার সংখ্যা ছিল ১২২২৯। তার মধ্যে ৯৬৪৫টি পাঠশালা ছিল ১৮৭২ সালের আদেশ অনুযায়ী সাহায্যপ্রাপ্ত।[৩১]

ক্যাম্পবেলের শিক্ষানীতির আর একদিকের উল্লেখ করা প্রয়োজন। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করতেন। শিক্ষকদের কয়েক মাস 'নরম্যাল স্কুলে' শিক্ষাগ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞান, জমি জরিপ প্রভৃতি বিষয়ে এই শিক্ষার্থীদের এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হত যাতে ভবিষ্যতে তাঁরা গ্রামের ছাত্রদের এইসকল বিষয়ে পারদর্শী করে তুলতে পারেন। নরম্যাল স্কুলে স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।[৩২]

ক্যাম্পবেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য উচ্চশিক্ষিত শিক্ষকের প্রয়োজন অনুভব করেননি। তিনি গ্রামের স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করে তাঁকে দুই-তিন টাকা অধিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করতেন। এই সাহায্যের উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের অনুন্নত শ্রেণীর জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে উৎসাহিত করা এবং নতুন বিদ্যালয় স্থাপিত হলে সেটিকে সরকারী তত্ত্বাবধানের তালিকাভুক্ত করে নিতেন।[৩৩] শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখতেন

না। মুসলমানপ্রধান গ্রামে উপযুক্ত ক্ষেত্রে মুসলমানকে শিক্ষকরূপে নিয়োগ করা হত।

ক্যাম্পবেলের জনগণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের প্রয়াস নিঃসন্দেহে মহৎ বলা যেতে পারে। কিন্তু সার্থক প্রয়োগের অক্ষমতার জন্য তাঁর নীতি জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে কেবলমাত্র সাধারণ হাতের লেখা, পড়া ও অঙ্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু জনগণ আরও একটু উচ্চমানের শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহী ছিল। তাঁর শিক্ষানীতি কোন নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেনি, আসলে এটা বহুপ্রচলিত মামুলি শিক্ষাব্যবস্থারই নামান্তর ছিল মাত্র। তখন প্রয়োজন ছিল এমন শিক্ষাপদ্ধতির যা শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিন্তাশক্তি বাড়িয়ে তুলতে পারবে, স্বাধীন মতামত গ্রহণে সহায়ক হবে। কিন্তু ক্যাম্পবেল প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা এ বিষয়ে ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর শিক্ষানীতিতে দুটি বিষয়ে নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায়। প্রথমতঃ তিনি গুরুমহাশয়দিগকে সরকারী কর্মচারীতে পরিণত করেছিলেন[৩৪] এবং দ্বিতীয়তঃ তিনি সামান্যমাত্র সরকারী সাহায্যের মাধ্যমে গ্রামের বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু ক্যাম্পবেল কেবল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধির দিকেই দৃষ্টি রেখেছিলেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নের প্রতি তাঁর কোন নজর ছিল না।[৩৫] ১৮৭৬ সালে লেফটেনাণ্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পল এই ত্রুটি অনেকটা সংশোধন করেছিলেন।[৩৬] ক্যাম্পবেলের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল অল্পব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি শিক্ষাবিস্তারের তুলনায় সরকারের ব্যয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়ে তুলেছিলেন।

ক্যাম্পবেলের শিক্ষানীতি জনগণের মনে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। অনুন্নত শ্রেণীর লোকের নিকট তখন পর্যন্ত শিক্ষা নামক বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণ বিলাসিতা। তাদের কাছে সন্তানসন্ততিকে লেখাপড়া শেখানো অপেক্ষা খেত-খামারের কাজে পারদর্শী করে তোলা অধিকতর লাভজনক ছিল। সুতরাং তারা ক্যাম্পবেলের এই নীতিকে অনেক ক্ষেত্রেই সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করেনি। অবশ্য ক্যাম্পবেল জনগণের এই অসুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে ইংল্যাণ্ডের "হাফটাইম" পদ্ধতি এদেশের গ্রামাঞ্চলে প্রচলন করতে চেয়েছিলেন। এই পদ্ধতিতে বিদ্যালয়ের সমগ্র ছাত্রকে দুটি অংশে ভাগ করে নেওয়া হত এবং বালকদের ছয়দিনের পরিবর্তে তিনদিন বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে হত। প্রথম অংশ সপ্তাহের প্রথম তিন দিন উপস্থিত থাকলে দ্বিতীয় অংশ অবশিষ্ট

তিনদিন উপস্থিত থাকত।[৫] এভাবে তিনি কৃষক ও শ্রমিকদের সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন, তথাপি কোথাও জনগনের কুসংস্কার কোথাও বা তাঁর শিক্ষা-পরিকল্পনা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[৬]

ক্যাম্পবেল তাঁর এই শিক্ষানীতির জন্য অত্যন্ত তীব্রভাবে সমালোচিত হয়েছেন সত্যি, তবে এটা ঠিক যে সেকালে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য যে সীমিত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হত তাতে জনগণের জন্য এইপ্রকার শিক্ষানীতিই প্রবর্তন করা সম্ভব ছিল। সাধারণস্তরের লোকের ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষালাভের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতির অভাব ছাড়াও জনগণের মানসিক ক্ষেত্রও তখন উচ্চশিক্ষার অনুকূল ছিল না। সুতরাং সেদিক দিয়ে বলা যায় যে, ক্যাম্পবেল উপযুক্ত নীতিই প্রয়োগ করেছিলেন। তাঁর শিক্ষানীতির দ্বারা বাংলার জনজীবনের কোন শুভ ফললাভ হয়নি এটা যেমন সত্যি, তেমনি এটাও অনস্বীকার্য যে তাঁর অনুসৃত নীতির মূলে ছিল বাংলার প্রাচীন নিরক্ষর মানুষের প্রতি তাঁর আন্তরিক মমত্ববোধ। সীমিত সাফল্য সত্ত্বেও তাই ক্যাম্পবেল-প্রবর্তিত জনশিক্ষানীতি বাংলার শিক্ষানীতির ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

সূত্রনির্দেশ

১. Indian Observer, 4th Feb. 1871.

২. Bengal Under Lieutenant Governors—C. E. Buckland, vol. I, p. 482.

৩. Bengalee, Jan. 11, 1873.

৪. Annual Report of the Administration of the Bengal Presidency, 1872-73, pp. 156-157.

৫. Education Commission : 1882 : Report by the Bengal Provincial Committee, p. 23.

৬. Annual Reports of the Administration of the Bengal Presidency, 1872-73, p. 157.

৭. Education Commission : 1882 Report by the Bengal Provincial Committee, p. 29.
৮. Supplement to the Indian Observer, Feb. 4, 1871.
৯. Annual Report of the Administration of the Bengal Presidency, 1872 73, p. 157.
১০. Hindoo Patriot, March 6, 1871.
১১. Educational Activities of Govt. on India, 1963, p. 85.
১২. Annual Report of the Administration of the Bengal Presidency, 1872-73, p. 157.
১৩. Bengalee, Feb. 22, 1873.
১৪. Hindoo Patriot, October 7, 1872.
১৫. Selections from Important Orders of the Education Department, 1872-73, p. 1.
১৬. Bengalee, September 13, 1873.
১৭. Hindoo Patriot, October 7, 1872.
১৮. Selections from Important Orders of the Education Department, 1872-73.
১৯. Bengalee, July 28, 1877.
২০. Hindoo Patriot, October 7, 1872.
২১. Ibid.
২২. Bengal Under Lieutenant Governors—C.E. Buckland, p. 524.
২৩. Bengalee, Feb. 8, 1873.
২৪. Bengalee, Feb. 20, 1875.
২৫. Bengalee, May 31, 1873.
২৬. Bengalee, January 10, 1878.
২৭. Hindoo Patriot, October 21, 1872.
২৮. Annual Report of the Administration of the Bengal Presidency, 1872-73, p. 160.
২৯. National Paper, June 5, 1872.
৩০. Hindoo Patriot, October 21, 1872.
৩১. Bengalee, Feb. 20, 1875.
৩২. Education Proceeding, File 34, No. 6, Aug. 1873.

৩৩. Annual Report of the Administration of the Bengal Presidency, 1872-73, p. 158.

৩৪. Hindoo Patriot, June 15, 1874.

৩৫. Ibid., June 7, 1875.

৩৬. Ibid., January 24, 1876.

৩৭. 'Mr. Campbell's Scheme of Primary Education', Bengal Magazine (July 1872—Aug. 1873), vol.I, p. 171.

৩৮. Hindoo Patriot, June 15, 1874.

কয়েকটি অপ্রকাশিত বাংলা পুঁথির বিবরণ

বিনোদশঙ্কর দাশ

মেদিনীপুর সহরে অবস্থিত বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দিরের উপরের তলায় রয়েছে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মেদিনীপুর-শাখার গ্রন্থশালা। এখানে মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত সংখ্যায় প্রায় ১৭৯ খণ্ড তুলোট কাগজে লেখা বাংলা পুঁথির সংকলন রয়েছে। তাছাড়া রয়েছে বহু সংস্কৃত পুঁথি। উপযুক্ত কর্মীর অভাবে সেই সংস্কৃত পুঁথিগুলির কোন তালিকা প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু উৎসাহী বিদ্বজ্জনের তাগিদে বাংলা পুঁথিগুলির অন্ততঃ একাধিকবার তালিকা প্রণীত হয়েছে।

এতগুলি বাংলা পুঁথির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের গবেষকদের উৎসুক-আনন্দিত হবার মতো কোন সংগ্রহ নেই। কারণ এখানে কোন বিখ্যাত কবির রচিত কোন অনাবিষ্কৃত পুঁথি আবিষ্কার করা যাবে না, অথবা কোন অপ্রকাশিত প্রতিভার স্বাক্ষর এই পুঁথিগুলির মধ্যে নেই। অনেকগুলি পুঁথি আবার বহুপরিচিত গ্রন্থের খণ্ডিত প্রতিলিপি। যেমন ১৮২নং তালিকাভুক্ত পুঁথিটি জয়দেবকৃত গীতগোবিন্দ কাব্যের দশম সর্গ। এই পুঁথিটির সঙ্গে প্রচলিত গীতগোবিন্দ কাব্যের খুব বেশি পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় না। যে সব পরিবর্তন রয়েছে তা কেবল প্রতিলিপিকর্তার বিদ্যাবত্তার জন্যই হয়েছে, একথা মনে করা যেতে পারে। ঠিক তেমনি ৩৩নং তালিকাভুক্ত পুঁথিটি ভারতচন্দ্র-প্রণীত বিদ্যাসুন্দর কাব্য, যার মধ্যে প্রচলিত মুদ্রিত পুস্তকের সঙ্গে অনেক পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায়। একটি পুঁথির প্রণেতা দ্বিজ রামেশ্বর। নাম মৎস্যধরার পালা, রচিত হয়েছে ১২৬২ সালের ৮ই অঘ্রান। ভণিতাতে রয়েছে: "ভব ভাষা ভব কাষা ভনে রামেশ্বর।" হীরাচান্দ মোক্তার এই পুঁথির অধিকারী ছিলেন এবং প্রচলিত শিবায়ন কাব্যের শিবদুর্গার মৎস্যধরার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি রামেশ্বর চক্রবর্তীর শিবায়নের যতগুলি পুরাতন পুঁথি মেদিনীপুরে পাওয়া যায়, এই খণ্ডিত পুঁথিটি তার অন্যতম প্রাচীন পুঁথি একটি। শিব-গৌরীর বিবাহের ওপর লেখা আর একটি পুঁথি সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহে রয়েছে। পুঁথিটির নাম 'হরগৌরী বিভা'। ১১৮০ সালে কোন

এক কৃষ্ণদাস কবি কর্তৃক লিখিত। পুঁথিতে কবির কোন পরিচয় নেই। এটি সম্ভবতঃ কালিকামঙ্গল জাতীয় কোন পুঁথির পণ্ডিত অংশ।

এই পুঁথিগুলির বেশির ভাগ অংশই রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক এবং বৈষ্ণব কবিদের লিখিত, যাদের মধ্যে কোন একজনের অথবা অনেকের উপাধি কবিচন্দ্র বা কবিশ্চন্দ্র। বেশির ভাগ অংশই লিখিত হয়েছে উনবিংশ শতকের প্রথমার্দ্ধে যখন বিষ্ণুপুর ও মেদিনীপুরের সামাজিক ও গ্রামীণ অর্থনীতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন, নাগরিক জীবনে আইনজীবী, মহাজন প্রভৃতি মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব, চাষের জমিতে মধ্যশ্রেণীর উদ্বৃত্ত আয়ের লগ্নী আর সে লগ্নী উৎপাদন বাড়াবার অপেক্ষা জমির ওপর ভোগদখল অব্যাহত রাখবার জন্য এবং উত্তরাংশের পার্বত্য-অঞ্চল থেকে দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র-উপকূলের দিকে জনসংখ্যার গতির প্রবণতা প্রভৃতি ঘটনাগুলির কোন প্রভাব এইসব পুঁথিগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে না। এমনকি যে গণবিক্ষোভ ইংরেজদের শাসনব্যবস্থাকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল, তার কোন বিবরণও এইসব পালারচয়িতাদের লেখনীনিঃসৃত হয়নি। যখন কলকাতায় ইংরেজি শিক্ষা ও ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব সামাজিক ও মানসিক জগতে বিরাট আলোড়ন এনেছিল, তখনও দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ়ের এইসব কবিরা সম্পূর্ণ আত্মস্থ থেকে পুরাতন বিষয়-বস্তু ও পুরাতন কাব্যরীতির মধ্য থেকে তাঁদের কাব্যসৃষ্টি করার প্রেরণা খুঁজে নিয়েছিলেন। তাঁদের উৎসাহদাতারা ছিলেন সবাই এখানকার নব-অভ্যুদিত মধ্যশ্রেণী, যাঁরা নিলামে বড় বড় জমিদারী কিনে নিয়েছিলেন, কিন্তু পুরাতন জমিদারদের আভিজাত্য নকল করবার জন্য এইসব দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিদের পোষণ করতেন। তাই এইসব পুঁথিগুলির মধ্যে মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা ও সাফল্য খুঁজতে গিয়ে ব্যর্থ হতে হয়।

বৈষ্ণব কাব্য বিষয়ক পুঁথিগুলির কবিরা বেশির ভাগই অপরিচিত। এর মধ্যে কয়েকটি পুঁথি রয়েছে বৈষ্ণব দর্শন সম্বন্ধীয়। কিন্তু কোন নতুন জীবনদর্শন বা বৈষ্ণবধর্ম সাধনার কোন নতুন আলোকসম্পাত বা কোন উচ্চচিন্তার পরিচয় এর মধ্যে নেই। বিখ্যাত প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের অনুকরণ এই কাব্যগুলির বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ১২৪৬ সালে কোন নরোত্তম দাস লিখিত একটি পুঁথির নাম 'নাম সংকীর্ত্তন।' যে কৃষ্ণ একাধারে বিষ্ণু ও নারায়ণ, তাঁরই মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রায় ১২৪২ সালে লিখিত কোন রসময় দাস-প্রণীত পুঁথির নাম 'রাধাময়ী কলা' ১৭৯নং তালিকাভুক্ত। পুঁথিটি সংস্কৃত-বাংলা

মিশ্রিত একটি কৃত্রিম ভাষায় লিখিত এবং কোন কবিতায় মিল নেই। এখানে রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ-রাধার লীলার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, কিন্তু বক্তব্য অত্যন্ত অস্পষ্ট। এই ধরনের আরো দুটি পুঁথি রয়েছে। ১২৭নং তালিকাভুক্ত কবি নারায়ণ বিরচিত 'অর্জুন সংবাদ', যেটির রচনাকাল ১২৩১ সাল। এটির মধ্যে বৈষ্ণব মাহাত্ম্যের সুবিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে এবং নারায়ণ নিজে তা বর্ণনা করেছেন। সত্যিকারের বৈষ্ণব কে, তার উত্তরে নারায়ণ বলছেন : "আমার সেবক দেখি পুরুষ সাদরে। সেই সে আমার বন্ধু কহিলাম তোমারে।...নিরন্তর নাম সেবা করএ স্মরণে। আমার স্মরিয়ে লিপ্ত হয় সেই জনে।" এই নারায়ণ কবির কোন পরিচয় পুঁথিটির মধ্যে পাওয়া যায় না। শুধু আছে "নারায়ণ বিরচিত অর্জুন সংবাদ। দয়া করি জগন্নাথ করহ প্রসাদ।" লক্ষণীয় কৃষ্ণ ও জগন্নাথ এখানে এক হয়ে গেছে।

আর একটি পুঁথি ১৭৭নং তালিকাভুক্ত যদুনন্দন-বিরচিত 'গোবিন্দলীলামৃত'। এটির মধ্যেও কবি যদুনন্দনের কোন পরিচয় নেই। কিন্তু তিনি যে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাবান, তার পরিচয় রয়েছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁর মতে সব কাব্যের আধার। একটি প্রাচীন হস্তলিপির সন্ধান পাওয়া যায় ১৫৭নং তালিকাভুক্ত যদুনন্দন দাস-অনূদিত 'বিদগ্ধ মাধব' নামক পুঁথির মধ্যে। ১৫০নং পুঁথি দ্বিজ কবিচন্দ্র বা কবিচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত 'ভাগবতামৃত'। এই পুঁথির সঙ্গেই রয়েছে ১২৫৫ সালের ২৩ চৈত্র লিখিত 'উষাহরণ পালা'। ১৪৯নং পুঁথি হল কবিজীবন-রচিত 'নৌকাখণ্ড' যা ১২৬০ সালের ৩১ বৈশাখ লিখিত হয়েছিল। কবি এখানে স্বীকার করেছেন, কৃষ্ণকীর্তন রচনায় চণ্ডীদাস ও গুণরাজ খাঁ রচিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে'র অনুসরণ করা হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণের বাল্য ও যৌবন লীলা অবলম্বন করে বেশ কয়েকটি পুঁথি লেখা হয়েছে। কিন্তু লক্ষণীয়, শ্রীরাধিকার বয়স সব পুঁথিগুলিতে একই থেকে গেছে। একটা পুঁথি ১৫২ নং তালিকাভুক্ত ১২৫২ সালে দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রণীত। কবি লিখেছেন, নন্দসুত আঙ্গিনায় খেলা করছে। তাকে দেখবার জন্য গোপিনীদের সাথে শ্রীরাধিকা এলেন। সকলে শ্রীরাধিকাকে বারণ করল শিশুর কাছে না যেতে, কারণ "বড়ই অবোধ ছেল্যা নানা মায়া করে। কত রঙ্গ জানে সেই নিশ্চয় না জানি। সবাকার বস্ত্র ধরি করে টানাটানি।" শ্রীরাধিকা দম্ভ করে শিশুর নিকট অগ্রসর হলে শিশু তার বস্ত্র ধরে টানতে লাগল। "ফাফরে পড়িল গোপি ছাড়াতে না পারে। মাথায় হাত দিয়া বৈসে ভুমির উপরে।" তারপর নানা প্রলোভন দেখিয়ে শিশুপুত্রকে শান্ত করা হল। এই কাব্যটির মধ্যে সহজ

সরল যে বাৎসল্য রসের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়, তা কবিচন্দ্রের কাব্যে সুষমামণ্ডিত করেছে। শিশু যে স্বয়ং নারায়ণ, তার পরিচয় কবি দিয়েছেন শিশুর পিতামাতার কাছে এবং ভক্তজনকে। পিতা দেবতার পূজা করছে। এমন সময় শিশু মাটিতে ঠাকুর ফেলে দিয়ে সিংহাসনে গিয়ে বসল। পিতা চক্ষু উন্মীলন করে চক্ষুস্থির। নানা প্রলোভনের পর যশোদা হাসতে হাসতে শিশুকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে আনলেন। এইসব পুঁথিগুলির মধ্য থেকে তৎকালীন সামাজিক উদারতা ও মানবতার এক অপূর্ব সুরের অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। রাধা যে কলঙ্কিনী নয়, তাও প্রমাণিত হয়েছে অপূর্ব এক কাহিনীর মধ্য দিয়ে। শিশু যশোদানন্দনের অসুখ করেছে। শ্রীকৃষ্ণ বৈদ্যের বেশে এসে বললেন, যে সতীনারী যে কলসীতে জল এনে রান্না করে শিশুকে খাওয়ালে শিশু ভালো হয়ে উঠবে। উপস্থিত গোপিনীরা কেউ পারল না—একমাত্র শ্রীরাধিকা ব্যতীত। শিশুও ভালো হয়ে উঠল। "ভোজন করিয়া শিশু কৈল আচমন। কর্পূর তাম্বুল কৈল ক্ষয়ের শোষন॥ বৈদ্যবেশে জশোমতি আজ্ঞা যদি পাই।..."ইত্যাদি। শিশু কৃষ্ণের অসুখে গোপিনী শ্রীরাধিকার অন্তরের বেদনা এবং কৃষ্ণের ছলনা করে রোগ সারানো আমাদের গৃহস্থ ঘরের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। গ্রামকেন্দ্রিক পশু-পালকের ঘরের সুখদুঃখ, সামাজিক জীবনের বিধিনিষেধ এবং মূল্যবোধের উর্ধ্বে ওঠার একটা মহিমার প্রকাশ রয়েছে শ্রীকৃষ্ণ নাহাত্ম্যের মধ্যে।

দ্বিজ কবিচন্দ্র প্রণীত ১৩৮ নং তালিকাভুক্ত আর একটি পুঁথির নাম 'বকাসুর বধ'। সম্ভবতঃ ১২১৫ বা ১২৪৫ সালে রচিত এবং ক্ষীরপাই গ্রাম থেকে এটি সংগৃহীত হয়েছে। এখানে শিশু কৃষ্ণ কর্তৃক বকাসুর নিধনের কাহিনী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এই সংগ্রহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধার রাসলীলা বিষয়ক কয়েকটি কাব্য রয়েছে, সেগুলির প্রণেতার উপাধি কবিচন্দ্র। রাধা ও কৃষ্ণ কিভাবে রাত্রের অন্ধকারে মিলিত হবার জন্য আকুল আগ্রহে উন্মুখ ছিলেন, তার বর্ণনা রয়েছে কবি দ্বিজ শঙ্কর রচিত ১১৮৯ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ প্রতিলিপিকর্তা দুখিরাম ঘোষ কর্তৃক লিখিত 'কোকিল সংবাদ' নামক পুঁথিতে। "রাধা বিনে বৃন্দাবন সকলি আঁধার। অবশ হইল তনু ডাকে পুনর্বার॥ বাজাইতে নথুর মুরলী নাহি বাজে। হা রাধা বলিয়া ডাকে নটবর রাজে॥" শ্রীকৃষ্ণ কোকিলকে বললেন, "আমার অতেক কথা শ্রীযমুনার কন্যা আমার কাছে আসিতে বলিও। বুঝাইহ সুসারেতে তুন প্রাণ-সখী। অধিক বিলম্ব হৈলে না পাইবে দেখা॥" কোকিল দৌত্য করে রাধিকাকে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে এল। আনন্দিত রাই তাঁর কাছে গেলেন।

"হাথে ধরি বসাইল আপনার পাশে। নয়া ছিনু প্রাণ পাঙ তোমার পরসে॥"

গোবিন্দদাস প্রণীত আর একটি এই ধরনের পুঁথি 'সুবোল সংবাদ'। ১২৬৫ সালে রচিত, হস্তাক্ষর শ্রীকৃষ্ণদাস বাবাজি। সুবল দূত হয়ে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিয়ে এলেন। শ্রীরাধা সুবলের বেশ ধারণ করে কৃষ্ণের কাছে এলেন। এই ধরনের আর একটি পুঁথির লেখক বিক্রম দাস—'জানকীর বনবাস্যা।' বারোমাস্যা ধরনের লেখা, কিন্তু দুর্বল রচনা। ১২৪৪ সালের ২৫শে পৌষ লিখিত। যেমন, "মাধব মাসেতে কুসেরি শিরে। কুটিল বাধাবিহন্ত ভরে॥ তা দেখি জানকি পরান ঘুরে। কি বোহিব নাহিক ধরে॥.....লবঘননেঘোদনখিন আনে। শ্যামলসুন্দর পড়ে মোর মনে॥ কি সভা চিত্তর বিল মেথে। অবলার প্রাণে কও না সভে॥"

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদের সংগ্রহের মধ্যে কবিচন্দ্র লিখিত কোন পুঁথি থেকেই শঙ্কর কবিচন্দ্রের জীবনী পাওয়া যায় না। কিন্তু অন্যান্য সংগ্রহ থেকে জানা যায়, শঙ্কর কবিচন্দ্র ১৬৮০ সালের দিকে শিবায়ন রচনা করে ছিলেন। তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুররাজ গোপাল সিংহের (১৭১৮-৪৮) সভাকবি। তিনি ভাগবত, রামায়ণ ও মহাভারতের বিষয়বস্তুর ওপর কাব্য লিখেছিলেন। শঙ্কর কবিচন্দ্র যে মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন, তার বিবরণী রয়েছে তাঁর রচিত 'প্রহ্লাদ চরিতে'। পুঁথিটির অধিকারী ছিলেন শ্যামসুন্দর ঘোষ। আগড়পাড়া পরগনে সমরদাহি, মোকাম কর্ণগড়। লিখিত হয়েছিল ১১৯০ সালের ১৬ই অঘ্রান এবং বগড়ীর ভুবানী কৃষ্ণরায়ের উল্লেখ রয়েছে তাতে। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব কাব্য রচনা করেছিলেন কিনা অন্তত: আগে জানা ছিল না। মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদ সংগ্রহ থেকে অন্তত: বেশ কয়েকটি বৈষ্ণব কাব্য পাওয়া যায়, যার লেখক কবিচন্দ্র, দ্বিজ কবিচন্দ্র বা শুধু কবিশ্চন্দ্র।

তাছাড়াও দ্বিজ কবিচন্দ্রের লিখিত 'সত্যপীরের পালা' বা দ্বিজ শঙ্কর কবিরত্ন লিখিত 'ফ্যাসারের পালা' নামক দুটি পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের গবেষকরা বলতে পারবেন, দ্বিজ কবিচন্দ্র ও দ্বিজ শঙ্কর ভিন্ন, না একই ব্যক্তি। 'ফ্যাসারের পালা'তে সত্যপীরকে অত্যন্ত কঠোর এবং জোর করে ভক্তের কাছ থেকে পূজা আদায়ের প্রত্যাশী করে আঁকা হয়েছে। যেমন, সত্যপীর রাজাকে আদেশ করেছেন স্বপ্নে তাঁর পূজার স্থান রচনা করে পূজো প্রবর্তনের জন্য। "পুন: পুন: হেদে রাজা বলিহে তোমারে। সত্য:পিরের পূজা কর আপন

মন্দিরে। অদিঃ পুজা নাহি দিবে বলি বারেবার। তোমারে তখনি রাজা করিব ছারখার।" রাজা তখন এক আস্তানা মেপে দেবার জন্ত জয়দত্ত সদাগরকে ডেকে পাঠালেন। অর্থাৎ রাজাদের খরচের অর্থসংগ্রহের জন্য তখন ব্যবসায়ীদের উপর তাগাদা দেওয়া হত। কবি লিখেছেন, "কত্তর বান্দিয়া পেয়াদা চলে ধাওা ধাই। বন্ধোধনের (দুর্যোধনের) রনে জেন অর্জুন সীকাই। জয়দত্ত বল্যা পেয়াদা ডাকীতে লাগিল। ঘর হৈতে সদাগর তখনি যাইল।" সে সময় ভূস্বামী রাজারা বণিকদের ওপর কিভাবে আর্থিক বোঝা চাপাতেন এবং প্রয়োজন-বোধে কারাগারে নিক্ষেপ করতেন, তার সুন্দর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে 'ফ্যাসারের পালা'তে।

রামায়ণের ওপর লেখা কবিচন্দ্রের দুটি পুঁথি পাওয়া যায়। একটি 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালা (১২৫৩ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ), অন্যটি 'অঙ্গদ রায়বার'। কবি এখানে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের ছবি এঁকেছেন। লিখেছেন, "রসিক জনার মনে শ্রবণে আনন্দ। রায়বার রচনা করিল কবিচন্দ্র।" 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' পালাতে কবি বলেছেন: "হেন বির নাই কেহ ধরপড়াকে মারে। এতেক ভাবিয়া রাবণ ভাবে মনে।"...যখন হনুমান ঔষধি পর্বত নিয়ে এল, তখন মুগ্ধ রাম হনুমানের প্রশংসা করতে লাগলেন: "পবননন্দন পড়ে শ্রীরামের পায়। কহেন করুণা করি কোলে করি আয়। হনুমান কি দিয়া বুধিব উপকার। রাম বলেন বুধিতে নারিলাম তব ধার। হনুমান বলে আমি না জানি তোমা বিনু। এত বলি সর্বাঙ্গে মাখিল পদরেণু। চরণে ধরিয়া বলে আমি অনুগত। বিকাইলাম রাঙ্গা পায় জনমের মত। রাবণ মারিয়া কর সিতার উদ্ধার। অযোধ্যা যাইয়া বুধিব বিভিশনের ধার। লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ মুনিরাম কয়। রাবণ মারিল রণে কবিচন্দ্রের জয়।"

তখনকার দিনের সামাজিক জীবনের লঘু দিকটির ওপরে লেখা একটি পুঁথি এই সংগ্রহের মধ্যে রয়েছে। পুঁথিটির নাম 'শাশুড়ি বধুর পালা'। লেখক শ্রীমধুসূদন চক্রবর্তী। লেখা হয়েছে ১২৪০ সালের ১৫ই পৌষ। শাশুড়ি ও বধুর মধ্যে কলহবিবাদের বর্ণনা এই পালাটির মধ্যে রয়েছে। শাশুড়ি বধূকে বলছেন, "সারাদিন মাথায় কাপড় না দিয়ে ঘুরছিস কেন?" এর উত্তরে বধুর উত্তর একেবারেই অষ্টাদশ শতকের তথাকথিত আধুনিকা বধুর উত্তরের ভাষায়। কবি লিখেছেন, "শুনে বৌড়ি বলেন সিনক্রি সব বলিতে পার। তুমি জে সন্ধ্যা সকাল পাড়ায় পাড়ায় ফির।...যখন সিনক্রি হয়্যা কর্যাছ তখন সব লেজাছে তোকে। এখন তোর ভাতার নয়, আমার ভাতার পুসিতে হবে মোকে।"

মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদে অন্তত: একটি মূল্যবান সংগ্রহ রয়েছে। তা হল দ্বিজ রামচন্দ্র রচিত 'ধর্মমঙ্গল'। এই পুঁথিটির সূত্র থেকে কবির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা হল কবির পুরো নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মল্লভূমের অন্তর্গত চামটে তাঁর বাড়ি। পুঁথির বিভিন্ন অংশে কবি নিজের পরিচয় দিয়েছেন। "নয়ূর ভটের পদ করিয়া ভাবনা। রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় করেন রচনা।" অথবা কবি লিখছেন, "দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম হরসিত। প্রথম গায়ন তার আনন্দ পণ্ডিত। রথ ভরে বেড়লেট গেলেন ধর্মরায়। হরিধ্বনি কর সভে পালা হল্য সায়।" এখানে ধর্মের গীতের সভাতেও বৈষ্ণব প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করা যায়। মল্লভূমিতে রেওয়ার উৎসবের সূত্র দিয়ে যে বৈষ্ণব প্রাধান্য সূচিত হয়েছিল, তার প্রভাব ধর্মমঙ্গল কাহিনীর মধ্যেও রয়েছে।

এই পুঁথিটি পড়লেই একটা যে সিদ্ধান্তে পৌঁছান যায়, তা হল রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামের পুঁথি নয়ূর ভটের রচিত নয়। দুই কবিই ভিন্ন জন। সুতরাং এটা বলা বোধ হয় ঠিক হবে না যে, লোকশ্রুত নয়ূর ভটের নামের রচিত পুথিগুলি আসলে রাম বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত। এবং এই ধর্মমঙ্গলের প্রথম বিখ্যাত গায়ক আনন্দ পণ্ডিত। সীতারাম দাসের একটি পদে আছে—"নয়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী। আনন্দে হইল নষ্ট দুই এক কলি।" (বিশ্বকোষ, ১৮, পৃ. ৩৫)। এই পুঁথিতেও কবি লিখেছেন, "দ্বিজ রামচন্দ্র গান ধর্ম হরসিত। প্রথম গায়ন তার আনন্দ পণ্ডিত।" দ্বিজ রামচন্দ্রের ধর্মমঙ্গল ১৭৩২ সাল নাগাদ রচিত হয়েছিল। কবি মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের আমলে এই কাব্য রচনা করেন। মনে হয়, মল্লভূম গোপাল সিংহের আমলে শঙ্কর কবিচন্দ্র ও দ্বিজ রামচন্দ্র এই দুই কবির পদরেণু ধারণ করে ধন্য হয়েছিল।

এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মেদিনীপুর-শাখায় সংগৃহীত পুঁথিগুলির একটি সাধারণ বিবরণী দেবার চেষ্টা হয়েছে। পুঁথিগুলি পরীক্ষা করতে দেবার অনুমতি ও সব রকমের সুযোগ করে দিয়েছেন সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। তাঁরা পুঁথিগুলি যেভাবে সযত্নে সংগৃহীত রেখেছেন, সেজন্য ভবিষ্যতের গবেষকদের ধন্যবাদার্হ হবেন।

———

মহারাজা চণ্ডুলাল

ননীগোপাল চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীর হায়দরাবাদের ইতিহাসে মহারাজা চণ্ডুলাল এক বহুবিতর্কিত ব্যক্তি। নিন্দা এবং প্রশংসা উভয় তাঁহার ভাগ্যে জুটিয়াছে, তবে ঐতিহাসিক দলিল-দস্তাবেজে তাঁহার প্রশংসার চেয়ে নিন্দাই বেশী পাওয়া যায়। যে কারণে এবং যাঁহাদের কাছে প্রশংসা পাইয়াছিলেন, আধুনিক ঐতিহাসিকদের সূক্ষ্ম বিচারে তাহার মূল্যও তেমন বেশী কিছু নহে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলির সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা (Subaidiary alliance) স্থাপিত হইবার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়াস এবং সেই প্রয়াসকে ব্যর্থ করিবার জন্য নিজামের যে চেষ্টা, তাহা হায়দরাবাদের ইতিহাসকে জটিল করিয়া তুলিয়াছিল। সেই সঙ্কটময় যুগে মহারাজা চণ্ডুলাল হায়দরাবাদের নিজামের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

চণ্ডুলাল জাতিতে ছিলেন ক্ষত্রিয়। তাঁহার পিতার নাম রায় নারায়ণ দাস। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে চণ্ডুলালের জন্ম হয়। তাঁহার বয়স যখন আটাশ, তখন নিজাম আলির জামাতা বদিউজ্জা খাঁ তাঁহাকে নিজাম আলি ও তাঁহার দেওয়ান আজিম-উল-উমারার সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। এই পরিচয়ের দুই বৎসর পরে চণ্ডুলাল বেলারি, গুটি প্রভৃতি জেলার করোড়ি (ক্রোড়ী) বা শুল্ক-আদায়কারী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান মীর আলমের পেশকার নিযুক্ত হইবার পূর্বে চণ্ডুলাল ছিলেন হায়দরাবাদ শহরের করোড়ি।[১]

চণ্ডুলালকে পেশকার নিযুক্ত করিবার সময় হায়দরাবাদের রাজনীতি একটু ঘোরালো হইয়া উঠে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভয় ছিল নিজাম ও তাঁহার দেওয়ান তাহাদের মনোমত না হইলে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের সঙ্গে কোম্পানির যে অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ছিন্ন হইয়া যাইতে পারে। সেইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নিজাম এবং তাঁহার দেওয়ান নির্বাচনের সময় কখনও পরোক্ষভাবে, কখনও প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিত। এখানে বলা বাহুল্য যে, নিজাম পরিবারে উত্তরাধিকারিত্বের কোন ধরাবাঁধা নিয়ম ছিল না। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলির মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার সন্তানদের মধ্যে

মসনদ লইয়া দ্বন্দ্বের সম্ভাবনা আছে বুঝিয়া লর্ড ওয়েলেস্‌লি রেসিডেন্টের মাধ্যমে নিজাম আলির জীবিত সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সিকান্দর জাহকে জানাইলেন যে, তিনি যদি ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের সন্ধি মানিয়া লইতে ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পরামর্শ অনুযায়ী চলিতে প্রতিশ্রুতি দেন তাহা হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিত্ব সমর্থন করিবেন। সিকান্দর ইহাতে রাজী হইলেন ও কোম্পানির সাহায্যে মসনদে আরোহণ করিলেন।

মসনদে আরোহণ করিবার পর সিকান্দর জাহ ও কোম্পানির মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হইল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান আজিম-উল-উমারা লোকান্তরিত হইলে গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলি মীর আলমকে দেওয়ান নিয়োগ করিবার জন্য নিজামকে সুপারিশ করিলেন। মীর আলম ছিলেন ইংরেজদের প্রিয়পাত্র; নিজামের ইচ্ছা না থাকিলেও তাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু গোলযোগ হইল পেশকার নিয়োগের সময়। নিজামের ইচ্ছা তাঁহার প্রিয়পাত্র মহীপতরামকে পেশকার করা; ইংরেজদেরও যে সে ইচ্ছা ছিল না তাহা নহে, কিন্তু মীর আলম ইহার ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা চণ্ডুলালকে পেশকার নিযুক্ত করা হউক। ইংরেজেরা ইহাতেও সম্মত ছিল। কারণ চণ্ডুলাল ইংরেজদের অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু এই কারণেই সিকান্দর জাহ চণ্ডুলালকে পেশকার নিযুক্ত করিতে অসম্মত হইলেন। অবশেষে মীর আলমের ইচ্ছাই বলবৎ রহিল, চণ্ডুলাল পেশকার নিযুক্ত হইলেন। পেশকার ছিলেন প্রকৃতপক্ষে সহকারী দেওয়ান। ইহাতে চণ্ডুলালের ভবিষ্যতে দেওয়ান হওয়ার পথ কিছুটা প্রশস্ত হইল।

মীর আলম ও চণ্ডুলাল উভয়েই ছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষপাতী। সুতরাং তাঁহারা হায়দরাবাদে কোম্পানির প্রভাববিস্তারে সহায়ক হইবেন, এই আশঙ্কা নিজামকে শঙ্কিত করিয়া তুলিল। তিনি মহীপতরামের সাহায্যে মীর আলমকে ক্ষমতাচ্যুত করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন এবং ইহাও বুঝিলেন যে, কোম্পানির সরকার যাঁহার সহায় তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করা সহজ নয়। কোম্পানির সরকারও বুঝিল যে, দেওয়ান নিয়োগের ব্যাপারে নিজামের সঙ্গে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিয়া কোন লাভ নাই, উভয় পক্ষকে একটা মীমাংসায় আসিতেই হইবে। এই মীমাংসার চেষ্টা হইল পরবর্তী দেওয়ান নিয়োগের সময়।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মীর আলমের মৃত্যুর পর দেওয়ানপদের জন্য প্রার্থী হইলেন তিনজন—মুনির্-উল্-মুল্‌ক্, শামসুল-উমারা ও শাহয়রদ্দৌলা। মুনির-উল্-মুল্‌ক্

292073

ছিলেন মীর আলমের জামাতা। তিন প্রার্থীর মধ্যে কাহারও প্রতি কোম্পানির সরকারের তেমন আস্থা ছিল না। গভর্নর জেনারেল রেসিডেন্টকে জানাইয়া দিলেন, যাঁহাকে খুশি দেওয়ান নিযুক্ত করিতে পারেন ; কিন্তু চঙ্গুলাল থাকিবেন পেশকার এবং প্রশাসনে তাঁহার ক্ষমতা থাকিবে অটুট, যেমনটি ছিল মীর আলমের সময়। যিনি প্রশাসনে চঙ্গুলালের এই ক্ষমতাকে স্বীকার করিয়া লইবেন, দেওয়ান পদে তাঁহার নিয়োগকেই কোম্পানি অনুমোদন করিবে।[২] নিজামের হাতে দেওয়ান নিয়োগের ভার ছাড়িয়া দেওয়া হইলেও নিজাম গভর্নর জেনারেলের পরামর্শ ব্যতীত কাহাকেও দেওয়ান নিযুক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। কিন্তু গভর্নর জেনারেল যাঁহাকে দেওয়ান নিযুক্ত করিবার জন্য পরামর্শ দেন, নিজাম তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া অন্যকে নিযুক্ত করিতে চান। অবশেষে দেওয়ান নিয়োগ করা হইল মুনির্-উল্-মুল্ক্‌কে।

মীর আলমের উপর ইংরেজদের যেরূপ আস্থা ছিল, মুনির্-উল্-মুল্কের উপর তেমন ছিল না। আবার মীর আলম ও চঙ্গুলালের মধ্যে যে সম্প্রীতি ছিল, তাহার অভাব ছিল মুনির্-উল্-মুল্ক্ ও চঙ্গুলালের মধ্যে। এই অবস্থায় প্রশাসন চালানো দুষ্কর হইবে দেখিয়া, এমনকি কোম্পানির সহিত হায়দরাবাদের সম্পর্কও ছিন্ন হইতে পারে ভাবিয়া রেসিডেন্ট সিডেনহাম মুনির্-উল্-মুল্ক্ ও চঙ্গুলালের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদনে প্রয়াসী হইলেন। চঙ্গুলাল প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মীর আলমের প্রতি তাঁহার যেমন শ্রদ্ধা ছিল, মুনির্-উল্-মুল্কের প্রতি তেমন শ্রদ্ধা থাকিবে। মুনির্-উল্-মুল্ক্‌ও প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তিনি চঙ্গুলালের পরামর্শ অনুযায়ী চলিবেন এবং চঙ্গুলালের দ্বারাই প্রশাসন নিয়ন্ত্রিত হইবে। এই মর্মে স্ব স্ব হস্তে লিখিত উভয়ের প্রতিশ্রুতি-পত্র সিলমোহর করিয়া রেসিডেন্টের হস্তে অর্পণ করা হইল।[৩]

এই চুক্তির ফল হইল যে, মুনির্-উল্-মুল্ক্ নামে দেওয়ান রহিলেন,[৪] কার্যতঃ দেওয়ান হইলেন চঙ্গুলাল। ক্রমশঃ মুনির্-উল্-মুল্ক্ চঙ্গুলালের উপর ঈর্ষান্বিত হইলেন। নিজামও চঙ্গুলালকে কোম্পানির অনুগত জানিয়া তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। সুতরাং মুনির্-উল্-মুল্ক্ চুক্তিদ্বারা যে ক্ষমতা হারাইয়াছিলেন, সে ক্ষমতা নিজামের সহায়তায় পুনরুদ্ধার করিতে চাহিলেন। চুক্তির কিছুকাল পরে নিজামের আদেশ সোজাসুজি চঙ্গুলালের কাছে না আসিয়া মুনির্-উল্-মুল্কের মাধ্যমে আসিতে লাগিল। প্রশাসনের খোঁজখবরও লওয়া হইত মুনির্-উল্-মুল্কের নিকট হইতে। এইভাবে মুনির্-উল্-মুল্ক্ ও চঙ্গুলালের মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছিল সুকৌশলে তাহা বানচাল করিয়া দিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল।

এই সময় (১৮১১ খৃষ্টাব্দে) হেনরি রাসেল হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট হইয়া আসেন। নিজাম ও দেওয়ানের উদ্দেশ্য বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। নিজামের সহিত এক সাক্ষাৎকারে রাসেল তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে, মুনির্-উল্-মুল্‌ক্ ও চণ্ডুলালের মধ্যে চুক্তির ফলে যে প্রশাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল তাহা বজায় রাখা উচিত। ইহাতে নিজাম ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর দিলেন, 'রাজ্য আমার, আমার যা খুশি তাই করবো'। রেসিডেণ্টও তাঁহাকে জানাইয়া দিলেন যে, কোম্পানির হানি হয় এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে নিজামকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে। এই সাক্ষাৎকারের কিছুকাল পরে গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস চণ্ডুলাল ও মুনির্-উল্-মুল্‌কের মধ্যে চুক্তি অনুযায়ী যে প্রশাসনিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা বজায় রাখিবার জন্য নিজামকে অনুরোধ করিয়া এক পত্র লিখিলেন।[৪]

ইহাতেই কাজ হইল। নিজামকে সতর্ক করিয়া দিবার পর হইতে নিজাম কিংবা মুনির্-উল্-মুল্‌ক্ কেহই প্রশাসনে চণ্ডুলালের ক্ষমতা হ্রাস করিবার কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মুনির্-উল্-মুল্‌কের মৃত্যু হইলে চণ্ডুলাল অনায়াসেই দেওয়ান নিযুক্ত হইলেন ; কোন পক্ষ হইতে কোন আপত্তি উঠিল না। প্রকৃতপক্ষে ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রাসেলের আগমন হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে চণ্ডুলালের পদত্যাগ পর্যন্ত চণ্ডুলাল ছিলেন হায়দরাবাদের প্রকৃত শাসনকর্তা। নিজাম সিকান্দর জাহ্ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তিনি নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্তঃপুরেই কাল অতিবাহিত করিতেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র নাসির-উদ্-দৌলা হায়দরাবাদের মসনদে আরোহণ করেন। নূতন নিজাম চণ্ডুলালের বিরোধী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, যদিও তিনি হায়দরাবাদে কোম্পানির হস্তক্ষেপ পছন্দ করিতেন না। নিজাম নাসির্-উদ্-দৌলার মাতা চাঁদনী বেগম ছিলেন চণ্ডুলালের একজন পৃষ্ঠপোষক। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে রেসিডেণ্ট রাসেল এক পত্রে লর্ড হেস্টিংসকে জানান যে, চাঁদনী বেগমের সঙ্গে সিকান্দর জাহের কোন বিধিসঙ্গত বিবাহ হয় নাই, সেইজন্য তাঁহার গর্ভজাত পুত্র নাসির্-উদ্-দৌলার হায়দরাবাদের মসনদে কোন দাবি নাই। সেই সময় চণ্ডুলাল চাঁদনী বেগমের পক্ষ সমর্থন করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সিকান্দর জাহের সহিত চাঁদনী বেগমের 'সাদি' না হইলেও 'নিকা' বিবাহ হইয়াছিল।[৫] সেই সময় লর্ড হেস্টিংস মসনদে নাসির্-উদ্-দৌলার দাবি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। নাসির্-উদ্-দৌলা মসনদে আরোহণ করিয়া গভর্নর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ককে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন।[৬] লর্ড বেণ্টিঙ্কও তাঁহার অনুরোধে

রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু নিজাম নাসির্-উদ্-দৌলা তাঁহার পিতার ন্যায় শাসন-কার্য উপেক্ষা করিয়া অন্তঃপুরেই কাল অতিবাহিত করিতেন। সুতরাং শাসন-কার্যে চন্দুলালের ক্ষমতা আগেও যেমন ছিল পরেও তেমন রহিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতাও বিশেষ হ্রাস পাইল না, কারণ তাহাদের সমর্থন ব্যতীত ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত থাকা চন্দুলালের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কিন্তু যে উপায়ে তিনি এই সমর্থন লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হায়দরাবাদকে সর্বনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছিল।

এই সর্বনাশের বিষয় বুঝিতে হইলে আরও একটু আগেকার বিষয় জানা দরকার। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নিজামের যে সন্ধি হয়, তাহাতে যুদ্ধের সময় ইংরেজদের সাহায্য করিবার জন্য নিজামের একদল সৈন্য পাঠাইবার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের সময় নিজাম যে সৈন্যদল প্রেরণ করেন, তাহাতে সৈন্যসংখ্যা যে শুধু কম ছিল তাহা নহে, তাহারা মোটেই রণনিপুণ ছিল না। ভবিষ্যতে যাহাতে এইরূপ না হয়, সেইজন্য রেসিডেন্ট রাসেল চন্দুলালের সহযোগিতায় হায়দরাবাদে অবস্থিত নিজামের দুইদল সৈন্যকে ইংরেজদের সামরিক প্রথায় সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন। রাসেলের সম্মানার্থে এই সেনাবাহিনীকে বলা হইত 'রাসেল ব্রিগেড'। এই ব্রিগেডের সেনাপতিরা ছিলেন ইংরেজ। ইঁহাদের বেতন কোম্পানির সমপর্যায়ের সেনাপতিদের বেতনের চেয়েও অনেক বেশি ছিল। ইহার ব্যয়ভার বহন করিতেন নিজাম। উত্তর সরকারের পেশকস বাবদ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রতি বৎসর নিজামকে যে সাত লক্ষ টাকা দিত, তাহা হইতে রাসেল ব্রিগেডের সমস্ত ব্যয় নির্বাহিত হইত। নামেমাত্র এই ব্রিগেড ছিল নিজামের, কার্যতঃ ইহা রেসিডেন্টের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হইত। রাসেল চন্দুলালের নিকট বেরারেও ছয় হাজার অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যকে সুশিক্ষিত ও সুসংগঠিত করিবার এক প্রস্তাব করিলেন। চন্দুলাল এই প্রস্তাবও গ্রহণ করিলেন এবং ইহাতে যাহা ব্যয় হইবে তাহা বহন করিতে সম্মত হইলেন। 'রাসেল ব্রিগেড' এবং বেরারের এই সেনাবাহিনীকে একত্রে বলা হইত 'হায়দরাবাদ কন্টিন্‌জেন্ট' (Hydorabad contingent) বা হায়দরাবাদের ব্রিটিশ-নিয়ন্ত্রিত নির্বাচিত সেনাবাহিনী। ইহার ব্যয়ভার বহন করা যে হায়দরাবাদ সরকারের পক্ষে অসম্ভব তাহা যে চন্দুলাল বুঝেন নাই, তাহা নহে। কিন্তু হায়দরাবাদে তাঁহার প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে হইলে রেসিডেন্টকেও যে সন্তুষ্ট রাখিতে হইবে, সে কথাও চন্দুলাল ভাল রকমেই বুঝিতেন।

'রাসেল ব্রিগেড'-এর ব্যয় নির্বাহিত হইত উত্তর সরকারের পেশকস হইতে;

কিন্তু 'হায়দরাবাদ কন্টিন্‌জেণ্ট'-এর অন্তর্গত বেরারবাহিনীর নিয়মিতভাবে বেতনাদি দিবার ক্ষমতা নিজামের ছিল না ; অথচ নিয়মিত বেতন দিতে না পারিলে সেনা-বাহিনীতে সুশৃঙ্খলা বজায় রাখাও দুষ্কর। সুতরাং যাহাতে নিয়মিত বেতন দিবার ব্যবস্থা হয়, তজ্জন্য রাসেল চণ্ডুলালকে পামার কোম্পানির (Palmer and Company) সহিত এক চুক্তি করিতে পরামর্শ দেন।

১৮১১ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদে এক রহস্যজনকভাবে রেসিডেন্সির ভিতরে এই পামার কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হয়। এই বৎসরের মে মাসে হেনরী রাসেল হায়দরাবাদের রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া আসেন। মনে হয়, রাসেলের আগমন ও পামার কোম্পানির প্রতিষ্ঠা একই সময়েই হয়। কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী জন পামারের ভ্রাতা উইলিয়ম পামার, তাঁহার ভ্রাতা হেনরী পামার ও এক ভারতীয় বণিক এই ব্যবসায়ের সূত্রপাত করেন। রেসিডেন্সির কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীও অংশীদার বা অর্থবিনিয়োগকারী হিসাবে এই কোম্পানির সহিত জড়িত ছিল। রেসিডেণ্ট রাসেল ও তাঁহার ভ্রাতা চার্লস রাসেল বহু অর্থ এই ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে পর্যন্ত এই ব্যবসায়ের অস্তিত্বের কথা কলিকাতার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারের নিকট অজ্ঞাত ছিল। এই বৎসরের মার্চ মাসে পামার কোম্পানি রেসিডেণ্টের নিকট হায়দরাবাদে একটি ব্যবসায়ের পত্তন করিবার অনুমতি চাহিয়া এক আবেদনপত্র দাখিল করেন। এই আবেদনপত্র গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসের নিকট প্রেরণ করা হইলে জন পামারের চেষ্টায় তাহা মঞ্জুর হয়। ইহার পর ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে রামবোল্ড অংশীদার হিসাবে এই ব্যবসায়ে যোগদান করেন। লর্ড হেস্টিংসের সহিত রামবোল্ডের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। রামবোল্ড পামার কোম্পানির অংশীদার হিসাবে যোগদান করাতে হায়দরাবাদে পামার কোম্পানির প্রসার ও প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। সুচতুর চণ্ডুলাল পামার কোম্পানির এই প্রতিপত্তিকে নিজের প্রভাববৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত করিতে সচেষ্ট হইলেন। পামার কোম্পানিও চণ্ডুলালের সাহায্যে নিজামের সরকারের সহিত বৈষয়িক সম্পর্ক সম্প্রসারণের দিকে মনোযোগ দিলেন।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চণ্ডুলাল নিজাম সরকারের জন্য পামার কোম্পানির মাধ্যমে বহু অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করেন। এই সকল দ্রব্যের মূল্য পরিশোধ করিবার জন্য কয়েকটি পরগনার রাজস্ব পামার কোম্পানিকে হস্তান্তরিত করিয়া দেন। কিন্তু রাজস্ব নিয়মিতভাবে আদায় না হওয়াতে হায়দরাবাদ সরকার পামার কোম্পানির হিসাবের খাতায় প্রচুর

হইয়া পড়ে। ইহাতে পামার কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তৃতীয় জর্জের একটি আইন ভঙ্গ করার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইতে পারে বলিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিল। এই আইন অনুসারে কোন ব্রিটিশ নাগরিক কিংবা তাহাদের দ্বারা সংগঠিত কোন কোম্পানি গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত কোন দেশীয় রাজাকে টাকা ঋণ দিতে পারিবে না, দিলে আইনতঃ দণ্ডনীয় হইবে। আইনের এই প্রতিবন্ধকতা হইতে মুক্তি দেওয়ার জন্য পামার কোম্পানি ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলের নিকট এক আবেদনপত্র রেসিডেন্টের নিকট পেশ করেন। এই আবেদনপত্রের খসড়াতে গভর্নর জেনারেলের হস্তাক্ষর দেখিয়া রেসিডেন্ট বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এই আবেদনপত্র গভর্নর জেনারেলের দ্বারা অনুমোদিত হইবে। সেইজন্য তিনি আবেদনপত্রটি তাঁহার সুপারিশ সমেত গভর্নর জেনারেলের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তৃতীয় জর্জের আইন অনুসারে যে সকল ব্যবসার গভর্নর জেনারেলের অনুমতি ব্যতীত করা নিষিদ্ধ, সেই সকল ব্যবসায় সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া যদি রেসিডেন্ট অনুমতি দেন, তাহা হইলে সে সকল ব্যবসায় করিতে পারিবে, এই মর্মে গভর্নর জেনারেল পামার কোম্পানিকে এক 'লাইসেন্স' প্রদান করিলেন। এই 'লাইসেন্স' দেওয়ার সংবাদ ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারির এক পত্রের দ্বারা ইংল্যাণ্ডে ডিরেক্টর-মণ্ডলীকে জানাইয়া দেওয়া হইল। এই পত্র তাঁহাদের নিকট পৌঁছিল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ; আর তাহার উত্তর কলিকাতায় পৌঁছিল ১৮২০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। ডিরেক্টর-মণ্ডলী তাঁহাদের পত্রে জানাইয়া দিলেন যে, পামার কোম্পানিকে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে যে 'লাইসেন্স' দেওয়া হইয়াছে তাহা ন্যায়সঙ্গত হয় নাই; সুতরাং তাহাদের এই 'লাইসেন্স' যেন বাতিল করিয়া দেওয়া হয়।

'লাইসেন্স' দেওয়া ও তাহা বাতিল হইয়া যাওয়ার খবর পৌঁছানোর মধ্যে সময়ের পার্থক্য প্রায় চারি বৎসর। এই সময়ের মধ্যে চন্দুলাল পামার কোম্পানির সঙ্গে দুইটি চুক্তিতে আবদ্ধ হন—একটি 'বেরার সওয়ার চুক্তি', দ্বিতীয়টি 'আওরঙ্গাবাদ ঋণ চুক্তি'। প্রথম চুক্তিটি হয় পিণ্ডারী যুদ্ধের পূর্বে। রেসিডেন্ট রাসেল বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, 'হায়দরাবাদ কন্টিন্‌জেন্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত বেরার অশ্বারোহী সৈন্যদের নিয়মিতভাবে বেতন দিতে না পারিলে তাহাদের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখা দুরূহ ব্যাপার হইবে। হায়দরাবাদ সরকারের পক্ষে তখনকার আর্থিক অবস্থায় তাহা সম্ভবপর ছিল না। এই জন্য রেসিডেন্ট হেনরী রাসেল চন্দুলালকে পামার কোম্পানির নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের

নিয়মিত বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দিলেন। চন্দুলাল ও পামার কোম্পানির মধ্যে এক চুক্তি হইল। এই চুক্তি অনুযায়ী স্থির হইল, পামার কোম্পানি দিবে প্রতি মাসে ৫২,০০০ টাকা ঋণ, আর ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হইবে নিজাম সরকারের কয়েকটি পরগনার রাজস্ব। এই লেনদেনের নাম রাখা হইল 'বেরার সওয়ার হিসাব'।

দ্বিতীয় চুক্তিটি হইল পিণ্ডারী যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে দেখা গেল, উক্ত এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ব্যতীত অপরাপর অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্যেরা নিয়মিত বেতন পাইতেছে না। এইজন্য রাসেলের পরামর্শে চন্দুলাল পামার কোম্পানির সহিত আর-একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হইলেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্যবস্থা হইল, বেরারের আওরঙ্গাবাদ শহরে পামার কোম্পানি নিজাম সরকারকে প্রতি মাসে দুই লক্ষ টাকা ঋণ দিবে, আর এই ঋণ পরিশোধের জন্য পামার কোম্পানিকে কয়েকটি পরগনার রাজস্ব হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। এই লেনদেনের হিসাবের নাম রাখা হইল 'আওরঙ্গাবাদ হিসাব'। এই হিসাব আরম্ভ হয় ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের ১১ মে।

এই দুইটি চুক্তির কথা কলিকাতায় ইংরেজ কোম্পানির সরকারকে জানানো হয়। প্রথম চুক্তিটি অনুমোদন করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় চুক্তিটি সম্বন্ধে অ্যাকাউন্টেন্ট-জেনারেল (Accountant General) আপত্তি করাতে উহা যেন কোম্পানির সরকারের গোচরীভূত করা হয় নাই বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে, এই মর্মে রেসিডেন্টকে জানাইয়া দেওয়া হইল। উভয় চুক্তির ক্ষেত্রে ঋণ আদায়ের ব্যাপারে পামার কোম্পানিকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে ইংরেজ কোম্পানির সরকার অস্বীকৃত হয়।

কিছুকাল পরে দেখা গেল যে, ঋণ পরিশোধের জন্য যে পরগনাগুলির রাজস্ব পামার কোম্পানিকে হস্তান্তরিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল সেই পরগনাগুলি হইতে রাজস্ব ঠিকমত আদায় হইতেছে না। ইহাতে নিজাম সরকার পামার কোম্পানির নিকট ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে। এতদ্ব্যতীত ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বের এবং ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ের অনেক ঋণও পরিশোধ করা হয় নাই। শেষোক্ত ঋণের কথা কোম্পানির সরকার জানেও না।

এইভাবে নিজাম সরকারের যে ঋণ হয়, তাহার পরিমাণ ৫২ লক্ষ টাকা। এই ঋণ আদায়ের কোন উপায় না দেখিয়া চন্দুলাল ও পামার কোম্পানি এক কৌশল অবলম্বন করিল। চন্দুলাল পামার কোম্পানির নিকট হইতে ৬০ লক্ষ টাকা ঋণ

করিবার অনুমতি চাহিয়া রেসিডেন্টের নিকট এক আবেদনপত্র পেশ করিলেন। ঋণ গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে উক্ত আবেদনপত্রে তাকাবি ঋণ দান, বেশী সুদের ঋণ পরিশোধ করা, ঋণের নিরাপত্তার জন্য যে সকল পরগণার রাজস্ব হস্তান্তর করা হইয়াছে সেগুলি উদ্ধার করা প্রভৃতি উল্লেখ করা হইল। আরও উল্লেখ করা হইল যে, পান্নার কোম্পানি ছয় বৎসরের মেয়াদে এই ঋণ দিতে রাজী আছে, কিন্তু বৎসরে ষোল লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হয় এমন কতকগুলি পরগনা হস্তান্তরিত করিয়া দিতে হইবে। রাসেল প্রথমে এই আবেদনপত্র গভর্নর জেনারেলের নিকট পাঠাইতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, গভর্নর জেনারেলের ইচ্ছা আবেদনপত্রটি তাঁহার নিকট প্রেরিত হউক, তখন রাসেল ঋণদানের সুপারিশ করিয়া আবেদনপত্রটি গভর্নর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করিলেন।[৭] পরিষদে (Council) এই ঋণদানের প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে গভর্নর জেনারেলের নির্ণায়ক ভোটে (casting vote) উক্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার পর যে সকল ঋণ ইংরেজ কোম্পানির হস্তক্ষেপ ব্যতীত আদায় হইবার সম্ভাবনা ছিল না (যেমন ১৮১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ও পরে ইংরেজ কোম্পানির বিনা-অনুমতিতে প্রদত্ত ঋণ, বেরার সওয়ার ঋণ, আওরঙ্গাবাদ ঋণ) সে সকল ঋণের হিসাবের খাতায় আর জের না টানিয়া বকেয়া ঋণ চণ্ডুলাল ও পান্নার কোম্পানির 'সাধারণ হিসাব'-এর (General Accounts) খাতায় স্থানান্তরিত করিয়া হায়দরাবাদের ঋণ হিসাবে দেখান হইল। যে সকল ঋণ এই-ভাবে স্থানান্তরিত করা হইল, তাহাদের সুদ ছিল বাৎসরিক ২৪% ; কিন্তু নূতন ষাট লক্ষ টাকার ঋণের সুদ ছিল ১৮%। কম সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য পান্নার কোম্পানিকে আট লক্ষ টাকা 'বোনাস' (Bonus) বা পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া হিসাবের খাতায় দেখান হইল। মোট কথা, ৫২ লক্ষ টাকা ঋণ ও ৮ লক্ষ টাকা 'বোনাস', সর্বসাকুল্যে ৬০ লক্ষ টাকা যেন নিজাম সরকারকে ঋণ দেওয়া হইয়াছে বলিয়া হিসাবের খাতায় দেখান হইল। আসলে পান্নার কোম্পানি নিজাম সরকারকে মঞ্জুরীকৃত ষাট লক্ষ টাকার ঋণের কিছুই দেয় নাই। এই কৌশল অবলম্বন করিবার একমাত্র উদ্দেশ্য, যে ঋণ আদায়ের কোন সম্ভাবনা ছিল না তাহাই কোম্পানি-সরকারের সাহায্যে আদায় করা। মনে হয়, রাসেল এই হিসাবের কারচুপির কথা জানিতেন, লর্ড হেস্টিংস হিসাবের এই কারচুপির কথা জানিতেন না ; কিন্তু তাঁহার সাহায্য না পাইলে গভর্নর জেনারেলের পরিষদে ষাট লক্ষ টাকা ঋণদানের প্রস্তাব গৃহীত হইত না। হিসাবপত্রের এইসব কারচুপি হইয়া যাওয়ার

পর ১৮২০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পামার কোম্পানির 'লাইসেন্স' বাতিল করিবার আদেশ কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিল। এই বৎসরের ডিসেম্বর মাসে রাসেলও হায়দরাবাদ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলে আসিলেন স্যর্ চার্লস মেটকাফ।

মেটকাফ হায়দরাবাদে আসিয়া দেখিলেন, পামার কোম্পানির অসম্ভব প্রভাব। নিজাম কিংবা তাঁহার দেওয়ান যেন কিছুই না। মেটকাফ হায়দরাবাদে রেসিডেন্ট হইয়া আসিবার পূর্বে কলিকাতায় কোম্পানি-সরকারের কর্মসচিব (Secretary) ছিলেন। সেই সময় তাঁহার পামার কোম্পানি সংক্রান্ত অনেক কাগজপত্র দেখিবার সুযোগ হইয়াছিল। এইসব কাগজপত্র দেখিয়া পামার কোম্পানি সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহের উদ্রেক হয়। সেইজন্য হায়দরাবাদে আসিবার পূর্ব হইতেই পামার কোম্পানি সম্বন্ধে তাঁহার ভাল ধারণা ছিল না। সুচতুর চণ্ডুলালের ইহা বুঝিতে বেশী বিলম্ব হইল না যে, পামার কোম্পানির প্রভাবও শেষ হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং তিনি মেটকাফকে সন্তুষ্ট করিতে প্রয়াসী হইলেন।

পামার কোম্পানি ব্যতীত আর একটি বিষয়েও মেটকাফের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাহা হইল হায়দরাবাদের কৃষকদের দুঃখদুর্দশা। এই দুর্দশার মূলে ছিল রাজস্ব আদায়ের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা, হায়দরাবাদ রাজ্যের রাজস্ব এক বৎসরের জন্য ইজারা দেওয়া হইত। এই ইজারাদারেরা কোথাও তালুকদার, কোথাও জমিদার নামে পরিচিত ছিল। যে ইজারাদার সব চেয়ে বেশী রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইত, তাহাকেই পরগনার ইজারা দেওয়া হইত। ইজারাদারেরা সরকারকে যে রাজস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হইত, তাহার চেয়ে ঢের বেশী কৃষকদের নিকট হইতে আদায় করিত। ফলে চাষ-আবাদ করিয়া কৃষকদের খাজনা দেওয়া পোষাইত না। অনেক কৃষকই কৃষিকার্য ত্যাগ করিয়া চোরডাকাতের সংখ্যা বৃদ্ধি করিত।

মেটকাফ বুঝিয়াছিলেন, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে হইলে কৃষকদের সঙ্গে একটি দীর্ঘস্থায়ী বন্দোবস্তী করা দরকার। মেটকাফের এই বন্দোবস্তীর নাম 'ইস্‌তাওয়া' বন্দোবস্তী। পাঁচ বৎসরের জন্য গ্রামের কৃষকদের সঙ্গে এই বন্দোবস্তী হইল। বন্দোবস্তীর প্রথম বৎসর দেয় রাজস্ব ছিল কম। জমির উৎপাদনক্ষমতা অনুযায়ী প্রতি বৎসরে রাজস্ব বৃদ্ধি পাইত। গ্রামের চোরডাকাতের উপদ্রব নিবারণের ভার গ্রাম-প্রধানের হস্তে ন্যস্ত হইল।

চণ্ডুলাল মেটকাফকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বন্দোবস্তীতে সম্মতি দিলেন। এমনকি, ইহার জন্য নিজাম সিকান্দর জাহের সম্মতি নেওয়া যে প্রয়োজন তাহাও মনে

করিলেন না। ইহাতে নিজাম চণ্ডুলালের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং মেটকাফের নিকট ইহা অজ্ঞাত ছিল না।[৮]

চণ্ডুলাল মনে করিয়াছিলেন, বন্দোবস্তীর কাজকর্ম সবই নিজামের কর্মচারীরা করিবেন, শুধু তদারকী করিবেন মেটকাফ। কিন্তু কার্যতঃ দেখা গেল, মেটকাফ ও তাঁহার অধীন ইংরেজ কর্মচারীরা শুধু তদারকী করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তাঁহারা বন্দোবস্তী ও পুলিশ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম নিজেরাই করিতে লাগিলেন। এমনকি দক্ষিণ হায়দরাবাদের যে বন্দোবস্তী চণ্ডুলাল স্বয়ং করিয়াছিলেন, তাহাও কর্নেল হিস্‌লোপ বাতিল করিয়া দিলেন। অবশ্য চণ্ডুলাল প্রতিবাদ করাতে হিস্‌লোপের বন্দোবস্তী বাতিল করিয়া দিয়া চণ্ডুলালের বন্দোবস্তী বহাল করা হইল। অনেকেরই মনে হইল যেন হায়দরাবাদে মেটকাফ ও নিজামের শাসন পাশাপাশি চলিয়াছে। এই দ্বৈতশাসনে চণ্ডুলাল নিজেও শঙ্কিত হইলেন, আর ক্ষুব্ধ হইলেন নিজাম—চণ্ডুলাল এবং ইংরেজ উভয়ের উপর।

অগত্যা মেটকাফের এই দ্বৈতশাসন রহিত করিবার জন্য চণ্ডুলাল পামার কোম্পানির শরণাপন্ন হইলেন। এই সময় মেটকাফ পামার কোম্পানিকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। পামার কোম্পানিও মেটকাফকে সুনজরে দেখিত না। চণ্ডুলাল ইহার সুযোগ লইলেন। তিনি মেটকাফের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অভিযোগ করিয়া একখানি পত্র পামার কোম্পানির অংশীদার উইলিয়ম পামারের মারফতে গভর্নর জেনারেলের কাছে পাঠাইয়া দিলেন। এই পত্রে হায়দরাবাদে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটাইবার জন্যও গভর্নর জেনারেলকে অনুরোধ করা হইল।[৯] বন্দোবস্তী শুরু হইবার প্রায় দেড় বৎসর পরে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে অক্টোবরের এক পত্রে গভর্নর জেনারেলের কর্মসচিব মেটকাফকে জানাইয়া দিলেন যে, তাঁহার দ্বারা প্রবর্তিত বন্দোবস্তী ও অন্যান্য সংস্কার হায়দরাবাদের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির যে সন্ধি হইয়াছে তাহার বিরোধী এবং তিনি যেন বন্দোবস্তীর বিষয়ে আর অগ্রসর না হন। মেটকাফের বন্দোবস্তীতে উপকারের তুলনায় অপকারই বেশী হইয়াছিল। তিনি যখন বন্দোবস্তী শুরু করেন, তখন হায়দরাবাদ সরকারের আয়ের চেয়ে প্রশাসনের ব্যয় বেশী ছিল। মেটকাফের উচিত ছিল, বন্দোবস্তীর পূর্বে প্রশাসনের ব্যয় কমানো, কিন্তু মেটকাফ সেইদিকে কিছুই করিলেন না। অপরপক্ষে তাঁহার বন্দোবস্তীর বৈশিষ্ট্য কৃষকেরা উপলব্ধি করিতে না পারার দরুনই হউক কিংবা রাজস্ব-আদায়কারীদের অসাধুতার জন্যই হউক, রাজস্ব-আদায় কম হইল। প্রশাসনের ব্যয়ভার পূর্বে যেমন ছিল পরেও তেমন রহিল, অথচ রাজস্ব হ্রাস পাইল। ইহার ফলে রাজ্যের আয়ের চেয়ে ব্যয় আরও বাড়িয়া গেল।

মেটকাফের বিরুদ্ধে চণ্ডুলালের সহিত সহযোগিতার ফল পামার কোম্পানিকে পাইতে হইল। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মেটকাফ পামার কোম্পানিকে নিজাম সরকারের সহিত লেনদেনের হিসাব দাখিল করিতে আদেশ দিলেন। হিসাবপত্র দাখিল করিবার পর নিজাম সরকারের পক্ষ হইতে চণ্ডুলালের সহিত যে সব আর্থিক চুক্তি, লেনদেনের কারচুপি প্রভৃতি হইয়াছিল সব প্রকাশ হইয়া পড়িল। এতদ্ব্যতীত দেখা গেল, নিজাম সরকারের পক্ষ হইতে পামার কোম্পানির অংশীদারদের আত্মীয়-স্বজন, পোষ্য প্রভৃতিকে মাসে কমপক্ষে ১০,৮৬৭ টাকা এবং কোম্পানির ডাক্তারকে মাসিক ১২,০০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়।

লর্ড হেস্টিংসের পরবর্তী গভর্নর জেনারেল এ্যাডামস্ দেখিলেন, হায়দরাবাদের আর্থিক সঙ্কট দূর করিতে হইলে হায়দরাবাদকে পামার কবল হইতে মুক্ত করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। কিন্তু পামার কোম্পানির সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিতে যে অর্থের প্রয়োজন নিজাম সরকারের পক্ষে এককালীন অত অর্থ দেওয়া সম্ভবপর ছিল না। সুতরাং উক্ত সরকারের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাৎসরিক যে সাত লক্ষ টাকা পেনশন দিত, তাহা ১,১৬,৬৬,৬৬৬ টাকার পরিবর্তে মঞ্জুর করিয়া দেওয়া হইল। এই টাকা হইতে ৭৮,৭০,৬৭০ টাকা পামার কোম্পানির যাবতীয় ঋণ পরিশোধ করিতে চলিয়া গেল। কেবল আট লক্ষ টাকা 'বোনাস' ও পামার কোম্পানির অংশীদারদের পোষ্য ও আত্মীয়স্বজনকে যে বৃত্তি দেওয়া হইত, তাহা হইতে নিজাম সরকারকে রেহাই দেওয়া হইয়াছিল। নিজাম সরকারের ঋণ মিটাইয়া দিবার এক বৎসরের মধ্যেই পামার কোম্পানিকে দেউলিয়া বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

পামার কোম্পানির ঋণ পরিশোধ করা হইল বটে, কিন্তু নিজাম সরকারের অর্থ-সঙ্কট ঘুচিল না। হায়দরাবাদ কন্টিন্‌জেণ্টের ছয় মাসের বেতন তখনও বকেয়া। নিজাম সরকারের অন্যান্য সৈন্যদের বকেয়া বেতন আরও দীর্ঘকালের। এইসকল সৈন্যদের বেতন বার্ষিক ৯৪,৮৪,৭৯০৲। অথচ নিজাম সরকারের বার্ষিক আয় ১,৩৮,৮৮,০৭৮৲। নিজামের বৃত্তি এবং প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের বেতনও বাকি পড়িয়া আছে বহুদিন যাবৎ। সরকারের অবস্থা তখন অচল। চণ্ডুলাল অগত্যা নিজামের শরণাপন্ন হইলেন। নিজাম নিজের ব্যক্তিগত তহবিল হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে এক লক্ষ টাকা এবং ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে তিন লক্ষ আট হাজার টাকা দিয়া-ছিলেন।[১০] ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে নাসির-উদ্-দৌলা মসনদে আরোহণ করিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সরকারকে তাঁহার রাজ্যের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিতে

অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তাহাতে আর্থিক সঙ্কট দূরীভূত হইবার নহে। কারণ চণ্ডুলাল ব্যয়-হ্রাসের দিকে কোন চেষ্টাই করিলেন না। নিজামের নিজস্ব তহবিলে যে আর টাকা ছিল না, তাহা নহে।[১১] তবে তিনি আর টাকা দিয়া চণ্ডুলালকে সাহায্য করিতে নারাজ। কারণ ছিদ্রযুক্ত কলসীতে জল ঢালিয়া কোন লাভ নাই। অবশেষে চণ্ডুলাল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট কয়েকটি পরগনার রাজস্ব বন্ধক রাখিয়া বার্ষিক ৩% সুদে এক কোটি টাকা ঋণ চাহিলেন। হায়দরাবাদ সরকারকে ঋণ দেওয়া যায় কিনা তাহা ভাবিয়া দেখিবার পূর্বে কোম্পানির সরকার হায়দরাবাদ সরকারের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ দাখিল করিতে বলিলেন।[১২] চণ্ডুলাল হায়দরাবাদের আর্থিক অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক বিবরণ দাখিল করিয়াছিলেন কিনা বলা যায় না, তবে ঋণের আবেদনপত্রের সঙ্গে যে বিবরণ দিয়াছিলেন, তাহা কোম্পানির সরকারের মনঃপূত হয় নাই।

চণ্ডুলাল ঋণের জন্য কোম্পানি-সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন জানিতে পারিয়া নিজাম তাঁহার নিজের তহবিল হইতে এক কোটি টাকা দিয়া চণ্ডুলালকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন; কিন্তু নিজাম তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। অবশেষে চণ্ডুলাল নিজামের নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। পদত্যাগপত্রে জানাইলেন, বার্দ্ধক্যবশতঃ তিনি কাজ করিতে অক্ষম; মুখে বলিলেন, অর্থসঙ্কটের কোন সুরাহা করিতে না পারার জন্য তাঁহার পদত্যাগ ব্যতীত আর কোন উপায় ছিল না।[১৩]

নিজাম চণ্ডুলালের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার সন্দেহ হইল, পদত্যাগ পত্র গ্রহণ করিবার পর কোম্পানি-সরকারের চাপে পড়িয়া হয়ত তাঁহাকে পুনরায় দেওয়ানের পদে নিয়োগ করিতে হইতে পারে। সেইজন্য নিজাম চণ্ডুলালকে পরামর্শ দিলেন, তিনি যেন তাঁহার পদত্যাগপত্র রেসিডেন্টের মাধ্যমে পেশ করেন। তাহাই করা হইল। অবশেষে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর রেসিডেণ্ট চণ্ডুলালকে জানাইলেন যে, সপরিষদ গভর্নর জেনারেল নিজামের সহিত একমত হইয়া তাঁহার পদত্যাগে সম্মত হইয়াছেন এবং উক্ত দিবস হইতে তাঁহার সহিত রেসিডেন্টের সকল সম্পর্কের অবসান হইল। পদত্যাগের পর চণ্ডুলাল গভর্নর জেনারেলের নিকট হইতে প্রশংসাসূচক এক পত্র পাইলেন। এই পত্রে তিনি কোম্পানির সহিত হায়দরাবাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিবার জন্য সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া যে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ ছিল।[১৪] ইহাই চণ্ডুলালের প্রশাসনের মূল সূত্র। ইহার বহু পূর্বে নিজাম নাসির্-উদ্-দৌলা তাঁহাকে রায়রায়ান মহারাজ খেতাবে ভূষিত করিয়াছিলেন।[১৫]

চণ্ডুলাল চাহিয়াছিলেন হায়দরাবাদে স্বীয় পদ ও প্রতিপত্তি বজায় রাখিতে। এই দুইটি বজায় রাখিতে হইলে যে চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন, তাহা তাঁহার ছিল না। সেইজন্য তাঁহাকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমর্থনের উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হইত। যে অর্থসঙ্কটে তাঁহার পতন ঘটিল, তাহাও কোম্পানির সমর্থন-লাভের জন্য অর্থদণ্ড। চরিত্রের দৃঢ়তা না থাকিলেও চণ্ডুলালের কূটবুদ্ধির অভাব ছিল না। এই কূটবুদ্ধিকে কাজে লাগাইবার জন্যও তাঁহাকে প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। কলিকাতায় কোম্পানির সরকারী মহলে প্রভাববিস্তার ও অনুসন্ধানাদি করিবার জন্য তাঁহার যে সব প্রতিনিধি বা ওয়াকিল (উকিল) ছিল, তাহাদের জন্য বৎসরে সাত লক্ষ টাকা ব্যয় হইত। নিজামের নিত্যসহচরদের বশীভূত করিয়া তাহাদের সাহায্যে নিজামকে স্বপক্ষে টানিবার জন্যও চণ্ডুলাল প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন।[১৬] অন্য আর-এক উপায়েও তিনি হায়দরাবাদে তাঁহার পদ ও প্রভাব বজায় রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলমান কিংবা হিন্দুকে রেসিডেন্টের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে দেওয়া হইত না। রেসিডেন্টের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে পারিতেন শুধু নিজাম ও দেওয়ান।[১৭] চণ্ডুলালের ভয় ছিল, অন্য কাহাকেও রেসিডেন্টের সঙ্গে সংযোগ রাখিতে দিলে হয়ত তিনি একদিন তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইবেন, যেমনভাবে তিনি দাঁড়াইয়াছিলেন মুনির্-উল্-মুল্‌কের বিরুদ্ধে। চণ্ডুলালের এই ব্যবস্থায় রেসিডেন্ট ফ্রেজার (১৮৩৮-৫৩ খৃ) হায়দরাবাদের সম্ভ্রান্তসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, চণ্ডুলালের পদত্যাগের পরে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে এমন কোন লোকের নাম পর্যন্ত রেসিডেন্ট ফ্রেজার গভর্নর জেনারেলকে জানাইতে পারিলেন না।[১৮] আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়, চণ্ডুলাল যখন দেওয়ান হইলেন, তখন পেশকারের বিশেষ কোন ক্ষমতাই রহিল না, যেমনটি ছিল তাঁহার মীর্-আলম ও মুনির্-উল্-মুল্‌কের সময়ে।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানির সরকার হায়দরাবাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিবার সিদ্ধান্ত জানাইলে চণ্ডুলাল বিব্রত বোধ করিয়াছিলেন। রেসিডেন্টের সাহায্য ও পরামর্শ ব্যতীত তিনি কাজ করিতে অভ্যস্ত ছিলেন না, অথচ প্রশাসনিক বিভাগের প্রধানদের কোন সাহায্যও তিনি নিতেন না। অবশ্য প্রশাসনের কাজ সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল; সেইজন্য প্রশাসনের কাজ তিনি নিজে চালাইতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহাকে সেইজন্য অমানুষিক পরিশ্রম করিতে হইত। তিনি নিজেই বলিয়াছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি ঘুম হইতে উঠিতেন এবং

মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কাজ করিতেন।[১৯] এই অবস্থায় প্রশাসনের কাজে শিথিলতা আসা খুবই স্বাভাবিক এবং আশিয়াও ছিল। এককথায় বলিতে গেলে, মহারাজ চণ্ডুলালের আমলে হায়দরাবাদ ধ্বংসের সম্মুখীন হইয়াছিল।

আশ্চর্যের বিষয়, এই ব্যক্তিই ছিলেন হায়দরাবাদে জনসাধারণের প্রিয়পাত্র। কারণ ব্যক্তিগত জীবনে মহারাজ চণ্ডুলাল ছিলেন বিদ্বান, উদার, দানশীল ও ধার্মিক। তিনি উর্দু ও ফারসী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীতেও তাঁহার অনুরাগ ছিল যথেষ্ট। রাত্রে সরকারী কাজকর্ম শেষ করিয়া বসিতেন সঙ্গীতের আসরে নতুবা পণ্ডিত ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনায়।[২০] মহারাজা চণ্ডুলাল ছিলেন দাতা। জাতিধর্ম নির্বিশেষে তিনি দান করিতেন। দরিদ্র, সাধু, সন্ন্যাসী, ফকির প্রভৃতি ছিল তাঁহার দানের পাত্র। এই দানের জন্য তাঁহার প্রত্যহ ব্যয় হইত প্রায় দুই হাজার টাকা। গোকুলাষ্টমী, রামনবমী ও শিবরাত্রি উপলক্ষে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইত। দান ও ধর্মোৎসবাদির টাকা আসিত নিজের ও সরকারী তহবিল হইতে।[২১] একবার জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নিজ তহবিল হইতে তিনি একদিনে ব্যয় করিয়াছিলেন ৩২,০০০৲।[২২] যাহারা হজ করিতে যাইত তাহাদের সরকারী তহবিল হইতে সাহায্য করা হইত। বহু ধার্মিক ও পণ্ডিত ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে নিয়মিত বৃত্তি পাইত।[২৩]

হায়দরাবাদ সরকারের আর্থিক দুরবস্থায় দানধ্যানে এত অর্থ ব্যয় করা সমীচীন কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে। সরকারী অর্থের তিনি অপচয় করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কখনও আত্মসাৎ করেন নাই। মৃত্যুর সময় অন্যান্য দেওয়ানেরা তাঁহাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য যাহা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় চণ্ডুলাল তাঁহার সন্তানাদির জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যান নাই। তাঁহার পুত্র বালাপ্রসাদের নিজের একটি জায়গীর ছিল। তাহা হইতে তাঁহার বার্ষিক আয় হইত ১১,৯৫৭৲। তাঁহার কন্যার জায়গীরের বার্ষিক আয় ছিল ৩৪৫৮৲।[২৪] চণ্ডুলালের পোশাক-পরিচ্ছদে ও চালচলনে কোন জাঁকজমক ছিল না। একবার রেসিডেন্ট মেটকাফ তাঁহার বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাৎ করিবার অপবাদ দিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে চণ্ডুলাল বলিয়াছিলেন, "আমি আমার উত্তরাধিকারীদের জন্য কোন অর্থ সঞ্চয় না করে আমার সমস্ত অর্থ ভগবানের সেবায় ব্যয় করেছি"।[২৫]

মহারাজা চণ্ডুলালের দোষ তাঁহার প্রশাসনে, গুণ তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনে।

সূত্রনির্দেশ

১. Indian Archives, 1955, vol. IX, Russell's Report.
২. Political Consultation, 15 Aug. 1809, No. 57, paras 8-9.
৩ Ibid., para 14.
৪. Pol. Con., 2 May 1815, No. 14.
৫. Secret Con., 28 Aug. 1819, No. 21, paras 6-7.
৬ Pol. Con., 21 Aug. 1820, No. 55.
৭. Mss. Eng 4ott C 171 (Bodleian), Russell to Rumbold, 27 Jan. 1824.
৮. Paper rolative to certain pecuniary transactions of Palmer & Co (Hyderabad Papers), letter to Barnet, p. 175.
৯. Ibid., p.177.
১০. Chronology of Modern Hyderabad, pp. 177, 180.
১১. Pol. Con., 18 Nov. 1843, No. 83.
১২. Pol. Con., No. 688 of 1843.
১৩. Pol. Con., 18 Nov. 1843, No. 96.
১৪. Pol. Con., 8 Nov. 1843, No. 90.
১৫. Ghulam Husain Khan, Gulzar-i-Asafia, p. 234.
১৬. Pol. Con., 3 Feb. 1844, No. 182, paras 3-4.
১৭. Pol. Con., 27 July 1842, No. 172, paras 23-24.
১৮. Pol. Con , 18 Nov. 1843, No. 77, para 26.
১৯. Pol. Con., 9 May 1836, No. 66 & 11 Dec. 1839, No. 44, para 12.
২০. Indian Archives, 1955,vol. IX, pp. 145-146.
২১. Gulzar-i-Asafia, p. 235.
২২. Chronology, p.173.
২৩. Gulzar, etc., p.236.
২৪. Indian Archives, 1955, vol. IX, p.146.
২৫. Pol. Con., 9 May 1836, No. 66(5).

লিট্‌ল্‌-লিখিত House of Jagatseth ১৫·০০
সম্পাদনা ও ভূমিকা : শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

ইতিহাসের মনোজ্ঞ গবেষণাপত্রিকা
Bengal Past & Present
বার্ষিক চাঁদা ২০·০০

ইতিহাস-গবেষকদের পক্ষে অপরিহার্য
শ্রীদেবজ্যোতি দাশ কর্তৃক সংকলিত
'ইতিহাস' পত্রিকার লেখকসূচী ॥ ১৩৫৭-৭৭ বঙ্গাব্দ ১·০০

ক্যালকাটা হিস্টরিক্যাল সোসাইটি
৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা ৯

কেশব-সহচারী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দেবজ্যোতি দাশ

উনবিংশ শতাব্দীতে কেশবচন্দ্র সেনকে কেন্দ্র করে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের যে আন্দোলনটি রূপায়িত হয়, তার অন্যতম অংশভাক হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের ভূমিকার বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে যে 'নববিধান' প্রচার করেন, সেই নূতন ধর্মপথের সঙ্গীতকার হিসাবে ত্রৈলোক্যনাথ তত্ত্বজিজ্ঞাসার গাম্ভীর্য ও ভক্তিরসের আবেগের মধ্যে সেতুবন্ধনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ব্রহ্মসঙ্গীতের বিকাশ ও বিবর্তনে তাঁর উল্লেখনীয় ভূমিকা ছিল। নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও সম্পাদক হিসাবেও তিনি বাংলা সাহিত্যের সেবা করেছেন। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামের অন্তরাল থেকে তিনি একযোগে ব্রাহ্ম আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্যের প্রসারে অংশী হয়েছেন। ভূয়োদর্শী কেশবচন্দ্র একদা ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে সুপ্ত প্রতিভার সন্ধান পেয়েছিলেন কেশব-সান্নিধ্যের আনুকূল্যে সেই সম্ভাবনা উত্তরকালে সার্থক রূপায়ণ লাভ করেছিল।

১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের অক্টোবর মাসে নবদ্বীপের কাছে চক্রপঞ্চানন গ্রামে রামনিধি সান্যালের পুত্র ত্রৈলোক্যনাথের জন্ম হয়। রামনিধি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠিতে সামান্য বেতনে চাকরি করতেন; তিনি সুগায়ক ছিলেন এবং ত্রৈলোক্যনাথ উত্তরাধিকারসূত্রে সঙ্গীতের প্রতিভা লাভ করেন। মিষ্ট কণ্ঠের জন্য বালোই ত্রৈলোক্যনাথকে স্থানীয় এক যাত্রাদলে নেওয়া হয়; সেখানে সঙ্গদোষে তাঁর নেশা করবার অভ্যাস জন্মায়। তাঁকে গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। যাত্রা, কীর্তন, পূজা-পার্বণ, ব্রতপালনের মধ্যে তাঁর বাল্যকাল কাটে।

সম্ভবত ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে নৈয়ায়িক-বংশীয়া নিস্তারিণী দেবীর বিবাহ হয়। এর দুই বছর পরে রামনিধির মৃত্যু ঘটে। এর পরে ত্রৈলোক্যনাথ বহু চেষ্টায় দিনাজপুরের এক জমিদারবাড়িতে মাসিক ৬-৭ টাকা বেতনে সামান্য চাকরিতে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই তিনি সাধুসঙ্গ ও

সন্ন্যাসের আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন এবং সন্ধ্যাগায়ত্রী ও বিগ্রহসেবায় মনোযোগী হন; একবার কলকাতায় গিয়ে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাও শুনে আসেন।

১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে মাতৃবিয়োগের পর শোকাকুল ত্রৈলোক্যনাথ শান্তি ও সত্যধর্মের সন্ধানে শান্তিপুরে গিয়ে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং উপবীত ত্যাগ করে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এর ফলে তাঁর উপরে সামাজিক অত্যাচার আরম্ভ হয়। ত্রৈলোক্যনাথের পত্নী ও কন্যারা তখনো ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেননি; তাঁদের স্বগ্রামেই রেখে ত্রৈলোক্যনাথ বাগআঁচড়ায় বিজয়কৃষ্ণের কাছে গিয়ে ধর্মচর্চা ও লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করেন।

লেখাপড়ায় কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পরে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বিজয়কৃষ্ণের উদ্যোগে ত্রৈলোক্যনাথ কুমিল্লায় ব্রাহ্মনেতা ব্রজসুন্দর মিত্রের বিদ্যালয়ের সহকারী ও তাঁর কন্যাদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। কিছুদিন পরে ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাস থেকে প্রায় এক বছর ত্রৈলোক্যনাথ অঘোরনাথ গুপ্তের অধীনে ঢাকা ব্রহ্মবিদ্যালয়ের তৃতীয় শিক্ষক পদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দের শেষ দিকে কেশবচন্দ্র অঘোরনাথকে নিয়ে ঢাকায় এলে ব্রজসুন্দরের বাড়িতে ত্রৈলোক্যনাথের তত্ত্বাবধানেই তাঁদের থাকবার ব্যবস্থা হয়।

১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পরে অঘোরনাথ গুপ্ত কেশবানুসৃত ধর্মমত প্রচারের জন্য পূর্ববঙ্গ ও আসাম পর্যটনে যান। এসময়ে ত্রৈলোক্যনাথ নূতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন; ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের প্রথমদিকে অঘোরনাথ ত্রৈলোক্যনাথকে নিয়ে পদব্রজে ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে শ্রীহট্টে যান। শ্রীহট্ট, কাছাড়, ছাতক ও চেরাপুঞ্জি পর্যন্ত সফরের পর বরিশালে ফিরে তাঁরা ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮ জুলাই কেশবচন্দ্রের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত লাখুটিয়ার রাজচন্দ্র রায়ের কন্যার ব্রাহ্মমতে বিবাহের অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এই সময়ে বরিশালে কয়েকদিন কেশব-সঙ্গের ফলে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট হন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প করেন। কলকাতা থেকে আগত ব্রাহ্মদের ফিরবার সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ তাঁদের সঙ্গে কলকাতায় এসে কেশব-সমীপে উপস্থিত হন। তাঁর সারল্য,

গাম্ভীর্য, অনাসক্তি, পরিচ্ছন্নতা এবং তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হয়ে কেশবচন্দ্র তাঁকে সাদরে অন্যতম প্রচারক হিসাবে গ্রহণ করলেন (১৮৬৭ খ্রী)১। ত্রৈলোক্যনাথ অন্যান্য প্রচারকদের সঙ্গে রাধানাথ মল্লিক লেনের বাসাবাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ব্রাহ্মসমাজের কাজে যোগ দিলেন। সঙ্গীতে তাঁর সহজাত নৈপুণ্য দেখে এবং নূতন ব্রাহ্মসমাজে গায়কের অভাব তাঁর দ্বারা দূর হওয়ার আশায় কেশবচন্দ্র তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা ও লেখাপড়ার বিশেষ ব্যবস্থা করে দেন।

১৮৬৮ খ্রীস্টাব্দের ২৪ জানুয়ারি ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাগৃহের ভিত্তিস্থাপনা উপলক্ষে আয়োজিত নগরসংকীর্তনটি ত্রৈলোক্যনাথ কর্তৃক পরিচালিত হয় ; ব্রাহ্মসমাজে এই প্রথম নগরসংকীর্তনের প্রবর্তন ঘটে এবং সেই থেকে তিনি নূতন ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীত-পরিচালকরূপে স্বীকৃতি পান। কেশবানুগ ধারায় উপাসনা ও উপদেশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ত্রৈলোক্যনাথ নিত্যনূতন সঙ্গীত ও কীর্তন রচনা করে ও গেয়ে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। সঙ্গীত ও কীর্তন নূতন ব্রাহ্মসমাজের ধর্মপ্রচারের এক বিশেষ অঙ্গ বলে বিবেচিত হতে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, পরের বছর অর্থাৎ ১৭৯০ শকাব্দের ১২ মাঘ বিকালে ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত প্রথম উপাসনাতেই ত্রৈলোক্যনাথ ভাষণ দিয়েছিলেন।২

ত্রৈলোক্যনাথকে সঙ্গীত পরিচালনার ভার দিয়ে কেশবচন্দ্র তাঁকে প্রচার-ভ্রমণে সঙ্গে নিতে থাকেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে তিনি ১৭৮৯ শকাব্দের মাঘ-ফাল্গুনে বোম্বাই, ১৭৯০ শকাব্দের ফাল্গুনে ঢাকা, ১৭৯৫ শকাব্দের আশ্বিন-কার্তিকে লখনউ, দেরাদুন, লাহোর প্রভৃতি উত্তরপশ্চিম ভারতের নানা অঞ্চল, ১৭৯৮ শকাব্দের কার্তিকে এলাহাবাদ, ১৮০১ শকাব্দের কার্তিকে চন্দননগর ও জগদ্দল, ১৮০২ শকাব্দের ফাল্গুনে ভাগলপুর প্রভৃতি বহু জায়গায় প্রচার-অভিযানে গিয়েছিলেন।৩ এর পরোক্ষ ফলস্বরূপ নানা প্রদেশের সাধনভজনরীতি ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গীতকে প্রভাবিত করেছিল। সঙ্গীতরচনা ও গাইবার উৎকর্ষের জন্য কেশবচন্দ্র তাঁকে 'চিরঞ্জীব শর্মা' উপাধি দিয়েছিলেন।

কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে ভারতীয়দের সামাজিক, নৈতিক ও মানসিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দের ২ নভেম্বর তারিখে প্রতিষ্ঠিত 'ভারত-সংস্কার সভা'য় প্রথম থেকেই ত্রৈলোক্যনাথ অন্যতম সদস্য হিসাবে গৃহীত হন।৪ ঐ বছরেই কেশবচন্দ্র ত্রৈলোক্যনাথকে 'প্রচারক ব্রত' দান করেন।

অনুগামীদের পারিবারিক জীবনধারার সম্যক উন্নতিবিধানের উদ্দেশ্যে কেশবচন্দ্র ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতাশ্রম' স্থাপন করেন। এখানে প্রচারকেরা মিলিত উপার্জনে ও সম-আদর্শ অবলম্বনে বাস করতে থাকেন। এর পূর্বেই সম্ভবত ১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোকনাথের স্ত্রী ও কন্যারা কলকাতায় আসেন; 'ভারতাশ্রম' প্রতিষ্ঠার পরে ত্রৈলোক্যনাথও সপরিবারে সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতাশ্রমে' উদ্যানরচনার ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল।

সঙ্গীত ও কীর্তন রচনা ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথ 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। 'সুলভ সমাচারে'র প্রথম শিরোভূষণস্বরূপ কবিতাটি ত্রৈলোক্যনাথেরই রচিত

"ধনমান লাভ করি সকলেই চায়,
সকলের ভাগ্যে তাহা ঘটে ওঠা দায়।
জ্ঞান ধর্ম চাও যদি অবারিত দ্বার;
দরিদ্র ধনীর সেথা সম অধিকার।"

এই সময় থেকেই 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'সুলভ সমাচার' সম্পাদনার দায়িত্ব তাঁর উপরে অর্পিত হতে থাকে। ১৭৯৪ শকাব্দের ২২ শ্রাবণ 'প্রচারকগণের সভা'র প্রথম অধিবেশনেই ত্রৈলোক্যনাথের উপরে গয়া, হাজারিবাগ প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারের দায়িত্ব ছাড়াও 'সুলভ সমাচারে'র ভার দেওয়া হয়;[৫] এরপর ১৭৯৬ শকাব্দের ১ পৌষ তারিখে 'প্রচারকগণের সভা'য় ঐ পত্রিকার সম্পাদনা উমানাথ গুপ্তের উপরে ন্যস্ত করার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৬] অতএব ১৭৯৪-৯৬ শকাব্দে 'সুলভ সমাচারে'র সম্পাদনা ত্রৈলোক্যনাথের উপরেই অর্পিত ছিল বলে মনে হয়।

১৭৯৪ শকাব্দের ২২ মাঘের অধিবেশনে 'প্রচারকগণের সভা' ত্রৈলোক্যনাথের উপরে 'ধর্মতত্ত্ব' সম্পাদনার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।[৭] ১৭৯৫-৯৬ শকাব্দে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সেবছর সঙ্গীত-সংগ্রহ, ব্রাহ্মসমাজে সঙ্গীত পরিচালনা, হাজারিবাগ হুগলি বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচার এবং তালতলা, বেনেপুকুর ও শাঁখারিটোলা ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা ছাড়া ত্রৈলোক্যনাথ 'ধর্মতত্ত্বে'রও সম্পাদনা করেছিলেন।[৮] ১৭৯৬ শকাব্দের ১ পৌষ এবং ১৭৯৭ শকাব্দের ৩০ কার্তিক (১৫ নভেম্বর ১৮৭৫) তারিখে 'প্রচারকগণের সভা'র কার্যবিবরণে ত্রৈলোক্যনাথের উপরে 'ধর্মতত্ত্ব' সম্পাদনার ভার ন্যস্ত থাকার উল্লেখ পাওয়া যায়।[৯] সর্বোপরি, ১৮০৩ শকাব্দে 'ধর্মতত্ত্বে'র তৎকালীন সম্পাদক কর্তৃক লিখিত একটি নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, ১৭৯৪ শকাব্দে 'প্রচারকগণের সভা'

প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পর থেকেই পাঁচ বছর ধরে ত্রৈলোক্যনাথই 'ধর্মতত্ত্বে'র সম্পাদক ছিলেন।[১০] এসব থেকে বোঝা যায় যে, ১৭৯৪ শকাব্দের ২২ মাঘ অর্থাৎ ১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ত্রৈলোক্যনাথ 'ধর্মতত্ত্ব' সম্পাদনা করেন।

এসময়ে ত্রৈলোক্যনাথ যে সব ভাষণ ও উপদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মমন্দিরে পঠিত 'ব্রাহ্মধর্মের উদারতা' (২৪ জানুয়ারি ১৮৬৯) নামে উপদেশটি, ব্রাহ্মবন্ধুসভায় প্রদত্ত 'ব্রাহ্মধর্মের উন্নতি ও তাহার প্রতিবন্ধক' (২৮ আষাঢ় ১৭৯৫) এবং 'ধর্মশাসন' (৩ আশ্বিন ১৭৯৬) নামে বক্তৃতাদুটি এবং ব্রহ্মমন্দিরে মাসিক সমাজে 'প্রত্যাক্ষবাদ' বিষয়ে উপদেশটি (২৬ আশ্বিন ১৭৯৬) উল্লেখযোগ্য।[১১] শেষোক্ত বছরের ২৬ জ্যৈষ্ঠ তারিখে কিছুদিনের জন্য ব্রহ্মমন্দিরের তত্ত্বাবধানের ভারও তাঁকে দেওয়া হয়। সেবছর ৬ শ্রাবণ তারিখে প্রচারকদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয় এবং ত্রৈলোক্যনাথ 'পরিব্রাজক' শ্রেণীতে স্থান পান।[১২] শ্রাবণ মাসেই হুগলি ও বর্ধমানের পল্লী-অঞ্চলে এবং কার্তিক-অগ্রহায়ণে আবার বর্ধমানে তিনি প্রচার-ভ্রমণে যান। 'পরিব্রাজক' ছদ্মনামে তাঁর লিখিত 'প্রচার বৃত্তান্ত' প্রকাশিত হয়।[১৩]

কেশবচন্দ্র ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে নিজের অনুগামীদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করে তাঁদের বিশেষ বিশেষ সাধনপদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতে থাকেন ; এই উপলক্ষে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী 'ভক্তিশিক্ষার্থী' রূপে এবং ত্রৈলোক্যনাথ 'ভক্তিশিক্ষার্থীর অনুগমনকারী' রূপে দীক্ষিত হন। শিক্ষার্থীদের জন্য ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে কেশবচন্দ্র 'ব্রহ্মগীতোপনিষৎ' নামে ধারাবাহিক উপদেশ দিয়েছিলেন। পরের বছর শিক্ষার্থীদের ব্রতোদ্‌যাপন উপলক্ষে 'ভারতাশ্রমে' কেশবচন্দ্র যুগপৎ অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, বিজয়কৃষ্ণ এবং ত্রৈলোক্যনাথের উদ্দেশ্যে উপদেশ দান করেন (২৬ ফাল্গুন ১৭৯৮)।[১৪]

১৭৯৮ শকাব্দের আশ্বিন মাসে ত্রৈলোক্যনাথ বগলার কাছে আক্‌না, ভাণ্ডারা ইত্যাদি স্থানে প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন।[১৫] পরের বছর কিছুদিনের জন্য তিনি কান্তিচন্দ্র মিত্রের জায়গায় প্রচারাশ্রমের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান করেন।[১৬]

১৭৯৯ শকাব্দের ৭ জ্যৈষ্ঠ ত্রৈলোক্যনাথ নবগঠিত ব্রাহ্মপ্রতিনিধি সভার কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হন ; ৮ আশ্বিন তারিখে উক্ত সভার প্রথম সাধারণ অধিবেশনে তাঁরই প্রস্তাবমত কাজকর্মের জন্য নানা বিভাগ গঠিত হয় এবং ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস, সদস্যসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যসংগ্রহের জন্য গঠিত বিভাগটিতে তাঁকে সদস্যপদে নেওয়া হয়।[১৭]

এই সময়ে অর্থাৎ ১৮৭৮-৭৯ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র তাঁর বাসভবন 'কমলকুটিরে'র প্রাঙ্গনে প্রচারকদের বসবাসের জন্য 'মঙ্গলবাড়ি' নামে কয়েকটি পৃথক পৃথক বাড়ি তৈয়ারি করেন ; ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দ থেকে এরই একটি গৃহে ত্রৈলোক্যনাথ সপরিবারে বাস করতে থাকেন। 'মঙ্গলবাড়ি'র মহিলাদের জন্য স্বতন্ত্র উপাসনার ব্যবস্থা করার ভারও তাঁর উপরেই অর্পিত হয়।[১৮]

ইতিমধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্মমন্দিরে তাঁর উপদেশ, ভাষণ ইত্যাদি প্রায় নিয়মিতভাবেই চলতে থাকে ; দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৭৯৯ শকাব্দের ১৬ মাঘ তারিখে তাঁর উপদেশ, ১৮০০ শকাব্দের ১৫ মাঘ তারিখে তাঁর ভাষণ এবং সেবছরই ২৬ ফাল্গুন তারিখে মাসিক উপাসনায় তাঁর উপদেশের উল্লেখ করা যায়।[১৯]

শেষোক্ত বছরের আষাঢ়-শ্রাবণে বনগ্রাম, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারকার্যে গিয়ে ত্রৈলোক্যনাথ প্রায় ১২ বছর পরে নিজের জন্মগ্রামে পদার্পণ করেন। এসময়ে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজে ছাত্র, অধ্যাপক ও সাধারণের এক সভায় ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দিয়েছিলেন। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি এই সফরের বিবরণ দান করেন।[২০]

পরের বছর ৬ জ্যৈষ্ঠ (১৯ মে ১৮৭৯) 'প্রচারকগণের সভা'য় কাজ অনুযায়ী প্রচারকদের আবার শ্রেণীবিভাগ করা হয় ত্রৈলোক্যনাথ 'উপদেষ্টা' এবং 'কর্মচারী' উভয় শ্রেণীতেই স্থান পান।[২১] শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে বিহারের গয়া, পাটনা প্রভৃতি স্থানে ধর্মপ্রচারের পর তিনি কলকাতায় ফিরলে কেশবচন্দ্র তাঁকে 'সঙ্গীতাচার্য' ব্রতে দীক্ষা দিয়ে সঙ্গীতের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারের জন্য অভিষিক্ত করেন (৩০ ভাদ্র ১৮০১)।[২২] এর পরেই ৯ আশ্বিন তারিখে 'প্রচারকগণের সভা'য় ত্রৈলোক্যনাথের উপরে জোড়াপুকুর উপাসনা সমাজে উপাসনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরের বছর ১ বৈশাখ ত্রৈলোক্যনাথ হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজের ১৪শ বার্ষিক উৎসবে উপাসনার কাজ সমাধা করেন।[২৩]

ত্রৈলোক্যনাথ ব্রাহ্মসমাজে কথকতার প্রথম প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন—১৮০২ শকাব্দের ৩০ ভাদ্র 'কমলকুটিরে' তিনি চৈতন্যের সন্ন্যাস বিষয়ে হৃদয়গ্রাহী কথকতা করেন।[২৪] এর পরেও ব্রাহ্মসমাজে তিনি বহুবার কথকতা করেছিলেন ; যথা, ঐ বছরেরই ১৮ পৌষ শিমলা ব্রাহ্মসমাজের বার্ষিক উৎসবে চৈতন্য কর্তৃক জগাই-মাধাই উদ্ধার সম্বন্ধে ও ৯ মাঘ 'কমলকুটিরে' যিশু খ্রীস্টের ক্রুশবিদ্ধ হওয়া সম্বন্ধে এবং ১৮০৩ শকাব্দের ৩১ ভাদ্র চাকায় পূর্ববঙ্গ নববিধান ব্রাহ্মসমাজ উৎসবের আসরে নিমাইসন্ন্যাস বিষয়ে তাঁর কথকতার উল্লেখ করা যায়।

১৮০২ শকাব্দের ১ অগ্রহায়ণ (১৫ নভেম্বর ১৮৮০) প্রত্যেক প্রচারককে এক-একটি ভাবের উদাহরণস্বরূপ হতে নির্দেশ দেওয়া হয় ; ত্রৈলোক্যনাথের জন্য নির্দিষ্ট ভাব ছিল 'অবস্থাজয় ও পুরুষকার'।[২৪]

ইতিমধ্যে, বিশেষত ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে বহু ব্রাহ্ম এবং অন্যান্য ব্যক্তিও নানা কেশব-বিরোধী অভিযোগে মুখর হয়ে ওঠেন এবং বিশেষ করে 'কুচবিহার-বিবাহ' নিয়ে প্রাচ্যে-প্রতীচ্যে বাদানুবাদ শোচ্চার হয় ; পরিণামে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে কেশব-বিরোধী ব্রাহ্মেরা স্বতন্ত্র হয়ে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন।[২৫] কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ প্রমুখ বিশ্বস্ত কেশবানুগামীরা সমস্ত বিরোধের ঊর্ধ্বে অগ্রাহ্য করে কেশব-দর্শনের গভীরে প্রবেশের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উদ্যম অব্যাহত রেখেছিলেন।

'নববিধান' ঘোষণার পরে তার প্রচারোদ্দেশ্যে ১৮০২ শকাব্দের ২৯ পৌষ ত্রৈলোক্যনাথ, অঘোরনাথ, গৌরগোবিন্দ প্রমুখ প্রচারকেরা এক বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেন।[২৭] এর পরেই ১৬ মাঘ তারিখে (২৮ জানুয়ারি ১৮৮১) 'প্রচারকগণের সভা'য় ত্রৈলোক্যনাথ ও অন্য কয়েকজন প্রচারককে নববিধানের 'প্রেরিত প্রচারক' (Apostles) রূপে গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।[২৮] তদনুসারে ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৫ মার্চ ত্রৈলোক্যনাথ ও অপর কয়েকজনকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'প্রেরিত' পদে অভিষিক্ত করা হয়।[২৯] 'কমলকুটিরে'র সভায় ত্রৈলোক্যনাথ, অঘোরনাথ গুপ্ত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় প্রমুখ প্রচারকের গলায় কেশবচন্দ্র 'নববিধানের প্রেরিত' আঁকা পদক ঝুলিয়ে দেন (৩ চৈত্র ১৮০২)।[৩০] ইতিমধ্যে ১৯ মাঘ তারিখেই (৩১ জানুয়ারি ১৮৮১) উমানাথ গুপ্ত ও ত্রৈলোক্যনাথের উপরে কলকাতা অঞ্চলে নববিধান প্রচারের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।[৩১]

অত্যধিক পরিশ্রমে কিছুদিন থেকেই ত্রৈলোক্যনাথের স্বাস্থ্যহানি ঘটায় ১৮০৩ শকাব্দের আশ্বিন মাসে তিনি বায়ুপরিবর্তনের জন্য দার্জিলিং যান, পরে সৈদপুর, রংপুর, ধুবড়ি ও তেজপুর হয়ে অগ্রহায়ণের শেষদিকে কলকাতায় ফেরেন—কার্তিকের প্রথম দিকে তিনি ধুবড়িতে ব্রাহ্মসমাজের শাখা স্থাপন করেছিলেন।[৩২]

কলকাতায় ফেরার পর তাঁকে সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধারণের আত্মিক পরিত্রাণে সাহায্য করতে নির্দেশ দেওয়া হয় (১২ পৌষ ১৮০৩)। পরের বছর ২৩ শ্রাবণ প্রত্যেক 'প্রেরিত' প্রচারকের জন্য এক-একটি বিশেষ ভাব নির্ধারিত হয় ;

ত্রৈলোক্যনাথের জন্য নির্দিষ্ট হয় 'সঙ্গীত'।[৩৩] এভাবে বারে বারে নববিধান সমাজে সঙ্গীতকার হিসাবে তাঁর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। সেই বছর ভাদ্র মাসে স্বাস্থ্যোদ্ধারকল্পে তিনি কিছুদিন সিমলায় বাস করেন। সেসময়ে ইন্দোরের মোলকার তাঁর ব্রহ্মসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দুটি স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক দিতে চেয়েছিলেন; অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথ সবিনয়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৩৪]

স্বাস্থ্যহীনতা সত্ত্বেও ধর্মপ্রচারের জন্য দেশভ্রমণে তাঁর অনীহা হয়নি। ১৮০৪ শকাব্দের কার্তিক মাসেই লাহোরে পাঞ্জাব ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে যোগ দিয়ে তিনি হিন্দীতে একটি সুন্দর ভাষণ দিয়েছিলেন;[৩৫] তারপর আবার রাজস্থানের আজমির, জয়পুর প্রভৃতি স্থানে সফরের পরে কলকাতায় ফিরেছিলেন। পরের বছর জ্যৈষ্ঠ মাসে আবার তিনি পাটনায় গিয়ে বাঁকিপুর ব্রাহ্মসমাজের ১৮শ বার্ষিক উৎসবে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন।[৩৬] বস্তুত এসময়ে বারবার বিশ্রাম ও বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ সত্ত্বেও তিনি প্রচার ও সঙ্গীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে কিছুদিন অবসর যাপন করতে সম্মত হননি। উনিশ শতকের বাংলায় কর্মোন্মাদনার প্লাবন বয়ে গিয়েছিল; ত্রৈলোক্যচিত্তেও তার স্পর্শ লেগেছিল সন্দেহ নেই।

(ক্রমশ)

সূত্রনির্দেশ

১. P. C. Mozoomdar, The Faith and Progress of the Brahmo Somaj, 2nd ed., Calcutta, 1934, p.130.

২. ধর্মতত্ত্ব, ১৫ মাঘ ১৭৯০।

৩. তদেব, ১ চৈত্র ১৭৯০, ১৬ আশ্বিন এবং ১৬ কার্তিক ১৭৯৫, ১৬ কার্তিক ১৭৯৮, ১ অগ্রহায়ণ ১৮০১, ১৬ ফাল্গুন ১৮০২ ইত্যাদি; P. S. Basu, Life and Works of Brahmananda Keshav, Calcutta, 1940, p. 141.

৪. Annual Report of the Indian Reform Association: 1870-71 & 1872, Calcutta, 1872, 'Appendix D : List of Members'.

৫. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, কলকাতা, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১-২।

৬. তদেব, পৃ. ২৮।
৭. তদেব, পৃ. ১০।
৮. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ফাল্গুন ১৭৯৬, পৃ. ৩১-৩২।
৯. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২৮ ও ৪৮।
১০. 'আমাদের সম্বন্ধে গুটিকয়েক কথা', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ আশ্বিন ১৮০৬, পৃ. ১৯১-১৯২।
১১. উপদেশাবলী, ১ম খণ্ড, কলকাতা, ১৯২০ খ্রী ; ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ শ্রাবণ, ১৬ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র ১৭৯৫, ১৬ আশ্বিন এবং ১৬ কার্ত্তিক ১৭৯৬।
১২. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৭-১৮।
১৩. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ শ্রাবণ, ১ অগ্রহায়ণ ও ১৬ পৌষ ১৭৯৬।
১৪. 'আচার্য্যের উপদেশ সাধক চতুষ্টয়ের ব্রতোদ্‌যাপন উপলক্ষে,' ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ অগ্রহায়ণ ১৮০৬, পৃ. ১৩৯-১৪১।
১৫. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৭৯৮, পৃ. ২১৬।
১৬. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৫২-৫৩।
১৭. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৭৯৯, পৃ. ২১১।
১৮. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৯।
১৯. উপদেশাবলী, ১ম খণ্ড, ১৯২০ খ্রী ; ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৭৯৯, ১৬ ফাল্গুন এবং ১৬ চৈত্র ১৮০০।
২০. 'প্রচারকের ভ্রমণ বিবরণ', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ শ্রাবণ ও ১ ভাদ্র ১৮০০।
২১. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮।
২২. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ আশ্বিন ১৮০১, পৃ. ২০৪ ; এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্রের উপদেশ : ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৮০১, পৃ. ২০৯-২১০।
২৩. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৮০২, পৃ. ১০৫।
২৪. তদেব, ১ আশ্বিন ১৮০২, পৃ. ২০৪।
২৫. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৯৪-৯৫।
২৬. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, সেপ্টেম্বর ১৯৫৭, পৃ. ২৪৭-২৪৮ ও ২৭৫।
২৭. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ মাঘ ১৮০২, পৃ. ১১।
২৮. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৪-১০৫।

২৯. A Full Report of the Church of the New Dispensation up to December 1883, Calcutta, 1884, p. 12.

৩০. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ চৈত্র ১৮০২, পৃ. ৭২।

৩১. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০৭।

৩২. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ কার্ত্তিক এবং ১৬ কার্ত্তিক ১৮০৩।

৩৩. প্রচারকগণের সভার নির্দ্ধারণ, ১৩০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৫-১২৭।

৩৪. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ ভাদ্র ১৮০৪, পৃ. ১৮৮।

৩৫. 'কড়া প্রসাদ,' ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ অগ্রহায়ণ ১৮০৪, পৃ. ২৪৩-২৪৪।

৩৬. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ আষাঢ় ১৮০৫, পৃ. ১২৮।

মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য ঃ পর্যালোচনা

অনিরুদ্ধ রায়

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সময় সুলেখিত বাংলায় লেখা পূর্ব বাংলার সুযোগ্য ও পরিচিত অধ্যাপক ডক্টর আনিসুজ্জামানের (বর্তমানে বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়) 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য (১৭৫৭-১৯১৮)' নামক আলোচ্য বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় মুক্তধারার প্রকাশন ব্যবস্থায়। (প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, আশ্বিন ১৩৭১ ; দ্বিতীয় প্রকাশ : অগ্রহায়ণ ১৩৭৮, মুক্তধারা, কলিকাতা, ৪৫৫ পৃষ্ঠা, ভূমিকা শ্রীনীহাররঞ্জন রায়)। পূর্ব বাংলার লেখক ও তাঁদের রচনাধারার সঙ্গে পশ্চিম বাংলার যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল, ফলে সাময়িক পত্র-পত্রিকায় এর বিস্তারিত আলোচনা হবার সুযোগ ছিল না। মুক্তধারার এই উদ্যোগের জন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

বইটি দুইভাগে বিভক্ত—প্রথম : দেশ ও কাল, দ্বিতীয় : সাহিত্য ও চিন্তাধারা। আমরা দেশ ও কাল নিয়ে লেখকের মতামত স্বভাবতই এখানে বেশি আলোচনা করব এবং লেখক এই দুই অংশের সম্পর্ক কিরকম দেখিয়েছেন, তারই উপর আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। সাধারণ পাঠকদের অবগতির জন্য আমরা একটি সারাংশ দেব ও কিছু প্রশ্ন তুলব মূলত ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে। এই বিশেষ দৃষ্টিকোণ বেছে নেবার কারণ হচ্ছে যে, লেখক প্রাক-ইংরেজ যুগের সমাজব্যবস্থা থেকে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত পর্যাপ্ত আলোচনা করেছেন। বর্তমান গবেষণার আলোকে এর কতটা গ্রাহ্য, যাচাই করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য যে, আমরা লেখকের সঙ্গে যেখানে একমত হতে পারছি না, সেই জায়গাগুলিই এখানে তুলব।

বাদশাহ আওরংজেবের মৃত্যুর আগেই মুঘল সাম্রাজ্যের "ঐক্যের ধারণা" বিপর্যস্ত হচ্ছিল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শীদকুলি খানের "স্বাধীন দেওয়ান হওয়ায়" এক স্বাধীন নবাববংশের প্রতিষ্ঠা ঘটে। মুর্শীদকুলি খানের অর্থলোলুপতার ফলে ও তাঁর প্রবর্তিত "জাল-জমিনি" ব্যবস্থায় নূতন ইজারাদারদের আবির্ভাব হল। তিনি ঐ ইজারাদার হিসাবে "কেবল বাঙালী হিন্দুদেরই নিয়োগ করতেন"

(পৃ. ১৫), যেখানে আগে কেবল উত্তর-ভারতীয়দের নিয়োগ করা হত। এর পর আসে পলাশীর যুদ্ধ ও ক্ষমতা-হস্তান্তর। প্রথমত, লেখক "ঐক্যের ধারণা" বলতে কি বুঝিয়েছেন জানা যায় না। যদি বিদ্রোহ ঐ ধারণার পরিপন্থী হিসাবে ধরা হয়, তাহলে বলা যায় যে সারা মুঘল যুগ ধরেই বিদ্রোহ হয়েছে। কাদের মধ্যে এই "ধারণা" থাকতে পারে, সেটাও স্পষ্ট হওয়া দরকার। এছাড়া ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে মুর্শীদকুলি "সুবাদার" হন, দেওয়ান নন। ঐ সময় স্বাধীন নবাববংশের প্রতিষ্ঠা হয়নি। কেন্দ্র থেকে দূরত্বের জন্য বাংলার নবাবরা কিছুমাত্রায় বেশি ক্ষমতা পেতেন ও তার অপব্যবহার করতেন। ঐ ধরনের ক্ষমতা সীমিত সময়ের জন্য হলেও আওরংজেবের জীবিতকালেই যুবরাজ আজিমউস্‌শানের ও মুর্শীদকুলির ছিল। আকবর বাংলায় স্বাধীন রাজা ও জমিদারদের দমন করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন: জাহাঙ্গীরের সময়ে তা শেষ হয়। "ইজারাদার" প্রথা—যাকে "মাল-জমিনি" বলা হত—শুরু হয় মুর্শীদকুলি আসার অনেক আগে। যেমন, বর্ধমানের জমিদার কৃষ্ণরাম রায় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে "মুখ্য ইজারাদার" ছিলেন। এর আগেই তাঁরা রাজা, মহারাজা ইত্যাদি খেতাব পেয়েছিলেন। রাজশাহী জেলার পুটিয়া পরগনার জমিদার নীলাম্বরকে সম্রাট জাহাঙ্গীর 'রাজা' উপাধি দেন। বাঁশবেড়িয়ার জমিদার রামেশ্বরকে সম্রাট আওরংজেব ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে 'রায়-মহাশয়' উপাধি দেন। মুর্শীদকুলি আসার আগেই বড় জমিদারী সৃষ্টি শুরু হয়ে যায়, এরকম প্রমাণ বহু আছে। খুলনার মনোহর রায় (১৬৪৯-১৭০৫) একের পর এক পরগনা গ্রাস করে প্রায় সমস্ত খুলনা ও যশোহর জেলা জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত করেন। উল্লিখিত রামেশ্বরের বেলাতেও একই জিনিস হয়েছিল। ঘোড়াঘাট-সরকারের কায়স্থ জমিদার ভগবান এইভাবে সমগ্র ইন্দ্রকপুর দখল করেন। মুর্শীদকুলির আগেই সরকারী পদে বাঙালী ছিলেন। তিনি তার সংখ্যা বাড়ান মাত্র। আকবরের সময়ে দুর্গাদাস হুগলির "কানুনগো" ও ভবানন্দ "মজুমদার" ছিলেন। আনুমানিক ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার দেওয়ান ভূপৎ রায়ের নাম পাওয়া যায়। মুর্শীদকুলির কালের বড় বৈশিষ্ট্য হল সর্বতোভাবে বড় জমিদারী সৃষ্টির চেষ্টা; যদিও সে প্রথা আগেই শুরু হয়েছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ থেকে কয়েকটি বিদ্রোহ যে শুরু হয়, এটা তার ফল বলে ধরা যেতে পারে কি?

লেখক যদিও আধুনিক মতবাদের থেকে দূরে নন, যখন তিনি হাণ্টারের মত সমর্থন করছেন না। হাণ্টারের মতে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানেরা জমিদারী হারাল। লেখক স্বভাবতই সে মতের যে কোনো প্রমাণ নেই, সেটি

দেখিয়েছেন। তবে ঐ সঙ্গে লেখক বলছেন যে, ঐ ব্যবস্থার ফলে "বেশী চাপ পড়িল জমির উপর" (পৃ. ১৯) এবং "অন্তধরণের রাজস্ব ব্যবস্থা এবং নূতন জমিদার-শ্রেণীর আবির্ভাব হলো" (পৃ. ২১)। এ ব্যবস্থায় লাভবান হলেন "হিন্দু রাজস্ব সংগ্রাহকেরা কারণ তাদের হাতে নগদ অর্থ মজুত ছিল" (পৃ. ২১)।

জমির উপর বেশি চাপ ঐ বন্দোবস্ত হবার আগে থেকে আরম্ভ হয়েছিল কিনা,—এটি তর্কসাপেক্ষ ব্যাপার। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচয়িতা ড: সুকুমার সেনের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার থেকেই ঐ চাপ আসছিল (প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ, ভূমিকা)। এর পরিণতি লাভ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর। কিন্তু হিন্দু রাজস্ব-সংগ্রাহকদের হাতে অর্থ ছিল কিনা, এ প্রশ্নের মধ্যে না গিয়েও বলা যায় যে পূর্বযুগে হিন্দু জমিদারদের সংখ্যাই বেশি ছিল, সুতরাং এ বন্দোবস্তের পরেও যে বেশি থাকবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। কিন্তু প্রশ্নটা ওখানে নয়। প্রশ্নটা হচ্ছে, যে অর্থনৈতিক সংকট এর পরে বাংলাকে গ্রাস করল সেটা এখান থেকে এল কিনা।

প্রাক-ইংরেজ যুগের সম্বন্ধে আমরা অর্থনৈতিক কাঠামোর যে ছবি পাই, তা থেকে এটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তৎকালীন শাসনক্ষমতা অর্থনৈতিক জীবন পরিচালনা করত না। ইংরেজদের আসার ফলে ঐ চেষ্টাই আরম্ভ হয়েছিল। এটা যে ১৭৯৩-এর আগে ছিল, সেটা আমরা পাই একটি ফরাসী কোম্পানির রিপোর্টে, যারা দুঃখ করে বলছে যে বাণিজ্যে মুনাফা করতে গেলে রাজনৈতিক শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়া দরকার যা ইংরেজদের আছে। (Memoire sur le commerce du Bengale par M. Deonna, Chandernagore, 1790—প্রকাশিত হয়েছে : Cargaisons Indiennes, by Louis Dermigny, Paris, 1959, vol. II, Appendice VII, pp. 417-424)। এর ফলে বিভিন্ন দিকে সংকট তীব্র হয়—যার একটা ছবি আমরা পাই যখন আমরা দেখি যে, ঐ বন্দোবস্তের পরে অর্থনৈতিক জীবনের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে। এর জন্যে কিছুটা দায়ী হচ্ছে গ্রামজীবনের বুনিয়াদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কলঙ্কময় ইতিহাস। কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যে পরিপূরক সম্বন্ধ প্রাক-ইংরেজ যুগে গ্রামজীবনে ভারসাম্য এনে দিয়েছিল, ক্রমশ: সেটা নষ্ট হয়ে গেল। এই ভারসাম্য হারিয়ে যাবার ছবিটা—কৃষি ও গ্রামীণ শিল্পের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা—আমরা ইরফান হাবিবের লেখায় কিছুটা আভাস পাই। (Agrarian System of Mughal India, Asia, 1963, p. 59)। এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট আসে ১৭৯৩-এর পর এবং যার থেকে উনবিংশ

শতাব্দী মুক্তিলাভ করেনি। সুতরাং ঐ নূতন জমিদারদের শ্রেণীগত চরিত্র দেখা প্রয়োজন—তারা হিন্দু কি মুসলমান সেটা বড় নয়। এবং তৎকালীন পটভূমিকায় তার ব্যবহার কি, সাহিত্য তার সব থেকে বড় নিরিখ হতে পারত, যেটি লেখক ব্যবহার করেননি। ঐ চরিত্র আরো পরে হিন্দু-মুসলমান রূপ নেবে; কিন্তু সেটা আমরা পরে দেখব।

ধর্ম ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য আরো অনেক জোরালো। সেখানে তাঁর অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা ও মতবাদ তৎকালীন ইতিহাস লেখার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। বাংলার ইসলামে অনৈস্লামিক প্রভাব গুজরাটের সঙ্গে তুলনা করলে বিদেশী সংস্কৃতির ছাপ হয়ত আরো লক্ষ্যণীয় হতো। একদিকে ঐ প্রভাবের ফলে গৌড়াপন্থী ইসলামের পরিবর্তন ও তার ছাপ জনমানসে কিরকম প্রকাশিত ও অন্যদিকে শাহ ওয়ালিওল্লাহর প্রচেষ্টা ইসলামের মধ্যে আদি সারল্য ও বিশুদ্ধতা আনার জন্যে—এ দুটি ধারা পরবর্তী যুগে বাংলার সাহিত্য ও রাজনীতিতে কোনো সময় সন্ধিস্থাপন ও কোনো সময় বিরোধিতার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এটাই লেখক প্রমাণ করতে চান।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এখানে তাঁর দ্বিধাহীন মতবাদ বর্তমান ইসলামের ইতিহাসে প্রাধান্য হয়ে ওঠে যদিও শাহ ওয়ালিওল্লাহর মতবাদ— সমাজে দুই শ্রেণী থাকবে, একটি চালাবে ও অন্যটি তার নির্দেশমত চলবে—লেখক তাঁর বক্তব্যের মধ্যে ধরেননি (দ্রষ্টব্য I. Habib, Political Role of Sirhindi & Waliullah, *Enquiry*, 5, 1961, pp. 51-52)। আমরা পরে দেখব যে, ঐ পরিবর্তনশীল মুসলমান সমাজের অংশ সম্বন্ধে লেখক কি বলছেন।

উনবিংশ শতাব্দীতে মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষা প্রত্যাখ্যান করার প্রসংগে লেখক যে আলোচনা করেছেন, তাতে তিনি ঐতিহাসিক ডক্টর মল্লিকের সুলিখিত মতবাদকে স্বীকার করে মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা ও আর্থিক সংগতির অভাবই প্রধান কারণ হিসেবে স্বীকার করেছেন। এ প্রসংগে বলেছেন যে, খৃষ্টান মিশনারীদের শিক্ষাবিস্তারের প্রচেষ্টায় ধর্মীয় আঘাতের ফলে মুসলমান সমাজকে রক্ষণশীলতার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। হিন্দুদের বেলায় নবজাগরণের প্রচেষ্টার কারণ অবশ্য তাঁর মতে "নূতন জমিদার ও বিদেশী বণিকদের সহচরেরা সকলেই হিন্দু" ও রাজা রামমোহন প্রমুখ যুগপুরুষদিগের আবির্ভাব। একথা সত্য যে, নবজাগরণের মধ্যে হিন্দুদের সংখ্যা বেশি ছিল। কিন্তু তাঁরা যে সকলেই বা অধিকাংশই হিন্দু সমাজ বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে ছিলেন, একথা মানা শক্ত। রামমোহনের

ইসলামীয় সংস্কৃতির সংগে যোগাযোগ ছাড়াও বলা যায় যে, হিন্দু সমাজের মধ্যে ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজের অভ্যুত্থানের ফলে যে গভীর অন্তর্বিরোধ শুরু হয়েছিল তার থেকে আদি পূর্বসূরীরা কেউই বাদ ছিলেন না। সুতরাং লেখকের পক্ষে এ তুলনাটি আরো ইতিহাসগ্রাহ্য করা ও ভিতরকার বিরোধের ধারাগুলির প্রভাব নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই বিরোধে জমিদার ও সহচরেরা ছাড়াও আরো অন্য categories আছে, সেদিকে লেখক দৃষ্টি দিলে হয়ত মুসলমান সমাজের নবজাগরণ সম্বন্ধে অনীহার কারণ পাওয়া যাবে। এছাড়া ইসলামীয় সংস্কৃতির প্রতি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান (দ্রষ্টব্য : David Koff, British Orientalism and the Bengal Renaissance : 1733-1835, Calcutta, 1969) ও অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে মুসলমান বণিক সহচর (Comprador) তালিকার (S. Bhattacharyya, East India Company and the Economy of Bengal, London, 1954) প্রতি লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন। এগুলি নেনে নিলেও যে প্রশ্ন বড় হয়ে ওঠে যে, মুসলমান নবশিক্ষিতেরা সমাজের কোন স্তর বা পেশার থেকে আসছেন। লেখক যে তিনটি তালিকা দিয়েছেন (পৃ- ৪১-৪২), তার থেকে হিন্দু-মুসলমান শিক্ষিত-অশিক্ষিতের অঙ্কই শুধু কষা হয়। এদের আর্থিক সংগতির কোনো প্রশ্ন লেখক তোলেননি এই অনুমানে যে, এদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। সে অনুমানের কোনো প্রমাণ তিনি দেখাননি। এখানে লক্ষণীয় যে, আর্থিকসংগতি না থাকলে যে শিক্ষা হবে না, একথা মনে করার প্রধান অন্তরায় ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকালের দারিদ্র্যের কথা—যদিও একজন যুগপুরুষের জীবনী থেকে কিছু প্রমাণ হওয়া শক্ত। কিন্তু লেখক এসব প্রশ্নই তোলেননি বলে নবজাগরণের চিরপুরাতন মতই আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, লেখক মুসলমান সমাজের গোঁড়া রক্ষণশীলতাকে দায়ী করেছেন, কিন্তু আগেই দেখিয়েছেন যে বাঙালী মুসলমান সমাজের এক অংশ আদি সারল্য ও বিশুদ্ধতা থেকে দূরে সরে ছিল। সেখানে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, তাহলে ঐ তথাকথিত বিচ্ছিন্ন অংশ ইংরেজী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হল না কেন, বিশেষত কলকাতায় ঐ ব্যবস্থা যখন চলছিল। সেখানে যুক্তপ্রদেশের মুসলমানরা "রক্ষণশীলতার" দোহাই দেবেন না কেন, যখন সেখানে ইসলামের বিশুদ্ধতা অনেক প্রবল ছিল।

পরবর্তী অধ্যায় সৈয়দ আহমদ বেরিলভী-প্রবর্তিত সংস্কার আন্দোলন ও পশ্চিম বাংলার তিতুমীর ও দুদুমিয়ার সশস্ত্র আন্দোলন। সৈয়দ আহমদ (ইংরেজ শাসনের

অনুগামী) তিতুমীরের গুরু ছিলেন। কিন্তু তিতুমীরের বিদ্রোহ কেন জমিদার ও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে চরমপন্থী আন্দোলন হিসাবে এল? সেটা কি শুধু ইংরেজ শাসনের অবহেলা বলা যেতে পারে? এতে শুধু আপাতঃ-কারণের উত্তর পাওয়া যেতে পারে, যে সামাজিক ও অন্যান্য ধারার সংযুক্তির ফলে চরমপন্থীদের উদ্ভব, তার হদিস পাওয়া যায় না। বিহারীলাল সরকার ('তিতুমীর') ও Thornton-এর (History of India, vol. V) লেখায়—যেগুলোর একটা লেখক উল্লেখ করেছেন—দেখা যায় যে তিতুমীরের বিরুদ্ধে শুধু হিন্দু জমিদারই ছিলেন না, ধনী মুসলমান সমাজ, মোল্লাগণ ও নীলকর সাহেবগণও অতি-উৎসাহী ছিলেন। হিন্দুদের বিরুদ্ধতা হয়ত বেশি ছিল—নীলকরের সমর্থনে রামমোহন ও দ্বারকানাথ ছিলেন (সুপ্রকাশ রায়, কৃষকবিদ্রোহের ইতিহাস, পৃ. ২৩৮-২৪০)। কিন্তু মুসলমান সমাজের যে পুঞ্জীভূত ক্ষোভের ধারা বা চরমপন্থী চিন্তাধারা বাংলাদেশে যে পরিমাণ বিস্তার লাভ করেছিল, তার কোনো নির্দেশ আমরা এ লেখায় দেখি না এবং উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাসের মৌলিক প্রশ্ন যে কেউ কেউ তুলছেন সেদিকে আমাদের দৃষ্টি যায়। ভারত-ভূখণ্ডের বিদ্রোহের অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস আরো গভীরে—শুধু হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ নয়—সেটা আরো একবার স্পষ্ট হয়ে আসে। ক্ষণিকের জন্য লেখকের মনে যে সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা এসেছিল, যখন তিনি ছুদুমিয়ার বিদ্রোহ সম্বন্ধে বলছেন যে, "শ্রেণীস্বার্থের বিরোধকে তাই ধর্মীয় শত্রুতা বলে ভুল করার যথেষ্ট কারণ ছিল" (পৃ. ৫২)।

এই সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন লেখক সিপাহী বিদ্রোহের আলোচনার সময়। "সৈন্যবাহিনীর বিদ্রোহের সংগে সংগে.....কোম্পানী আমলে ক্ষতিগ্রস্ত এবং সত্যিকার স্বাধীনতাকামীরা এই বিদ্রোহে যোগ দিলেন" এবং "তখনই তা গণবিদ্রোহে পরিণত হোলো" (পৃ. ৫৪)। "এ বিদ্রোহ যে সামন্ততন্ত্রের পুনরুত্থান নয় তার একটি প্রমাণ বাহাদুর শাহের আচরণে পাওয়া যায়" (পৃ. ৫৫)—অর্থাৎ তিনি "সিপাহীদের আজ্ঞাকারী হতে পারেন নি" (পৃ. ৫৫)। লেখক এখানে যে সহজ সমীকরণের ছক গ্রহণ করেছেন, তার ফলে কৃষকদের অবদান অজ্ঞাত রয়ে গেল। "এই গণ-অভ্যুত্থানের পশ্চাতে মুসলমানদের ভূমিকা যে সক্রিয় ও প্রধান ছিল, এতেও সন্দেহ নেই।" (পৃ. ৫৫)। এ দাবি আরো গভীরতা পেত, যদি লেখক মুসলমান সমাজের বিভিন্ন অংশের ভূমিকা নিয়ে বলতেন। কারণ হিন্দুদের বেশ বড় একটা অংশ এই বিদ্রোহকে সমর্থন করলেও কলকাতার ভদ্রলোক-সমাজ এর বিপক্ষে ছিল।

সিপাহী বিদ্রোহের পরবর্তী যুগে (১৯০৫ পর্যন্ত) লেখক নূতন ও বিভিন্ন শ্রেণী-বিন্যাসের উপর জোর দিয়েছেন। মার্কসীয় চিন্তাধারার অনুসরণে তিনি বলেছেন প্রাক-ইংরেজ যুগের "গ্রাম-সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা" (পৃ. ৬৪ : প্রধানত A. R Desai থেকে নেওয়া)। কয়েকটি বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণ থেকে আহরণ করা (প্রধানত Francois Bernier) ছাড়া মার্কসের পক্ষে ভারতীয় গ্রামসমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর স্বরূপ জানার উপায় ছিল না। বর্তমানে যে গবেষণা চলছে তাতে এই মতবাদ সর্বত্রাহ্য বলে স্বীকৃত হওয়ার পেছনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে, যদিও লেখকের পক্ষে সেটা অজানা থাকাই সম্ভব। প্রাক-ইংরেজ যুগে আমাদের গ্রামসমাজ কতটা বিচ্ছিন্ন ছিল, সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলা সম্ভব, বিশেষত যখন আমরা মোগল যুগের বিদ্রোহের ব্যাপকতা লক্ষ্য করি। তা সত্ত্বেও লেখকের প্রধান মত—"নূতন ধনতান্ত্রিক প্রথার প্রবর্তন" (পৃ. ৬৫)—বর্তমান গবেষণা থেকে দূরে নয়, যদিও তার গভীরতা বা ব্যাপকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এবং "বাংলার ভাব-বিপ্লবের ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী বা ইংরেজী-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবদানই সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ" (পৃ. ৫৫), এটাও মেনে নিতে কুণ্ঠাবোধ হয় না। এরপর লেখক বলছেন যে, "পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের সংগে যখন যুক্ত হোলো বাস্তব আশা-আকাংক্ষার প্রেরণা ও অভাব-সংকটের তাড়না, তখনই সূচনা হোল রাজনৈতিক আন্দোলনের" (পৃ. ৫৫)। এখানে লেখকের আর-একটি উক্তি লক্ষণীয়। সিপাহী বিদ্রোহোত্তর যুগে সৈয়দ আহমদ খানের বা মুসলমান সমাজের চিন্তাধারার স্পষ্ট ছবি দিয়ে লেখক বলছেন যে, "আধুনিক জ্ঞানচর্চার ও ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের যারা বিরোধী ছিলেন, তাঁরাই ইংরেজ শাসন বিরোধী চেতনার দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, একথা মনে করবার আবশ্যকতা নেই" (পৃ. ৭৬) ও "আশ্চর্যজনক হলেও একথা সত্য যে আধুনিককালে ভারতের জাতীয় চেতনা বা রাজনৈতিক চিন্তাধারা তার ধর্মীয় ভাবধারা থেকেই অগ্নিলাভ করেছে" (পৃ. ৭৬)।

এই ছবি—পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তার ও রাজনৈতিক চিন্তা ইত্যাদি—আরো স্পষ্ট হয়ে উঠত যদি লেখক সমাজের সমকালীন কোলাহল পেরিয়ে আরো গভীরে যেতেন। ইউরোপের ইতিহাসের বিশেষ বিবর্তনের ফলে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে একটা অন্বয় এসেছিল। বাংলাদেশে ঐ সমন্বয়ের ভূমিজ শিক্ষা গ্রহণ করে ইউরোপীয় আদর্শ অনুযায়ী সামাজিক সংস্কারের পথ খোঁজার পালা চলছিল এমন একটা অবস্থার মধ্যে, যেখানে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে আছে।

ফলে বারবার ঐ ইউরোপীয় আদর্শে পথ খোঁজা হচ্ছে ও বারংবার তার অসারত্ব ও বিপর্যয়ের এবং ব্যক্তির পক্ষে নিষ্ফলতার ছবিটা—যেটা রামমোহনের মধ্যে খুব বেশি পাওয়া যায়—স্পষ্ট হয়ে আসে। তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে যে, এত বেশি জ্ঞানালোক ছড়ানোর পরেও দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ভারত-ভূখণ্ড দুভাগ হল কেন? সুতরাং লেখককে এই categories ছেড়ে আরো গভীরে গিয়ে ভাব-বিপ্লবের মধ্যে সামাজিক বিভিন্নতা ও তার পরমুখাপেক্ষিতার জটিলতার কারণ অনুসন্ধান করতে হবে।

ধর্মীয় ভাবধারার বিরুদ্ধতা যে রাজনৈতিক আন্দোলনের উৎস, এটা আমরা তৎকালীন হিন্দু সমাজে কিছু দেখতে পাই রামমোহনের সতীদাহ-প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যে বা ইয়ং বেঙ্গল ও ডিরোজিওর কার্যকলাপের মধ্যে। পরবর্তী যুগ নিয়ে লেখকের মন্তব্য "জাতীয়তাবাদ আর হিন্দু জাগরণবাদ যে সমার্থক হয়ে উঠল, এটাই হোল শোচনীয় ব্যাপার" (পৃ. ৮১) সম্বন্ধে আমরা আগের কথাই বলব। হিন্দু বা মুসলিম জাতীয়তাবাদ আসছে একটা কেন্দ্রীভূত অসামঞ্জস্যের মধ্য দিয়ে, যার কথা আমরা আগে বলেছি। ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শোষণ থেকে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জন্ম নিল, তার সামনে ঐ যন্ত্রের সাহায্যপুষ্ট কিছু পরিমাণ চাকরির পথ ছাড়া আর কিছু খোলা ছিল না। তার ফলে কাড়াকাড়ির একটা রূপ স্পষ্ট হয়ে উঠল। ঐ অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল অবস্থা এর জন্যে কতটা দায়ী, লেখক যদি সেটা দেখতেন তাহলে তৎকালীন রাজনীতির ছবিটা আরো স্পষ্ট হত। মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষালাভ ও ক্রমবর্ধমান পাটের চাহিদা ও চাষ (পৃ. ৮৬) কি ঐদিকেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না? আসলে উনি যদি গণতন্ত্রের বিকাশ এবং তার পথের অন্তরায় ও আন্দোলনের দুর্বলতাগুলি দেখতেন, তাহলে হিন্দু-মুসলমান জাতীয়তাবাদের জাগরণ ও তার চরিত্র আরো স্পষ্ট হয়ে আসতো।

১৯০৫ থেকে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত লেখকের অভিনত চিরাচরিত ইতিহাসকে অনুসরণ করেছে। লেখক মনে করেন না যে, "১৮৭০ খৃষ্টাব্দের পর থেকে ইংরেজ সরকার মুসলমানদের আনুকূল্য শুরু করেন.....এ আনুকূল্য যৌথিক ছিল—কার্যক্ষেত্রে এর কোনো প্রকাশ আমরা দেখতে পাই না" (পৃ. ৯২); কিন্তু ঐ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, বাঙালী মুসলমানদের শিক্ষিত হওয়ার মূলে অন্যান্য কারণের মধ্যে রয়েছে "সরকারী শিক্ষানীতির উদারতা"। সরকারী শিক্ষানীতি কতটা উদার ছিল ও বাঙালী মুসলমানরা তাদের "রক্ষণশীলতা" অকস্মাৎ

পরিত্যাগ করে এই উদারতার সুযোগ কেন নিল, সেটা পরিষ্কার করলে ভালো হত।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টি স্পষ্ট ও ভাবালুতা থেকে মুক্ত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের যে সতর্কতা ছিল, তার প্রতি লেখক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, "সেই দৃষ্টি সকলে লাভ করতে পারেননি" (পৃ. ৯৫)। অতঃপর মনীষার প্রভাব দুই সম্প্রদায়ের উপর কেন পড়ল না, সে সম্বন্ধে লেখক স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতিকে দায়ী করেছেন ; আরো গভীরে গেলে পরমুখাপেক্ষী সমাজগঠনের বিন্যাস দেখতে পেতেন ও পরবর্তী যুগের সন্ত্রাসবাদীদের ভূমিকা তার যথাস্থান পেত। এর তুলনায় লেখক স্বভাবতই মুসলিম লীগের ছবি বেশি এঁকেছেন। ১৯১৩ সালের পর থেকেই "মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠানে অভিজাত ও উচ্চবিত্তের তুলনায় বুদ্ধিজীবি ও মধ্যবিত্তের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে" (পৃ. ৯৯)। কিন্তু এর ফলে লীগের স্বাতন্ত্র্যবাদী রাজনীতি কমল না বাড়ল, সেসম্বন্ধে লেখক নীরব। শুধু কি ইংরেজবিরোধিতার মান দিয়ে তার হিসেব পাওয়া যাবে ? (পৃ ১০০)

বলাবাহুল্য, আমরা লেখকের মূল কাঠামোর ভুল বের করার কোনো চেষ্টা করছি না ; বর্তমান গবেষণার আলোকে ওঁর তৈরি কাঠামো সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন রাখছি মাত্র। এরকম বিস্তৃত পর্যালোচনার অন্য বিশদ কারণ এই যে, সাহিত্যপথচারী হয়েও লেখক ইতিহাসের বিস্তৃত পটভূমি (একশো দুই পৃষ্ঠা) রচনা করেছেন—যার সমপ্রতার উপর আমাদের বিশেষ বক্তব্য নেই। এই বিশাল ঐতিহাসিক পটভূমিকার কারণ হিসেবে লেখক বলছেন যে, দেশ ও কাল সাহিত্যসৃষ্টি করে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষের পরাজয় ও বীরত্বের জয়গান প্রতিধ্বনিত হয়। আমরা এবার ওঁর দেওয়া সাহিত্যের অংশের মধ্যে এই পটভূমিকার প্রয়োজন দেখব।

সাহিত্য ও চিন্তার পটভূমিকায় লেখক বলেছেন, মুঘল যুগ থেকে ফারসী সংস্কৃতির বিস্তারের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ায় কাব্যের ক্ষেত্রে মিশ্রভাষার ব্যবহার দেখা যায়। "নবাবী আমলে যে রুচিবিকৃতির সূত্রপাত হয়েছিল, ভারতচন্দ্রের কাব্যে তার ছাপ আছে…কোম্পানীর আমলে জীবনে নিশ্চয়তাবোধের অভাবের মানুষ যখন পীড়িত, তখন সে বিকার আরো ব্যাপক হয়ে উঠল, রামপ্রসাদের মত ভক্তকবির রচনায়ও তার পরিচয় আছে" (পৃ. ১৪৩)। কোম্পানি আমলে আইন ও শৃংখলা বলতে লেখক কি বলছেন, সেটা এখানে প্রশ্ন করা যেতে

পারে। লেখক এখানে দুই ধরনের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে (একটি শহরের ও অন্যটি গ্রামাঞ্চলের) ঐ ছবিটা দেখাতে পারতেন, যেটা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁর উক্তিতে কিছুটা বেরিয়ে আসে। আসলে অর্থনৈতিক জীবন গ্রামাঞ্চলের সাধারণ লোকদের দুরবস্থার মধ্যে ফেলেছিল, এটা আজ আমাদের কারুরই অজানা নয়। মধ্যবিত্তের ঐ গ্রামাঞ্চলকে উপেক্ষা করা—"চাষা" বলা হয় আচার-ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য রেখে—ঐ জীবনের অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছিল, যদিও শহরে আইনশৃংখলা প্রচলিত অর্থে কিছু কম ছিল না। তাই ঐ nouveau richo-এর দৌলত, সমাজ ও রুচির সমীকরণ করতে পারে না। তার লব্ধ-আহরিত ধনের dynamism এত বেশি যে, সমাজ তখন চিরাচরিত পথে আর গ্রহণ করতে পারছে না। ঐ ধন নিয়োগ করার মত পথ ইংরেজ-শাসিত সমাজে এদের আর নিশ্চিহ্ন না। ফলে Investment-এর পথে না গিয়ে বিকৃত রুচির মধ্য দিয়ে ঐ শ্রেণী আত্মতৃপ্তি খোঁজে—যার ছবি আমরা নূতন কলকাতার প্রতীক হিসাবে পাই।

অন্যদিকে, "নারী সম্বন্ধে অবিশ্বাস ও পুরুষের তুলনায় তার আপেক্ষিক হীনতা ও সামাজিক ন্যূন অবস্থার প্রচারকে" লেখক "মধ্যযুগীয় পরিবেশের অনিবার্য ফল" বলে অভিহিত করে বলেছেন যে, এ মনোভাবের "মূলে সেই রাষ্ট্রিক নৈরাজ্যের দিনে সংসারের সর্বাংগীন বিশৃংখলা ও মানুষের আত্মপ্রত্যয়ের অভাবও নিহিত ছিল" (পৃ. ১৪৬)। এটি কি শুধু মধ্যযুগেই ছিল, আজকে নেই? কলকাতার হাইকোর্টে বিভিন্ন মামলার ইতিহাস পরীক্ষা করলে কি এর থেকে অন্য কোনো ছবি পাওয়া যায়? দ্বিতীয়ত, লেখক বলেছেন, "প্রেম এখানে ইন্দ্রিয়বিলাসের নামান্তর রূপেই দেখা দিয়েছে", "মধ্যযুগের পক্ষে যা স্বাভাবিক" (পৃ. ১৪৬)। মধ্যযুগের আমীর খসরু থেকে মহম্মদ জয়সী ও অন্যান্যদের মধ্যে "ইন্দ্রিয়বিলাস" প্রেমের মধ্যে খুবই কম আসে বলে সচরাচর বলে আসা হয় (দ্রষ্টব্য : মনতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা রোমান্টিক কাব্যের আওয়াধী-হিন্দি পটভূমি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭১)। কিছু বৈষ্ণব কবিতায় প্রেমের পরিপূর্ণতা ও মিলন খুব সুন্দরভাবে এসেছে এবং প্রেমের ধ্যানধারণায় তার চেয়ে বলিষ্ঠ লেখা খুব কমই আছে।

এই "মিশ্র ভাষারীতির কাব্যকে" লেখক "ক্ষয়িষ্ণু সংস্কৃতিধারার নিদর্শন বলে গণ্য" (পৃ. ১৪৭) করেছেন। ডক্টর হারমান গোয়েৎজের অভিমত ধরে উনি বলেছেন যে, ঐ কাব্যধারায় "ঐহিক কামনার চেয়ে পারমার্থিক আকাংক্ষা প্রায়ই বড় হয়ে উঠে। তাই এতে...যুদ্ধকাহিনীর নায়ককেও দেখি অলৌকিক শক্তিতে

বলীয়ান" (পৃ. ১৭১)। সুযোগ্য ঐতিহাসিক পিটার হার্ডি সুলতানী যুগের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের সমালোচনায় ঐ কথাই বলেছেন, যার থেকে সন্দেহ জাগে যে এগুলো ক্ষয়িষ্ণুতার চিহ্ন কিনা।

এর পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে লেখক বিভিন্ন কালের সাহিত্যিকদের রচনা ও জীবনী আলোচনা করেছেন, যেটা ইতিহাসের ছাত্রদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। দুঃখের বিষয়, ভারতবর্ষে এই ধরনের সাহিত্য থেকে ইতিহাস-রচনার কাজ প্রায় কিছুই হয়নি। সেক্ষেত্রে এই বই আমাদের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, যদিও লেখক সাহিত্য ও ইতিহাসের নিবিড়তা বিশেষ সৃষ্টি করতে পারেননি। ফলে তাঁর বিশাল ঐতিহাসিক পটভূমিকা কিছু পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় থেকে যায়।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে লেখকের আলিগড় ধারা থেকে মুসলমান স্বাতন্ত্র্যবাদ ও মুসলমান সমাজে ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বিরূপতার সৃষ্টি, বর্তমান গবেষণার কাছে আসে (দ্রষ্টব্য R. Zakaria, The Rise of of Muslims in Indian Politics, Bombay, 1970, এবং Karandikar, India in Transition to Modernity, Bombay, 1968)। অবশ্য গোপালকৃষ্ণের মত (Religion in Politics, *Indian Economic & Social History Review*, vol. VIII, No. 4, December 1971) যে হিন্দু সাম্প্রদায়িক রাজনীতি কোনকালেই খুব জোরালো ছিল না—লেখকের বিরুদ্ধে আসে, যেখানে অন্তত বাংলার অনুচ্চারিত সাহিত্যক্ষেত্র থেকে লেখক তাঁর সমর্থনে প্রচুর প্রমাণ দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম মানসে চরমপন্থী আন্দোলনের ছাপ বিশেষ, নেই (দ্রষ্টব্য : হীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, 'বঙ্গভঙ্গ, বোমা ও ভদ্রলোক ১৯০৫-১৯১৮', চতুরঙ্গ, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৫, পৃ. ৩২৩-৩২৮ ও কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬, পৃ. ২৪৬-৫৫) এবং ইংরেজদের সঙ্গে আপোষ করে চলবার স্বপক্ষে মুসলমানদের মধ্যে তাঁদের সংখ্যাই বেশি। লেখকের মতো এই মতকে হিন্দু-জাগরণের ইতিহাস বলে ব্যাখ্যা করলে বাঙালী সমাজের বিশেষ একটি ধারাকে ও তার অন্তর্নিহিত অনৈক্য ও পরস্পরবিরোধিতাকে এড়িয়ে যাওয়া হবে না?

এ সব সত্ত্বেও লেখকের এই প্রয়াসকে অসামান্য বলে অভিনন্দন জানাতে কুণ্ঠা বোধ হয় না এবং প্রকাশককে এক বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে সুন্দর ছাপাই ও বাঁধাই করে পুনর্মুদ্রণ করার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা লেখকের পরবর্তী লেখার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করব। বাংলা সাহিত্য, সমাজ ও

ইতিহাসের প্রয়না কত নিবিড় হতে পারে, এটি তারই নিদর্শন। পশ্চিম বাংলায় উনিশ শতকের উপর এধরনের ছোটখাট রচনা থাকলেও এত বড় পটভূমিকায় কোনো উল্লেখযোগ্য কাজ নেই। দুই বাংলার পারস্পরিক মতামতবিনিময়ের শুভসূচনায় এইজাতীয় বলিষ্ঠ পদক্ষেপের প্রতীক্ষায় রইলাম।

রাজা রামমোহন রায়ের জন্মাব্দ

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহনের জন্মসাল নিয়ে সম্প্রতি যেমন বিতর্ক দেখা দিয়েছে, পূর্বে তেমন কখনো হয়নি। এবার ভারত সরকার মীমাংসা করবার জন্য এগিয়ে আসাতেই হয়তো এ বিষয়ে আগ্রহ ব্যাপকতর হয়েছে।

অবশ্য বিতর্ক যে পূর্বে একেবারেই ছিল না, তা নয়। রামমোহনের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই রবার্ট মণ্টগোমারি মার্টিন তর্ক তুললেন টাইমস এবং অন্যান্য পত্রপত্রিকায় রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে যে-সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে, সে-সব যথার্থ নয়। জন্মসাল নিয়ে মতভেদের কথা তিনি স্পষ্টই বলেছেন। দুটি সর্বাধিক প্রচলিত সালের একটিকেও মার্টিন স্বীকৃতি দেননি।

এর পরে এই বিতর্ক সম্বন্ধে রেভারেণ্ড সি. এইচ. ডাল (Rev. C. H. Dall) 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় একটি চিঠি লেখেন ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে। তিনি এই চিঠি দিয়ে জন্মাব্দ সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি, তথাপি এই বিতর্কের ইতিহাসে 'ইণ্ডিয়ান মিররে'র চিঠির একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। এই চিঠি থেকেই জানা যায়, ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দেও রামমোহনের জন্মাব্দ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে মিস্ সোফিয়া ডবসন কলেটের রামমোহন-চরিত (The Life and Letters of Raja Rammohun Roy) প্রকাশিত হয়। সেই সঙ্গে নতুন করে বিতর্ক ওঠে। মিস্ কলেটের অভিমত পরবর্তী কালে অনেক লেখককেই প্রভাবান্বিত করেছে।

১৯৩৩ সালে রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জন্মাব্দের সমস্যা নিয়ে আবার কিছু আলোচনা হয়েছিল। দ্বিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তীর প্রাক্কালে একটি বিশেষ কমিটি এই সমস্যা নিয়ে বিশদরূপে আলোচনা করে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। এ সিদ্ধান্ত অনেকেই যুক্তিসহ বলে মেনে নিতে পারবেন না। অবশ্য নতুন কোনো তথ্য আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত জন্মাব্দ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সম্ভব নয়। শুধু বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে অধিকতর সম্ভাব্য সাল কোনটি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে রামমোহনের অন্ততঃ পাঁচটি জন্মাব্দ পাওয়া যায়। এই সালগুলি হলো ১৭৭২, ১৭৭৪, ১৭৭৬, ১৭৮০ ও ১৭৮৪। এদের মধ্যে প্রথম দুটি সর্বাধিক প্রচলিত। পরবর্তী তিনটি তারিখের সূত্র হয়তো অনেকের নিকট অজানা। তাই কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

রামমোহনের জন্মাব্দ ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দ, এই তথ্য পাওয়া যায় নিম্নলিখিত বই-দুটি থেকে :

1. A Dictionary of General Biography...ed. by W. L. R. Cates, London, Longmans, 1867.
2. Universal Pronouncing Dictionary of Biography and Mythology, by J. Thomas, vol. II, Philadelphia, Lippincott, 1874.

১৭৮০ সালের উল্লেখ পাওয়া যায় :

1. Haydn's Universal Index of Biography, ed. by J. Bertrand Payne, London, E. Moxon, 1870.
2. Nouvelle Biographie Generale, Paris, Firmin, Didot Frerers, 1862, vol. 41.
3. In a Memoir added to Rammohun's The Precepts of Jesus—the guide to peace and happiness, London, Unitarian Society, 1823.
4. Victor Jacquemont's note dated 25th June, 1829 in his Diary states : "Rammohun Roy is 50 years of age."

এছাড়া কয়েকটি প্রবন্ধেও ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দকে রামমোহনের জন্মাব্দ হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

মাত্র একটি দলিল থেকে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ রামমোহনের জন্মসাল হিসাবে পাই। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের 'দি মিশনারি রেজিস্টারে'র সেপ্টেম্বর সংখ্যায় রামমোহনের Translation of an abridgment of the Vedant-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সমালোচনার পূর্বে পাঠকদের সুবিধার জন্য লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধৃত করছি :

"Of Rammohun Roy, we have received reports from several friends. The substance of them is this :

"He is a Brahmin, about thirty-two years of age, of extensive landed property, and of great consideration and influence;..." (page 370).

১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বত্রিশ বছর বয়স হলে জন্মাব্দ পাওয়া যায় ১৭৮৪।

১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দকে আমরা সহজেই অগ্রাহ্য করতে পারি। ১৭৮০ এবং ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দও পণ্ডিতদের নিকট সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। উপেক্ষার নিশ্চয়ই যথেষ্ট যুক্তি আছে। কিন্তু এই সাল দুটি—বিশেষ করে ১৭৮০—বাতিল করবার আগে একটু ভেবে দেখা উচিত। রামমোহনের জীবিতকালে তাঁর জন্মাব্দ সম্পর্কে যে চারটি উল্লেখ পাওয়া যায়, তার মধ্যে একটি ১৭৭৪ সালের, দুটি ১৭৮০ এবং একটি ১৭৮৪ সালের। রামমোহনের জীবিতকালে এই তারিখগুলি প্রচারিত হয়েছে বলেই এদের কিছুটা গুরুত্ব আছে। ঐতিহাসিক বিচারে ১৭৮০ বা ১৭৮৪-কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়তো কঠিন।

১৭৮০ সালটিকে গুরুত্ব দিয়েছেন রবার্ট মণ্টগোমেরি মার্টিন। রামমোহনের মৃত্যুর পর ১৮৩৩ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখের Court Journal পত্রিকায় তিনি একটি ছোট প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বলেছেন :

> "Many rumours and reports from pretended acquaintances [of Rammohun] are going the round of the public press. . A correspondent of the Times, among other mis-statements, observes that Rammohun Roy was about sixty years of age. The writer of this had *from Rammohun himself* the following facts : He was born at Burdwan, in the province of Bengal, *in the year 1780*, of illustrious ancestors..."

মার্টিন অভিযোগ করেছেন যে, অনেকেই রামমোহনের সঙ্গে পরিচয় ছিল—এমন মিথ্যা প্রচার করে ভুল তথ্য প্রচার করছে। মার্টিনের সঙ্গে রামমোহনের কিন্তু প্রকৃতই ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৮৩০ সালে (২৩শে জানুয়ারি) ব্রাহ্মসমাজ ভবন উদ্বোধন উৎসবে মার্টিন উপস্থিত ছিলেন ; রামমোহনের জীবনের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় মার্টিন তাঁর বাড়িতে থেকেছেন। তাছাড়া রামমোহন ও তাঁর বন্ধুদের পত্রিকা 'বেঙ্গল হেরাল্ড' সম্পাদনার দায়িত্ব ছিল মার্টিনের উপর। সুতরাং তাঁর বক্তব্যের মূল্য আছে। অবশ্য রামমোহনের মৃত্যুর পরে মার্টিনের বক্তব্য প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর দাবির যাথার্থ্য যাচাই করা সম্ভব ছিল না।

১৭৮০ বা ১৭৮৪ সালকে রামমোহনের জন্মাব্দ তাঁরাই বলেছেন, যাঁরা তাঁকে চিনতেন। রামমোহনের জীবনের ঘটনা বিচার করলে দেখা যায়, এই সাল দুটিকে গ্রহণ করা চলে না। তবে পরিচিত ব্যক্তিরা এমন ভুল করলেন কেন ?

একটা কারণ হয়তো এই যে, এঁরা বয়সটা বোধ হয় অনুমানের উপর নির্ভর

করে লিখেছেন—রামমোহনকে জিজ্ঞাসা না করে। রামমোহন ছিলেন সুপুরুষ, চমৎকার স্বাস্থ্যের অধিকারী। সুতরাং আসল বয়সের চেয়ে তাঁকে কমবয়সী দেখাত।

ভুল জন্মসাল বিভিন্ন বইপত্রে ছাপা হতে রামমোহন দেখেছেন। লণ্ডন থেকে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত The Precepts of Jesus-এর কপি পেয়ে রামমোহন স্বীকৃতিপত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ পুস্তকে তাঁর জন্মসাল যে ১৭৮০ বলে উল্লেখ করা হয়েছে, সেসম্বন্ধে তিনি কিছু বলেননি। এই নীরবতাকে সালটিকে স্বীকার করে নেওয়া বলে ধরা যেতে পারে না। এখনও দেখা যায়, জীবিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিভিন্ন বইপত্রে বিভিন্ন তথ্য দেওয়া হয়। যদুনাথ সরকার ছিলেন রবীন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ সুহৃদ্। তিনিও রবীন্দ্রনাথের ঠিক জন্মসালটি দেননি তাঁর India through the Ages বইটিতে। আর সেই ভুল নিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, তারও প্রমাণ নেই।

এই তিনটি সাল বাদ দিলে থাকে ১৭৭২ ও ১৭৭৪। ১৭৭২ সরকারী স্বীকৃতি পেলেও ১৭৭৪ সাল অনেক বেশি প্রচলিত। মিস্ কলেটের জীবনীর পূর্বে এই সালটিকে রামমোহনের জন্মাব্দ হিসাবে প্রায় সকলেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন। মিস্ কলেটও স্বীকার করেছেন :

"The date most frequently accepted is that given on his tombstone, viz., 1774 ;

কোন্ কোন্ লেখক ও গবেষক এ দুটি সাল ব্যবহার করেছেন, তার বিস্তৃত তালিকা দেবার বিশেষ কোনো মূল্য নেই। কারণ অধিকাংশ লেখকই জন্মাব্দ নিয়ে বিচার করতে বসেননি। কেন যে তাঁরা একটি সালকে স্বীকার করেছেন অন্যটিকে করেননি, তার ব্যাখ্যা মাত্র অল্প কয়েকটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। রেভারেণ্ড ডাল্, মিস্ কলেট, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতির ন্যায় অল্প কয়েকজন এই ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ডঃ মজুমদারের সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থ 'On Rammohan Roy'-এ জন্মাব্দ নিয়ে যেরূপ বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে, পূর্বে তেমন কোথাও হয়নি।

১৭৭২ সালটি রামমোহনের জীবিতকালে কোথাও উল্লেখ করা হয়েছে বলে জানা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পরে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু প্রবন্ধ বেরিয়েছে। তাদের কোনোটিতে ১৭৭২ জন্মসাল বলে উল্লেখ করা হয়নি। অন্ততঃ আমরা দেখিনি। যতদূর জানা যায়, ১৭৭২ সালটিকে রামমোহনের জন্মাব্দ হিসাবে উল্লেখ সর্বপ্রথম করা হয়েছে কলকাতার ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত 'দি

প্রিসেপ্‌ট্‌স অব জেসাস' গ্রন্থে। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকাযুক্ত হয়ে রামমোহনের বইটির নতুন সংস্করণ সোসাইটি বের করে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে। ভূমিকায় লেখকের পরিচয় দিতে সম্পাদক বলেছেন :

"He was born ..in the month of (Jasteo, 1179, Bengali style) May A.D. 1772 ." (ভূমিকার ৩য় পৃষ্ঠা)।

এখানে খ্রীষ্টীয় সাল ছাড়া পাওয়া গেল বাংলা সাল এবং ইংরেজী ও বাংলা জন্ম-মাস ; পূর্বে জন্মমাস জানা ছিল না।

সে সময় কলকাতা ইউনিটেরিয়ান সোসাইটির প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন রেভারেণ্ড সি. এইচ. ডাল। 'দি প্রিসেপ্‌ট্‌স্ অব জেসাস' প্রকাশিত হবার প্রায় বাইশ বছর পরে রামমোহনের জন্মাব্দ সম্পর্কে 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় তিনি একটি চিঠি লেখেন। চিঠি ছাপা হয় ১৮ই জানুয়ারি, ১৮৮০ সালে। বিশেষ গুরুত্ব আছে বলে সম্পূর্ণ চিঠিটি উদ্ধৃত করা হলো :

"There need be no doubt whatever as to the year and the month in which Rammohan Roy was born. His son, Roma Pershad Roy, chief pleader of the Supreme Court, made the matter perfectly clear to a circle of visitors and clients. in 1858, at his residence, the well known house of his father in Calcutta. Kisori Chand Mitter was present and Dr. Rajendra Lala Mittra, and I was one of the listeners. I put his words on record at the time and here they are :—

'My father was born at Radhanagar near Krishnagar, in the month of May, 1772 or according to the Bengali Era, in the month of Jaista 1179.'

"I asked for the day, and Roma Pershad replied that I cannot tell without consulting the horoscope, which at this distance of time, is not easy to be found.

"After this, it need not be surmised that the Great Rammohan was born in 1774, or in 1780.

"We need not guess, since we have the highest authority for saying that Rammohan was born in May 1772.

Yours &c.
Dall."

এই চিঠি প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৭৭৪ সালের একাধিপত্য কিছু হ্রাস পেতে আরম্ভ করে। কারণ রামমোহনের পুত্র যে সালটিকে পিতার জন্মাব্দ বলেছেন, লোকের মনে তাকে মেনে নেবার প্রবণতা সহজেই দেখা দেয়। রমাপ্রসাদ নিজে অবশ্য এ বিষয়ে কোথাও কিছু লেখেননি। সবই ডালের জবানীতে জানা গেছে। মিস্ কলেট এই চিঠি পড়ে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছেন এবং তারই ফলে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ রামমোহনের জন্মাব্দ বলে তাঁর জীবনীতে গৃহীত হয়েছে। মিস্ কলেট রামমোহনের জন্মের একটি সুনির্দিষ্ট তারিখও দিয়েছেন (২২শে মে); —এই তারিখটি পেয়েছেন রামমোহনের আর-এক পুত্র রাধাপ্রসাদের দৌহিত্র ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। রামমোহনের দুই বংশধরের সূত্র থেকে জন্মসাল ও তারিখ পাওয়া গেছে ঘোষণা করায় একে পারিবারিক ঐতিহ্য এবং যথার্থ বলে অনেকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। কলেটের জীবনী 'অফিসিয়েল বায়োগ্রাফি'র মর্যাদা লাভ করায় ব্রাহ্মসমাজে ধীরে ধীরে ১৭৭২ সালটি স্বীকৃতি পায়।

রেভারেণ্ড ডাল্ ও মিস্ কলেটের সংগৃহীত তথ্য কতটা নির্ভরযোগ্য, তা বিচার করে দেখা যেতে পারে।

ডালের ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি থেকে প্রকাশিত রামমোহনের পুস্তকের ভূমিকায় জন্মাব্দ দেওয়া হয়েছে ১৭৭২। রমাপ্রসাদ ডাল্‌কে পিতার সঠিক জন্মসাল সম্বন্ধে বলেন ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে; সোসাইটি থেকে ঐ বছরই 'দি প্রিসেপ্‌ট্‌স্ অব জেসাস' প্রকাশিত হয়। যদিও পূর্বে ১৭৭৪, ১৭৮০ ইত্যাদি সালই রামমোহনের জন্মাব্দ বলে ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পাদক ১৭৭২-এর পক্ষে কোনো যুক্তি দেখাননি। অথচ রমাপ্রসাদকে উদ্ধৃত করে তাঁদের বক্তব্য জোরের সঙ্গে সমর্থন করা যেত।

'প্রিসেপ্টস্ অব জেসাস'-এর পাণ্ডুলিপি ছাপতে পাঠানো হয় ১৮৫৮ সালের মে মাসে। ঐ বছরের প্রথম ছয় মাসে ডাল্ সাহেব কোন্ কোন্ নাগরিকের সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেছেন, তার মুদ্রিত বিবরণে রমাপ্রসাদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা নেই। তাহলে কি তাঁর সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল জুলাই থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে? কিন্তু বই তো আগেই ছাপা হয়ে গেল! তাহলে রমাপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা হবার পূর্বে ইউনিটেরিয়ান সোসাইটি নতুন জন্মসাল পেলেন কোথায়?

আলোচনার সময় নাকি রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র উপস্থিত ছিলেন। রাজেন্দ্রলাল এ সম্পর্কে কিছু লেখেননি। কিন্তু

কিশোরীচাঁদ কলিকাতা রিভিউ পত্রিকায় (১৮৬৬) কার্পেন্টারের 'দি লাস্ট ডেইজ' সমালোচনা উপলক্ষে ১৭৭৪ সালকে নতুন করে সমর্থন করেছেন। তিনি রমাপ্রসাদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করায় ডাল সাহেবের তথ্য কতদূর নির্ভরযোগ্য, সে বিষয়ে সংশয় জাগে। তাছাড়া বাইশ বছর এই মূল্যবান তথ্যটি তিনি কেন জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন, তার কারণ বুঝা যায় না।

১৮৭১ সালের ১১শে নভেম্বর ডাল সাহেব কলকাতার ইউনিয়ন আর্টস্ ক্লবে রামমোহনের উপরে একটি বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতায় তিনি বলেছেন: "...his (Rammohun's) pure beneficent and studious life of *more than 60 years.*" যে মাসে রামমোহনের জন্ম, সেপ্টেম্বরে মৃত্যু। সুতরাং উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে জন্মসাল পাওয়া যায় ১৭৭৩, ১৭৭২ নয়। এর নয় বছর পরে তিনিই 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় লিখলেন, রামমোহনের জন্ম হয়েছে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

মিস কলেট ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে 'An historical sketch of the Bramho Somaj' নামে ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার একটি পুস্তিকা লেখেন। এখানে রামমোহনের জন্মসাল ১৭৭৪ দেওয়া হয়েছে। ভূমিকায় কলেট বলেছেন

> "The statements of the narrative have been drawn from *innumerable Bramho authorities*, public and private."

অসংখ্য প্রামাণিক সূত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য মিস্ কলেট অল্পদিনের মধ্যেই বাতিল করে দিলেন ডাল সাহেবের চিঠির উপর নির্ভর করে।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার বিভিন্ন সংস্করণে রামমোহনের জন্মসাল বদল হয়েছে একবার ১৭৭২, পরের বার ১৭৭৪। প্রথম বার ১৭৭২ ব্যবহার করবার পর মহেন্দ্রনাথ রায় বিশ্বাসিধি ১৮৯১ সালের অগাস্ট মাসে মিস্ কলেটকে চিঠি দিয়ে জানতে চান, ১৭৭২ সালের ২২শে মে রামমোহনের জন্ম হয়েছিল, এ তথ্যের সূত্র কি? এর উত্তরে কলেট জানালেন:

> "The date of the Raja's birth is the 22nd May of 1772. This fact came to me from Babu P. B. Mukherjee of Rajshahi College, who had it from Babu Rabindranath Tagore who had it from Babu Lalitmohan Chatterjee, great grandson of the Raja."

তথ্যনিষ্ঠ জীবনীকার হিসাবে মিস কলেটের উচিত ছিল ললিতমোহন

চট্টোপাধ্যায়কে সরাসরি লেখা। কিন্তু তিন হাত ঘুরে যে সংবাদ পৌঁছল, তারই উপর তিনি নির্ভর করলেন। মহেন্দ্র বিদ্যানিধি সত্যনির্ণয়ের জন্য ললিতমোহনকে চিঠি দিলেন। তাঁর উত্তর :

"I have heard from my grandfather, the late Babu Radha Prashad Roy the first born of the celebrated Rammohan Roy, that his father died in his 62nd year (sixty-second), date and month unknown."

ললিতমোহনের চিঠি থেকে জানা গেল, রামমোহনের জন্মসাল ১৭৭২ ; কিন্তু মাস বা তারিখ তিনি জানেন না। তাহলে সঠিক তারিখটি মিস্ কলেট কোথায় পেলেন ?

মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধির সঙ্গে কলেট ও ললিতমোহনের চিঠিপত্র আদান-প্রদানের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৩০২ সনের শ্রাবণ সংখ্যার 'জন্মভূমি'তে। ২২শে মে তারিখটি ললিতমোহনের জানা নেই, একথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও মিস কলেটের রামমোহন-চরিতের পাদটীকায় সঠিক জন্মদিনটির জন্য তাঁকেই প্রমাণ হিসাবে উপস্থিত করা হয় প্রত্যেক সংস্করণে—কোনো সম্পাদকীয় টীকা ছাড়াই।

মিস্ কলেট তাঁর জীবনীর প্রথম পৃষ্ঠাতেই রামমোহনের দুই বংশধরকে প্রমাণ হিসাবে এনে জন্মসাল ও তারিখ সম্বন্ধে পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর সেই প্রচেষ্টা তথ্য ও যুক্তিদ্বারা সমর্থিত নয়।

আরও একটি কথা। ললিতমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মদনমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প' বইটিতে ১৭৭৪ সালই জন্মাব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। তেমন কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত পারিবারিক ঐতিহ্য থাকলে এটা কি করে সম্ভব ? প্রথম সংস্করণে ভুল যদি বা হয়, দ্বিতীয় সংস্করণে তা সংশোধন হবার কথা। কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণেও এই এক সালই আছে।

কলেটের বই প্রকাশিত হবার পর কোনো কোনো বিশিষ্ট লেখক ১৭৭২ সালকে গ্রহণ করেছেন, পূর্বের অভিমত পরিবর্তনের কোনো কারণ না দেখিয়ে। উল্লেখ করা যেতে পারে শিবনাথ শাস্ত্রীর কথা। তিনি 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'-এ ১৭৭৪ সালকেই জন্মাব্দ বলেছেন। কিন্তু History of Brahmo Samaj-এ গ্রহণ করেছেন কলেটের সাল-তারিখ, অথচ ভূমিকায় তিনি যে-সকল বইপত্রের নিকট ঋণ স্বীকার করেছেন, সেগুলি ১৭৭৪কেই স্বীকৃতি দিয়েছে—একমাত্র কলেটের জীবনী ছাড়া।

জন্মাব্দ হিসাবে ১৭৭৪ সালটি রামমোহনের জীবিতকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সমাধিতে উৎকীর্ণ হয়েছে এই সাল। বহু বিশিষ্ট ব্রাহ্ম নেতা এবং ব্রাহ্মসমাজের ঐতিহাসিক ১৭৭৪ সালটিকে ব্যবহার করেছেন। প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ এই জন্মাব্দটি ব্যাপকরূপে প্রচলিত হয়ে আসছে। এর তুলনায় ১৭৭২-এর ঐতিহ্য অনেক ম্লান।

জন ডিগবি ছিলেন রামমোহনের মুরুব্বী এবং বিশেষ শুভানুধ্যায়ী। তাঁর অধীনে রামমোহন চাকরি করেছেন এবং ইংরেজী ভালো করে শিখেছেন তাঁরই কাছে। রামমোহনকে রংপুরের স্থায়ী দেওয়ান হিসাবে নিযুক্ত করবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখাবার ফলে বোর্ড অব রেভিনিউর সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে।

রামমোহন-কৃত কেন উপনিষদ্ ও বেদান্তের ইংরেজী অনুবাদের ব্রিটিশ সংস্করণ লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে; এই সংস্করণের জন্য ডিগবি একটি ভূমিকা লিখে দেন। ভূমিকায় রামমোহনের বয়স সম্বন্ধে দুটি প্রামাণিক উক্তি আছে। একটি হলো:

"Rammohun Ray...is by birth a Brahmin of very respectable origin in the province of Bengal, about 43 years of age."

১৮১৭ সালে তেতাল্লিশ বছর বয়স হলে জন্মাব্দ পাওয়া যায় ১৭৭৪। দ্বিতীয় উক্তিটি একটু পরোক্ষ। ডিগবি বলেছেন, রামমোহন বাইশ বছর বয়সে ইংরেজী শিখতে আরম্ভ করেন এবং পাঁচ বছর পরে যখন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় তখন ইংরেজীতে মোটামুটি কথাবার্তা বলতে পারতেন, কিন্তু ভালো করে লিখতে পারতেন না। ডিগবি প্রথম কলকাতা এসেছিলেন ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। সুতরাং দুজনের পরিচয় হয় ১৮০১ নাগাদ। তাহলে তখন রামমোহনের বয়স ছিল সাতাশ। এই হিসেব থেকেও জন্মাব্দ পাওয়া যায় ১৭৭৪।

ডিগবির উল্লিখিত বয়সের প্রামাণিকতা স্বীকার করতে হয় দুটি কারণে। প্রথমতঃ, ডিগবির সঙ্গে রামমোহনের ঘনিষ্ঠতা ছিল বেশ কয়েক বছর যাবৎ। চাকরির জন্য আবেদন করেছেন তাঁর কাছে। অন্যান্য বিবরণের সঙ্গে বয়সটাও তাতে উল্লেখ করতে হয়েছে এবং ডিগবি তা দেখেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, অন্যের লেখা বইপত্রে তাঁর জন্মাব্দ যা-ই থাক না কেন, নিজের বইয়ে যাতে সঠিক সালতারিখ থাকে সে বিষয়ে রামমোহন স্বভাবতঃই যত্ন নেবেন; ডিগবি ভুল করলে তার সংশোধন করবেন।

রামমোহনের মৃত্যুর কয়েক দিনের মধ্যেই প্রথমে 'ব্রিস্টল গেজেটে' এবং পরে 'ব্রিস্টল মার্কারি'তে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশিত হয়। লেখক ডঃ কার্পেন্টার। তিনি বলেছেন, খুব সম্ভব ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ডঃ কার্পেন্টার যখন ভারতে ছিলেন, তখন থেকেই রামমোহনের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। রামমোহন লণ্ডনে আসবার পর ডঃ কার্পেন্টার ছিলেন তাঁর সঙ্গী। ডেভিড হেয়ারের ভাইয়ের বাড়িতে রামমোহন প্রায় দুবছর থেকেছেন। এই বাড়িতেও কার্পেন্টার যেতেন। রামমোহনের নিজের কাছ থেকে যা জানতে পেরেছিলেন এবং অন্যান্য নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে যা জানতে পেরেছেন, তার উপর ভিত্তি করে কার্পেন্টার প্রবন্ধটি লিখেছেন।

ইংলণ্ডযাত্রায় হুগলী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল জেমস সাদারল্যাণ্ড ছিলেন রামমোহনের সহযাত্রী। দীর্ঘদিনের জাহাজ-জীবনে দুজনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যার 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' সাদারল্যাণ্ড রামমোহনের উপরে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধের শেষ ভাগে বলা হয়েছে

"In the latter part of his life, which closed in his sixtieth year, his manly figure began to droop...."

এই উক্তি থেকেও পাওয়া যাচ্ছে ১৭৭৪ জন্মাব্দ।

১৭৭৪-এর পক্ষে এই তিনটি প্রমাণই এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া যাঁদের সঙ্গে রামমোহনের ছিল ঘনিষ্ঠতা। ১৭৭২-এর সপক্ষে এ ধরনের প্রমাণ নেই।

কেশবচন্দ্র সেন 'ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় (১৮৬৩) বলেছেন :

"Only a year after the establishment of his Church, he lived for 18 months and died in Aswin 1755 (1833) in the *sixtieth year* of his age."

সুতরাং ১৭৭৪ সালকে স্বীকার করা হয়েছে।

রাজনারায়ণ বসু এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে ১৭৭৪ সালকেই রামমোহনের জন্মাব্দ হিসাবে মেনে নিয়েছিলেন, তার প্রমাণ দিয়েছেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁর সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থে।

'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' রচনা করেন ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল (চিরঞ্জীব শর্মা) ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বিতীয় সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখেন মিস্ কলেট ১৮৭৩ সালে। তৃতীয় ইতিহাসটির লেখক এসিয়াটিক সোসাইটির সহ-সম্পাদক জি. এস.

লিওনার্ড। শেষোক্ত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে। এই তিনটি ইতিহাসই ব্রাহ্মসমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের কাছ থেকে তথ্য যাচাই করে লেখা। রামমোহনের নিকটে ছিলেন, এমন লোক তখনও জীবিত। এই তিন ঐতিহাসিকই ১৭৭৪কে রামমোহনের জন্মাব্দ বলে গ্রহণ করেছেন।

রামমোহনের সমাধিতেও তাঁর জন্মাব্দ ১৭৭৪। নিশ্চয়ই অনেক বিবেচনার পরে এই তারিখটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত করা হয়েছিল। সমাধিতে ভুল তথ্য দিলে মৃতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। অবশ্য তর্ক উঠতে পারে, সমাধিতে প্রস্তর-ফলক দেওয়া হয়েছে রামমোহনের মৃত্যুর অনেক পরে—১৮৭২ সালে। দ্বারকানাথ ঠাকুর সমাধি নির্মাণ করবার পর থেকে ১৮৭২ সালে নতুন লিপি না খোদাই করা পর্যন্ত সমাধির উপরে শুধু এই কটি কথা ছিল Rajah Ram Mohun Roy died 27 September 1833. এই স্মৃতিলিপিতে ১৭৭৪ বা অন্য কোনো সালকেই জন্মাব্দ হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু রামমোহনের মৃত্যুর চল্লিশ বছর পরেও ১৭৭৪ সালকে স্মৃতিলিপিতে জন্মাব্দ হিসাবে উল্লেখ করায় প্রমাণিত হয় যে, এইটিই সর্বজনস্বীকৃত ছিল। তাছাড়া পারিবারিক ঐতিহ্যের মর্যাদাও রক্ষিত হয়েছে। কারণ স্মৃতিলিপিতে আছে:

"This tablet records the sorrow and pride with which his memory is cherished by his *descendants*."

জন্মাব্দ নির্দ্ধারণের দায়িত্ব রামমোহনের বংশধররাই নিয়েছেন।

বহু খ্যাতনামা মনীষী এবং অনেক দেশী ও বিদেশী রেফারেন্স বই ১৭৭৪ সালকে রামমোহনের জন্মাব্দ বলে উল্লেখ করেছেন। এখানে সেইসব সূত্রের আংশিক উল্লেখও সম্ভব নয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং আরও অনেকে সাময়িকপত্রের প্রবন্ধে ১৭৭৪-এর সমর্থনে নানা যুক্তি উত্থাপন করেছেন। নিশ্চিত প্রমাণ না থাকলেও একথা বলা যায়, ১৭৭৪ সালই সর্বাপেক্ষা সম্ভাব্য জন্মাব্দ।

পুস্তক-পরিচয়

প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহ—লেখক কুণাল সিংহ, ওয়ার্ল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা. থেকে প্রকাশিত ১৯৯ পৃষ্ঠা, মূল্য দশ টাকা, ১৯৭২।

প্রাচীন গ্রন্থসংগ্রহের লেখক কুণাল সিংহ কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সহকারী গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থাগার পরিচালনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবার পর থেকেই শ্রীসিংহ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে যে সব প্রাচীন গ্রন্থাগার আজও তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছে তাদের সম্পর্কে সমষ্টিগত ভাবে একটি আলোচনা পাঠকের কাছে উপস্থাপন করার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের আনুকূল্যে এবং নিজের চেষ্টায় শ্রীসিংহ তাঁর সেই সাধু সঙ্কল্প সিদ্ধির সুযোগ পেয়েছেন। দুশো পৃষ্ঠার পরিসরে গ্রন্থকার বহু যত্নে হুগলি, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশপরগনা, হাওড়া জেলা, উত্তরবঙ্গ এবং কলিকাতার বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থাগার সম্পর্কে বহু জ্ঞাতব্য তথ্য সহজ এবং চিত্তাকর্ষক ভাষায় উপস্থাপিত করেছেন। এই সকল গ্রন্থাগারে যে সব প্রাচীন পুথিপত্র, পত্রপত্রিকা সংরক্ষিত হয়েছে, তার তালিকা বইখানির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। গ্রন্থখানি বিশেষভাবে গ্রন্থাগারবিদ্যা এবং কলাবিভাগের পাঠার্থীদের জন্যে লিখিত হলেও ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানকারীরাও এটি পড়লে উপকৃত হবেন। বিভিন্ন গ্রন্থাগারে রক্ষিত ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহের তালিকা অন্তর্ভুক্ত করে গ্রন্থকার সুধীসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এর ফলে দুষ্প্রাপ্য পত্রপত্রিকা, পুথিপত্র কোথায় এখনও পাওয়া যেতে পারে (অবশ্য অযত্ন এবং অনবধানতার ফলে মূল্যবান বহু পত্রপত্রিকা, নথি, দলিলপত্র অন্তত এদেশে লোকচক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হয়েছে—লেখকের এই সখেদ উক্তির যথার্থতাও আমাদের গভীর লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে) বইখানিতে তার নির্দেশ পাওয়া যাবে। গবেষক সমাজ এই নির্দেশের জন্য গ্রন্থকারকে অবশ্যই ধন্যবাদার্হ বলে মনে করবেন। কলকাতার যে সকল গ্রন্থাগারের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, বইখানির আগামী সংস্করণে তার সঙ্গে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিশেষ পুথিসংগ্রহশালার বিবরণ ও তালিকা যুক্ত হলে স্বল্পখ্যাত কিন্তু মূল্যবান আরও একটি গ্রন্থভাণ্ডারের পরিচয় আগ্রহী পাঠকসমাজের কাছে উদ্‌ঘাটিত হবে।

নিশীথরঞ্জন রায়

উনবিংশ শতকে বাংলার চৌকিদারী প্রথা ও ভূম্যধিকারি সভা

বিনয়ভূষণ রায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত জমিদারদের উপর নিজ নিজ জমিদারীতে শান্তিরক্ষার ভার ন্যস্ত ছিল। আসলে কিন্তু জমিদারেরা তখন রক্ষকের পরিবর্তে ভক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করিত। অর্থাৎ জমিদারের সহিত চোর-ডাকাতের একটা ভাল সম্পর্ক গড়িয়া উঠিয়াছিল।[১]

১৭৯২ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশের সময় সরকার নিজহাতে পুলিশব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহার ফলে চৌকিদারদের ব্যবস্থা পুলিশের উপর ন্যস্ত হয়। ১৮০৫ সালে জমিদারদের উপর পুলিশী ব্যবস্থা পুনরায় ফিরাইয়া দেওয়া হয়। দেশময় তখন এক বিরাট অরাজকতা দেখা যায়।[২] টি. টি. মেক্সপীয়র-এর মতে চৌকিদারেরাই এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিল। অনেকে মনে করেন যে, চৌকিদারদের মাহিনার পরিবর্তে ভূমি দেওয়ার প্রথার মধ্যেই ইহার কারণ নিহিত ছিল। কেননা তাহাদের পক্ষে সারারাত্রি পাহারা দেওয়া এবং দিনের বেলায় জমিদারদের আদেশ পালন করার ফলে তাহাদের হাতে চাষের জন্য আর কোন সময়ই অবশিষ্ট থাকিত না। তাই অনেকে ইহাদের জমি দেওয়ার পরিবর্তে মাহিনা দেওয়াই সমীচিন বলিয়া মনে করেন। এই মাহিনা কিভাবে আদায় হইবে, তাহা লইয়া তখন এক সমস্যার উদ্ভব হয়। তাই ১৮১৩ সালে ১৩নং আইনের দ্বারা ঢাকা, পাটনা এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপর তাহাদের সদর-কাছারির অধীনস্থ প্রতি দোকানঘরের উপর দুই আনা হিসাবে কর আদায়ের ভার দেওয়া হয়। পরে ১৮১৪ সালের ৩নং আইনে এই কর কলিকাতা ও ২৪ পরগনার ক্ষেত্রেও সম্প্রসারিত হয়। পরে ঐ সালের ৯নং আইনে উক্ত দায়িত্ব অন্যান্য ম্যাজিষ্ট্রেটদের উপরও ন্যস্ত হয়। ১৮১৬ সালে উক্ত আইন সংশোধিত হয়। ইহাতেও কিন্তু এই সমস্যার সমাধান হয় নাই। ১৮১৬ সালে বোর্ড অফ রেভেনিউ অভিযোগ করেন যে, জমিদারগণ আর চৌকিদারদের প্রতি নজর দিতেছেন না।[৩] ১৮৩৭ সালে সরকার পুলিশের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন এবং উক্ত সালের ৭৫নং সার্কুলার দ্বারা ও ১৮৩৮

সালের ৯নং সার্কুলার দ্বারা ম্যাজিস্ট্রেটদের নিকট হইতে তৎকালীন পুলিশী ব্যবস্থা সম্পর্কে মতামত জানিতে চাহেন। উক্ত সার্কুলারের উত্তরে বীরভূম, পাবনা ইত্যাদি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ চৌকিদারদের সহিত ডাকাতদের যোগসাজস আছে, এই মতামত প্রকাশ করেন। হুগলি, বর্ধমান, নোয়াখালি, বাঁকুড়া, ২৪ পরগনা ইত্যাদি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের মতে চৌকিদারশ্রেণী চোর-ডাকাতের মূলীভূত।[৪]

সুতরাং উপরোক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিষয়ের উপর ভূম্যধিকারি সভার মতামত বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ঐ বিষয়ে মতামত প্রকাশের জন্য ঐ সভা ১৮৪৯ সালে কয়েকটি বৈঠক ডাকে ও তাহাদের মতামত বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করে।[৫]

ঐ সভার মতে, "১৭৯৩ সালের ২২নং আইনের ১০ ধারায় চৌকিদার পুলিশের দারোগা ও গ্রাম্য পাইক সহযোগ হওয়াতে দেশে নিগূঢ় বিবরণ অবিজ্ঞতায় উক্ত বন্দোবস্ত ঘটনা হইয়া এই যাবৎ দৌরাত্ম্য নিবারণ হইতেছে না।"[৬] তাঁহারা মনে করেন যে, এদেশে বিবাহিত ও নিকাইত এই দুই শ্রেণীর জাতি আবহমান প্রচলিত আছে। "বিবাহিত শ্রেণী গৃহস্থ পদবাচ্য এবং নিকাইত শ্রেণী উচক্কা, চোর, বদমাএশ, নোচ্চা পদবাচ্য"। তাঁহাদের মতে, গৃহস্থ শ্রেণীর লোকেরা কখনও কুকর্ম করিতে পারে না। কেননা যদি গৃহস্থের কর্তা কুকর্ম করেন তাহা হইলে তাঁহার স্ত্রীপুত্রপরিবার তাঁহাদের নিজ নিজ কল্যাণের জন্য তাঁহাকে কুকর্ম হইতে সাবধান করেন। অপরদিকে নিকাইত শ্রেণীর মধ্যে এরূপ নাই। সভার মতে, তাহারা সর্বদা কুকর্মরত এবং তাহাদের স্ত্রীলোকেরা "এক পুরুষ অভাবে অন্য পুরুষের সহিত বসবাস করে"। তাই উক্ত সভা মনে করে যে, চৌকিদার, চোর ও ডাকাত এক দলভুক্ত এবং এক শ্রেণীবদ্ধ; তাহাদের মধ্যে কুটুম্বিতা ও পরস্পর স্ত্রীগ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে। অতএব চৌকিদার ও চোরডাকাতের দৌরাত্ম্য বন্ধ করিতে হইলে উহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে হইবে।[৭]

১৮৩৮ সালের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবদের রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশে বরকন্দাজের সংখ্যা ৪৮০২ জন এবং গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা ১০৭১৮৫ জন। থানার অধীনে গ্রাম্য চৌকিদারের হিসাব অনুসারে প্রত্যেক বরকন্দাজকে ২২ জন চৌকিদারের তদারক করিতে হয়। প্রত্যেক চৌকিদারের ধরিষ্ট কুটুম্বসংখ্যা ৮ জন করিয়া ধরিলে ঐ ২২ জনের কুটুম্বসংখ্যা হয় ১৭৬ জন। সুতরাং প্রত্যেক বরকন্দাজকে প্রকৃতপক্ষে ১৯৮ (১৭৬+২২) জনের তদারক করিতে হয়। কেননা ইহার আগেই বলা হইয়াছে যে, ভূম্যধিকারি সভার মতে

চৌকিদার ও চোরডাকাতের মধ্যে আত্মীয়কুটুম্বিতা প্রচলিত আছে। অতএব থানার দ্বারা শাসন করানো সম্ভব নয়।[৮]

গভর্নমেণ্ট-এর ১৮৩৮ সালের এক সার্কুলারে চৌকিদারদের প্রকৃত অবস্থা ও মাইনার বিষয়ে জানিতে চাওয়া হইয়াছে। চৌকিদারদের কি প্রয়োজন, তাহাও ঐ দফায় উল্লেখ আছে। পাটনা, বিহার, সাহাবাদ, ছাপরা ইত্যাদি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের মতে, চুরি ও ডাকাতির বিষয় চৌকিদারেরা ভালরূপেই জানে। তালুকদার ও জমিদারের লোকেরা নিজেদের ভরণপোষণের জন্য সর্বদা কুকর্ম করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহারা সুপারিশ করেন যাহাতে ঐ শ্রেণীর কর্মচারীর দ্বারা নিজ নিজ মাহিনা আদায় করিতে না দেওয়া হয়। ত্রিহুত-এর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, প্রতি ৫০ প্রজার উপর একজন চৌকিদার থাকা প্রয়োজন। দিনাজপুর, মালদহ, রাজসাহী ইত্যাদি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের মতে তাহারা ঐ পদের অযোগ্য, তাহারা চুরি-ডাকাতির সহিত যুক্ত এবং জমিদারদের বশীভূত।[৯]

গ্রামা চৌকিদারদের বেতন, পাটনা ম্যাজিস্ট্রেটের মতে সবচেয়ে কম দুই আনা এবং সর্ব উর্ধ্বে ইহার কোন ঠিক নাই। সারন জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, চৌকিদারেরা সামান্য বেতন পাইয়া থাকে। ভাগলপুরের ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, চৌকিদারের বেতনের কোন সঠিক হার নাই; কোথাও ইহারা দুই টাকা হইতে তিন টাকা বেতন পাইয়া থাকে, আবার কোথাও পাঁচ বিঘা হইতে দশ বিঘা পর্যন্ত জমি পাইয়া থাকে। ত্রিহুত জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, চৌকিদারেরা নিম্নে ৷৶১০ পয়সা ও উর্ধ্বে দুই টাকা পর্যন্ত বেতন পাইয়া থাকে। ইহাদের পরিবারসংখ্যা গড়ে ছয় হইতে সাত জন। সুতরাং তাহাদের সংসার চালানো যে কী দুঃসাধ্য ব্যাপার, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, চৌকিদারদের বেতন তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। এই বেতনের জন্য তাহাদের জমিদার ও তাঁহার কর্মচারীদের উপর নির্ভর করিতে হয়। সুতরাং প্রয়োজনের খাতিরে তাহারা জমিদার ও তাঁহাদের কর্মচারীদের বশীভূত হইয়া থাকে। রংপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন, চৌকিদারদের বেতন পাইবার কোন নিশ্চয়তা নাই এবং এই বেতনের জন্য তাহাদের অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়। বীরভূমের ম্যাজিস্ট্রেট জানান যে, চৌকিদারেরা বেতন হিসাবে ১২ বিঘা জমি পাইয়া থাকে। ইহাই হইতেছে চৌকিদারদের সম্পর্কে একপক্ষের ম্যাজিস্ট্রেটদের মতামত। ঠিক আর একপক্ষ মনে করেন যে, চৌকিদারদের বেতন মোটেই অল্প নহে। এই পক্ষে ফরিদপুর, বরিশাল ও ত্রিপুরার ম্যাজিস্ট্রেটরাই প্রধান। চৌকিদারদের বেতন

কত হওয়া উচিত, ইহা লইয়া বিভিন্ন মতামত তখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নোয়াখালি ও হুগলি জেলার ম্যাজিস্ট্রেটদের মতে, চৌকিদারদের বেতন তিন টাকার কিছু উপরে হওয়া উচিত। ২৪ পরগনা ও বারাসতের ম্যাজিস্ট্রেটরা চারি টাকা হওয়ার পক্ষে মত দেন। যশোহর ও নদিয়ার ম্যাজিস্ট্রেটরা বলেন যে, দুই টাকা হইতে সাড়ে তিন টাকা হইলেই যথেষ্ট। মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে, চৌকিদারদের বেতন কোথাও ২।০, আবার কোথাও ২৸০, কিন্তু হারাহারি হিসাবে তাহাদের বেতন ১।০; এই অল্প বেতনে কাহারো পক্ষে সংসার চালানো সম্ভব নয়। তিনি কিন্তু তাঁহার এই মতামত প্রকাশ করিয়াই চুপ থাকেন।[১০]

ভূম্যধিকারি সভা এই বিষয়ে মনে করেন যে, চৌকিদারদের বেতন তাহাদের প্রয়োজনের তুলনায় অল্প নহে। ১৭৯৩ সালের আগে চৌকিদারেরা একদিকে যেমন জমিদারদের নিকট হইতে তাহাদের কাজের পরিবর্তে জমি পাইত, অপরদিকে তেমন প্রজাদের নিকট হইতে বিবাহ, শ্রাদ্ধ, পুজা ইত্যাদি কাজে বখশিস ও খাবারদাবার পাইত। ইহা ছাড়া ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য কিছু ফসলও তাহারা পাইত। এই উপরি পাওনার পরিমাণ উক্ত সভার মতে টাকায় হিসাব করিলে মাথাপিছু প্রতি চৌকিদারের ৬ টাকা পড়ে। তখন প্রজা ও চৌকিদারদের মধ্যে একটা সদ্ভাব ছিল। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ঐ সদ্ভাব কেন নষ্ট হইল? এই প্রশ্নের উত্তরে ঐ সভা মনে করে যে, ১৭৯৩ সালের পর হইতে চৌকিদারেরা দারোগাদের অধীনস্থ হয়; ফলে প্রজার সহিত চৌকিদারের সম্পর্ক নষ্ট হইয়া যায়। তখন ডাকাতির তদারকির ভার দারোগা ও ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর ন্যস্ত হওয়াতে চৌকিদারদের কাজ অনেক হাল্কা হইয়া যায়। অপরদিকে চৌকিদারেরা কিন্তু তাহাদের পাওনা প্রজাদের নিকট হইতে পাইতে থাকে। কেননা ঐ দেয় দিতে অস্বীকার করিলে দারোগার দ্বারা ক্লেশ পাইতে পারেন, এই ভয়ে প্রজারা তাঁহাদের দেয় দেওয়া অবশ্যকর্তব্য বলিয়া মনে করেন।[১১]

চৌকিদারী ব্যবস্থা কিরূপ হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, এই প্রশ্নের জবাবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটরা ভিন্ন ভিন্ন মতামত প্রকাশ করেন।

পাটনার ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, ১৮১৬ সালের আইনানুযায়ী প্রজাশ্রেণী অক্ষ হইলে জমিদারদের নিকট হইতে বাসকাশারী তিন টাকা হিসাবে অথবা ৮ বিঘা হিসাবে জমি লওয়া উচিত। সারন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটের মতে, চৌকিদারী কর আদায়ের জন্য একটি পঞ্চায়েত নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন এবং গণ্যমান্য লোকদের উপর এই কর আদায়ের ভার ন্যস্ত করিতে হইবে। চৌকিদারী ব্যবস্থা সকল

করিতে হইলে মফঃস্বল পুলিশের তদারকিতে ভালো লোক নিযুক্ত করা প্রয়োজন। অপরদিকে চৌকিদারদের কাজের প্রতি নজর রাখিবার জন্য তাহাদের প্রতি সপ্তাহে একবার থানায় হাজিরা দিতে হইবে। যশোহরের ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে, চৌকিদারী কর আদায় ও চৌকিদারদের ভার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর থাকা প্রয়োজন। ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট গ্রাম্য পাইক পরিবর্তন করিয়া বরকন্দাজ নিযুক্ত করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন। ত্রিপুরা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু এই বিষয়ে একটি নূতন পরিকল্পনা করেন। এই পরিকল্পনার মূল কথা গ্রাম্য পাইক পরিবর্তন করিয়া বরকন্দাজ প্রথার প্রবর্তন। এই প্রথার কাঠামো হিসাবে তিনি প্রতি দশজন বরকন্দাজের দেখাশুনার জন্য একজন হাওয়ালদার এবং ত্রিশজনের উপর একজন জমাদারের সুপারিশ করেন। প্রতি তিনজন জমাদারের উপর একজন সুবেদার থাকিবে। এই বরকন্দাজেরা শুধু যে চৌকিদারদের কাজ করিবে তাহাই নহে, উহারা রণকর্মেও সুশিক্ষিত হইবে। নদিয়া ও মেদিনীপুর জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটদের মতে, গ্রাম্য পাইকদের মাহিনা জমিদারদের হাতে থাকা উচিত। শ্রীহট্টের ম্যাজিষ্ট্রেট কিন্তু গরীব প্রজাদের নূতন কর বসাইবার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, এই নূতন করের ফলে প্রজাদের দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি পাইবে।[১২]

এই বিষয়ে ভূম্যধিকারি সভা মনে করেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাহাদের রাজত্বের শুরু হইতেই তাহাদের সুবিধার্থে চৌকিদারী প্রথা বিভিন্নভাবে পরিবর্তন করে। কিন্তু কোন প্রকারেই প্রজাদের কোন উপকার হইতেছে না। পরন্তু প্রজাদের এইজন্য নানা প্রকারের কর দিতে হইতেছে। তৎসত্ত্বেও জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরা গ্রাম্য পাইক প্রথা পরিবর্তনের পক্ষপাতী। ইহার ফলে প্রজাদের নূতন কর দিতে হইবে। বর্তমানে ১০৭৫০০ গ্রাম্য চৌকিদারের বেতনের জন্য প্রজাদের মাসিক ৪২৮০০০ টাকা অর্থাৎ বছরে ৫১৬০০০০ টাকা কর দিতে হয়। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের মতে চৌকিদারী প্রথা পরিবর্তন করিয়া বরকন্দাজ প্রথার প্রবর্তন করিতে হইলে প্রতি বরকন্দাজকে মাসিক ৪ টাকা হিসাবে মাহিনা দিতে হইবে। কিন্তু প্রতি বরকন্দাজ সরকারী মাহিনা ব্যতীত প্রজাদের নিকট হইতে কমপক্ষে ৬ টাকা বখশিস ইত্যাদি পাইয়া থাকে। এই হিসাবে বাইশটি থানার ৪৮০০ বরকন্দাজ কেবল বঙ্গদেশে প্রজাদের নিকট হইতে ২৮৮০০ টাকা মাসিক এবং ৩৪৫৬০০ টাকা বার্ষিক অপব্যয় করিতেছে। ঐ অপব্যয় অকারণে দোষনীয়। প্রজাদের কিন্তু অপমানের আশঙ্কায় উহা সহ্য করিতে হইতেছে।[১৩]

উক্ত সভামতে ১৮১৩ সাল পর্যন্ত চৌকিদারলোক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কিন্তু দেশের শান্তি কিছুমাত্র ফিরিয়া আসে নাই। ইহাও উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের রিপোর্টেই সুব্যক্ত হইয়াছে। ইদানীং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের কাছারির নিকটে ডাকাতির ঘটনা বিরল নহে। উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবদের অভিপ্রায় অনুসারে যদি বরকন্দাজ শ্রেণী নিযুক্ত করিতে হয় তাহা হইলে ১০৭৫০০ চৌকিদার এবং যাহারা পুরুষানুক্রমে এই কাজ করিয়া আসিতেছে পদচ্যুতির প্রয়োজন। ফলে উক্ত চৌকিদারেরা তাহাদের জীবনধারণের জন্য প্রত্যক্ষভাবে চোরডাকাত শ্রেণীভুক্ত হইবে এবং প্রজাদের উপর দৌরাত্ম্য আরও বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবরা মনে করিতেছেন যে বরকন্দাজদের মাসিক মাহিনা চার টাকা হইলেই চলিবে; এই অনুমান কিন্তু কোনক্রমেই ন্যায়সংগত নহে। কমপক্ষে উহাদের আট টাকা মাসিক মাহিনার প্রয়োজন। অতএব প্রত্যেক প্রজার প্রতি ৫১২০০০০ টাকা গোপনীয় কর থাকা সত্ত্বেও বরকন্দাজদের প্রতিপালনের জন্য আরো নূতন কর বসাইতে হইবে। সভার মতে, আর একটা অসুবিধা এই যে গ্রাম্য পাইক গৃহস্থ প্রজার প্রতিবেশী, ফলে গৃহস্থের নিকটস্থ অন্যান্য হইতে দৌরাত্ম্যের সম্ভাবনা থাকে না। কেন না আগেই বলা হইয়াছে যে সভার মতে, গ্রাম্য পাইকেরা চোর, ডাকাত ইত্যাদির সহিত আত্মীয়তা ও কুটুম্বিতা করিয়া থাকে, ফলে একদিকে যেমন নিজ নিজ সীমানায় নিজেরা চুরি করে না, অপরদিকে তেমনি অপর কেহ তাহাদের সীমানায় চুরি করিতে না পারে তাহাও তাহারা দেখিয়া থাকে। অতএব গ্রাম্য পাইকের পরিবর্তে যদি বরকন্দাজ প্রথা প্রবর্তন করা হয় তাহা হইলে ১০৭০০০ গ্রাম্য পাইকের চারগুণ বরকন্দাজ নিয়োগ করিলেও এই সমস্যার সমাধান হইবে না। কেননা বরকন্দাজগণ চোরডাকাতের সহিত পরিচিত নহে।[১০]

ঐ সভার মতে ম্যাজিষ্ট্রেটরা প্রজাদের সহিত মেলামেশা মোটেই পছন্দ করেন না। ফলে তাঁহারা শান্তির উপায় স্থির করিতে পারিতেছেন না। কিন্তু দেশীয় লোকেরা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদে নিযুক্ত হওয়ায় জেলার ভদ্রলোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করা হাকিমেরা আর প্রয়োজন মনে করেন না। কিন্তু গ্রাম্য লোকদের সহিত আলাপ-আলোচনা ব্যতীত এই প্রথার দোষগুণ জানিবার উপায় নাই।

১৭৯৩ সালের ২২নং আইনের ১০নং ধারা অনুসারে বদমাইশ লোকদের উপর যদি নজর রাখা হইত, তাহা হইলে অনেক কম অপরাধ ঘটিত। বর্তমানে

অপরাধ যদি না ঘটিতে পারে, সেইরূপ কোন আইন প্রচলিত নাই ; শুধু অপরাধ ঘটিলে দণ্ড দিবার ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। ফলে ১৮০৩ সালের ৫৩নং আইন, ১৮১৮ সালের ৮নং আইন এবং ১৮২৫ সালের ৪নং আইনানুসারে নানাপ্রকার সংশোধনের প্রয়োজন হইয়াছে। এদেশের লোক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পদ পাওয়াতে অনেকে ভাবিয়াছিল যে, উঁহারা দেশে শান্তিস্থাপনের উপায় করিতে পারিবেন। কিন্তু বাস্তবে উহা ঘটে নাই। আগেকার দিনে অপরাধ যাহাতে না ঘটিতে পারে এইরূপ চেষ্টা প্রচলিত ছিল। গ্রামা মণ্ডলের অধীন পাইক লোক এবং মণ্ডল সর্বদা সাবধানে থাকিত। কিন্তু ১৭৯৩ সাল হইতে চৌকিদারদের ভার মণ্ডলের হাত হইতে চলিয়া যাওয়ায় চোর ও চৌকিদারদের মধ্যে সংযোগ ঘটে বলিয়া সভার মত। সরকার এই বিষয়ে মোটেই অবগত নহেন। সুতরাং দুঃখদুর্দশা বন্ধ করিতে হইলে রাজা-প্রজার সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন।

উক্ত সভা এই দেশের বিভিন্ন শ্রেণীকে কয়েকটি পক্ষে ভাগ করিয়াছে এবং কোন পক্ষের কি কাজ সেই বিষয়েও মতামত প্রকাশ করিয়াছে। যেমন, প্রথম-পক্ষ গভর্নমেণ্ট ও রাজপুরুষদের কাজ কর গ্রহণ ও দেশের শান্তি স্থাপন। কেননা শান্তি ব্যতীত করসংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটিবে। দ্বিতীয়পক্ষ জমিদার ও ইজারাদারদের কাজ রাজা ও প্রজার কর সংগ্রহের মধ্যস্থতা করা, প্রজাদের নিকট হইতে কর আদায় এবং নিজ নিজ কর দেওয়া। তৃতীয়পক্ষ প্রজা, ব্যবসাদার ও ব্যাপারী। চতুর্থপক্ষ চৌকিদার, পুলিশ ও আমলা চাকুরিয়া।[১৪] সুতরাং উক্ত চারিপক্ষের মধ্যে রাজা ও প্রজা একমত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রজার কাজ রাজাকে কর দেওয়া এবং রাজার কাজ প্রজার কল্যাণসাধন করা। অতএব উভয়ের চেষ্টা ব্যতীত উভয়ের মঙ্গল কদাচ সম্ভব নয়। উক্ত সভার মতে, পুলিশ ব্যবস্থায় চৌকিদার ও পুলিশ আমলার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন। তাহা না হইলে প্রকৃত খবর ম্যাজিষ্ট্রেটদের কানে পৌঁছাইবে না।[১৫]

উপরোক্ত বিশ্লেষণের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ সভা এক বিস্তারিত পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছে। সরকারী রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশের আয়তন ১০১৬৪৪ মাইল। লোকসংখ্যা ২০২৪৯২৯৯। উক্ত পরিকল্পনানুযায়ী প্রতি জেলায় হারাহারি হিসাবে ৮৮০৪০৪ লোকের বাস ধরা হইয়াছে। উহার মধ্যে প্রতি থানার (৩০১ মাইল হিসাবে) অধীন ২২৫ গ্রাম রাখিবার সুপারিশ করা হইয়াছে। প্রতি থানার অধীন ৫টি গ্রাম হিসাবে প্রতি বছর একজন করিয়া তদারক নিযুক্ত করিলে ঐ ২২৫টি গ্রামে ৪৫ জন তদারক নিযুক্ত হয়। দিবারাত্র ২ ঘণ্টা করিয়া

তদারক করিলে মোট ৯০ ঘণ্টা তদারক করিতে হয়। একজন দারোগার পক্ষে ১০ ঘণ্টার বেশি তদারক করা সম্ভব নয়। ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাহারা তদারকের কাজে নিযুক্ত হইবে, তাহাদের তদারকের ভার ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর দেওয়া উচিত। ইহার ফলে প্রজার সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের যোগাযোগ ঘটিবে। বঙ্গদেশের লোকসংখ্যা ২০২৫০০০০ এবং চৌকিদার সংখ্যা ১০৭০০০। সুতরাং ঐ শ্রেণীগত বদমায়েশের সংখ্যা যদি বিশগুণও ধরা যায়, তাহা হইলে উহাদের তদারকের সংখ্যাও বিশগুণ হয়। ফলে কোন কুকর্ম ঘটিয়া থাকিলে তাহা তৎক্ষণাৎ সকলের গোচর হইবে।[১৭]

এখানে নিজ নিজ গ্রাম বা পল্লীর বিষয়ে তদারক করিবার ক্ষমতা আছে কি না এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিতে পারে। উক্ত সভা মনে করে, "যেহেতুক বাতুল ও অন্ধব্যতীত দোষগুণ দৃষ্ট করিবার এবং বিবেচনা করিবার ক্ষমতা অন্যাপেক্ষা প্রতিবেশীর অধিক আছে গণ্য করিতে হইবেক।" তেমনি "ইতর লোকের বাস গ্রামে পরস্পর পল্লী তদারকবারের সহযোগে রীতি হইলেই তাহাদিগের অপরাধ নিবারণ করা হইবেক, যদিস্যাৎ কেবল ইতর লোকের বাস গ্রাম হয়, তদাচ উক্ত ইতর শ্রেণীর মধ্যে বহুতর সুরক্ষাচারী প্রাপ্তি হইবেক।"[১৮]

ঐ সভা শুধুমাত্র তাহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহাদের বক্তব্যের বিষয়ে যাহাতে অপর কেহ নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিতে পারে, সেইজন্য এই আলোচনার প্রকাশের শুরুতেই ঐ সভার পক্ষে শ্রীকালীনাথ বসু সকলের জ্ঞাতার্থে এক বিজ্ঞাপন দেন।[১৯]

এই প্রসঙ্গে রংপুর ভূম্যধিকারি সভার সম্পাদক রাজনারায়ণ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বক্তৃতা—যাহা রংপুর 'বার্ত্তাবহে' প্রকাশিত হইয়াছে—তাহা এখানে আলোচনা করা হইল।

ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে, শান্তিরক্ষার বিষয়ে অনিয়মতা চোরদের প্রজাদের অর্থ চুরি করিতে ও হত্যা করিতে সাহায্য করিতেছে। তাঁহার মতে, নিয়মের বিশৃঙ্খলা ও এই দেশীয় ভূম্যধিকারীদের এই বিষয়ে দৃষ্টি দিবার ক্ষমতা না থাকায় দুষ্ট লোকদের শক্তিবৃদ্ধি করিতেছে। কেননা, চোরডাকাতেরা অদৃশ্য নহে। তাহারা প্রতি গ্রামেই সাধারণ মানুষের মত বসবাস করে। গ্রাম্য লোকেরা তাহাদেরকে চেনে; কিন্তু পুলিশের ভয়ে শাসন করিতে পারে না। যদি এই সমস্ত লোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিবার জন্য প্রতি গ্রামের ভূম্যধিকারী ও তাঁহাদের কর্মচারীদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত কুকর্মীরা ধরা পড়িবার সম্ভাবনা থাকে।[২০]

সূত্রনির্দেশ

১. Harington, J. H., Elementary Analysis of the Laws and Regulations, vol. I, p. 510.

২. বিনয় রায়, 'বাংলা দেশের গ্রাম পুলিশ', ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, পৃ. ২২৮।

৩. তদেব, পৃ. ২২৯।

৪. সংবাদ প্রভাকর, ১২ মে ১৮৪৯।

৫. ভূম্যধিকারি সভার অনুষ্ঠান পত্র (দ্বিতীয় খণ্ড), সংবাদ প্রভাকর, ১১ মে ১৮৪৯।

৬. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ১২ মে ১৮৪৯।

৭. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ১৪ মে ১৮৪৯।

৮. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ১৬ মে ১৮৪৯।

৯. তদেব।

১০. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ১৮ মে ১৮৪৯।

১১. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ১৯ মে ১৮৪৯।

১২. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ২১ মে ১৮৪৯।

১৩. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ২৩ মে ১৮৪৯।

১৪. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ২৪ মে ১৮৪৯।

১৫. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ২৫ মে ১৮৪৯।

১৬. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ২৬ মে ১৮৪৯।

১৭. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ১ জুন ১৮৪৯।

১৮. তদেব, সংবাদ প্রভাকর, ২ জুন ১৮৪৯।

১৯. ভূম্যধিকারি সভার বিজ্ঞাপন, সংবাদ প্রভাকর, ১৭ মে ১৮৪৯।

২০. সংবাদ প্রভাকর, ২৪ এপ্রিল ১৮৪৯।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ১৮৩৭ সালের ১২ নভেম্বর বাংলাদেশের জমিদারগণ ভূম্যধিকারি সভা বা জমিদার সভা স্থাপনের উদ্দেশ্যে হিন্দু কলেজ গৃহে সম্মিলিত হন। ১৮৩৮ সালের ১৯ মার্চ উহা আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়। কেবলমাত্র দেশী ও বিদেশী জমিদারদেরই ঐ সভার সভ্য হওয়ার অধিকার ছিল।

১৮৩৯ সালে ইংলণ্ডের British India Society-র সহিত ইহা যুক্ত হয়। পরে মিঃ টমসনের উদ্যোগে বাংলাদেশে Bengal British Indian Society স্থাপিত হওয়ায় উহার কার্যকর্মে শৈথিল্য দেখা দেয়। ১৮৪৯ সালে কাশীনাথ বসুর প্রচেষ্টায় উহার কার্যকর্ম পুর্ণ উদ্যমে পুনরায় শুরু হয়।

উল্লেখযোগ্য গবেষণা গ্রন্থ

মিত্র, অমলেন্দু—রাঢ়ের সংস্কৃতি ও ধর্মঠাকুর। সচিত্র গবেষণা। ১৫·০০

বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুকূল—যুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম। ৬·০০

বৌদ্ধধর্মের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্য সম্পর্কে একখানি সংক্ষিপ্ত পূর্ণাংগ ইতিহাস।

সরকার, হিমাংশুভূষণ—দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন সাহিত্য। ১২·০০

দ্বীপময় ভারতের প্রাচীন ভাষাতত্ত্ব ও সাহিত্য-সৃষ্টির ইতিহাস, ব্যাকরণ, ছন্দ, অলঙ্কার, পুরাণ, দর্শন, নীতি, স্মৃতিশাস্ত্র ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ।

ভট্টাচার্য্য, অবিনাশ চন্দ্র—বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস। ৬·০০

আমেরিকা, জার্মাণী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে ভারতীয়দের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকার বিবরণ।

আনা, মনোরঞ্জন—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও সমাজ। ৪·০০

সবিতা চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যে ইয়োরোপীয় লেখক। সচিত্র। ২৫·০০

ফার্মা কে, এল, মুখোপাধ্যায়

প্রকাশক ও এজেন্টস্

৬/১এ বীরেন ধর সরণী অথবা ১নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,

কলিকাতা-১২ (দূরভাষ ২৪-১৮২৪)

ইতিহাস

৭ম খণ্ড | শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৯ | ২য় সংখ্যা

যোগেশচন্দ্র বাগল

(১৯০৩-৭২)

গৌতম নিয়োগী

মরণোত্তর পাদপ্রদীপের আলোয় আজ এমন ব্যক্তিকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি, যাঁর কাছে প্রত্যেক বাঙালীই ঋণী। কারণ, তিনি নিজেও ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালী। বিদ্যার বহুবিস্তীর্ণ ধারায় দেশী- বিদেশীর ইতিহাসের সঙ্গে বর্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত মনের যোগ প্রধানত ইংরিজি ভাষার মাধ্যমে। একশো বছর আগে তাই সাহিত্যসম্রাট দুঃখ করে বলেছিলেন :

"সাহেবরা যদি পাখি মারিতে যান তবে তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলার ইতিহাস নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই বাংলাদেশের একটি ক্ষীণাঙ্গ ইতিহাস প্রকাশিত হলে তাকে 'সুবর্ণের মুষ্টি'র সঙ্গে তুলনা করে তিনি উৎসাহ দিয়ে 'বঙ্গদর্শনে' লিখলেন।

"বাঙ্গালাতে বাঙ্গালীর ইতিহাসে যে যাহাই লিখুক না কেন সে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি। যে দরিদ্র সে সোনারূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?"

১৯৪০ সালে যোগেশচন্দ্রের প্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' যখন প্রকাশিত হয়, তখন সাহিত্যসম্রাট ছিলেন না; কিন্তু অগণিত দেশবাসী কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর সাধনা ও নিষ্ঠার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চা যোগেশচন্দ্র বাগলের মত এত বেশী

করে আর কোন বাঙালী করেছেন বলে আমরা জানি না। এইজন্য যোগেশচন্দ্র বিংশ শতকের বাঙালী-মনীষার এক উজ্জ্বল প্রতিভূ।

প্রচলিত অর্থে ঐতিহাসিক বলতে যা বোঝায় যোগেশচন্দ্র ঠিক তা ছিলেন না, কিন্তু বলতে গেলে তাঁর সারা জীবনই কেটেছে ইতিহাস গবেষণায়। মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ যদি মরণের দ্বারা বেঁচে থাকা বোঝায় তবে যোগেশচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত মানুষ। পার্থিব জীবনের নানা ঘাতপ্রতিঘাতে আমরা সব সময় ভাবি প্রমকেন্দ্রিক জীবনের কথা, নিজস্ব যশ এবং অর্থলাভের আড়ালে যার লক্ষ্য আত্মগরিমা। বস্তুগত জীবন-সত্যকে অনেকাংশে উপেক্ষা করে গবেষণায় আত্মিক উপলব্ধি করেছিলেন বলেই যোগেশচন্দ্র খাঁটি মানুষ। অনুসন্ধানে জীবন উৎসর্গ করার সারস্বত মহিমা তাঁর মৃত্যুতে অস্তমিত হল।

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশ্বের নবজাত বাংলাদেশের বরিশাল জেলার পিরোজপুর মহকুমার কুনীড়মরা গ্রামে ১৯০৩ সালের ২৭শে মে (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ বঙ্গাব্দ) মামাবাড়ীতে তাঁর জন্ম। যোগেশচন্দ্রের পিতা জগবন্ধু বাগল, পিতামহ কালীনাথ বাগল প্রভৃতির আদি বাড়ী ছিল ঐ মহকুমাতেই চলিশা গাঁয়ে। যোগেশচন্দ্রের মায়ের নাম তরঙ্গিনী দেবী।

যোগেশচন্দ্র বাগলের ছাত্রজীবন বিচিত্র — গ্রামের পাঠশালায় শুরু; কদমতলা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯২২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং দুবছর পর বাগেরহাট কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় পাশ; স্নাতক হলেন কোলকাতার সিটি কলেজ থেকে, কিন্তু স্নাতকোত্তর পাঠক্রমের মাঝপথে নানা সাংসারিক কারণে পড়া শেষ।

১৯২৯ সালে যোগেশচন্দ্রের কর্মজীবন শুরু সাংবাদিকতার বৃত্তি নিয়ে। দুষ্টশক্তি করে যাওয়ার ১৯৬১ সালে অবসরগ্রহণ পর্যন্ত তিনি ঐ একই বৃত্তিভোগী। ১৯২৯ সালে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় যথাক্রমে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীনীরদচন্দ্র চৌধুরীর সহকারী হিসাবে যোগদান করেছিলেন। দুটি কাগজেরই তখন খুব নামডাক। সম্পাদনা করতেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দবাবুই যুবক যোগেশচন্দ্রের মনে গবেষণার প্রথম প্রেরণা যুগিয়েছিলেন, পরে প্রত্যক্ষ সহায়তায় বিশেষভাবে উৎসাহ দিতেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেও ছিলেন একজন নিরলস গবেষক।

১৯৩২ সালে বরিশাল জেলার কাঁচাবালিয়া গ্রামের যদুনাথ বসুর কন্যা শ্রীমতী

অমিয়প্রভার সঙ্গে যোগেশচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। ১৯৩৫ সালে যোগেশচন্দ্র বাগল প্রবাসী-মডার্ন রিভিউএর কাজ ছেড়ে 'দেশ' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দেন। 'দেশ'-এর বয়স তখন মাত্র কয়েক বছর। ঐ কাগজে তিনি নিয়মিত 'আন্তর্জাতিক-সম্পর্ক' বিভাগে লিখতেন। ১৯৪১ সালে আবার 'প্রবাসী'তে ফিরে যান এবং ১৯৬১ পর্যন্ত ঐ কাগজেই সহকারী সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন।

যোগেশচন্দ্রের প্রথমদিকের প্রবন্ধগুলির অন্যতম: দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রতিষ্ঠিত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'কঙ্কনজী কাওয়াসজি' (চৈত্র ১৩৩৮, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯), 'প্রবাসী'তে 'রাধানাথ শিকদার' (ভাদ্র ১৩৩৯), 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার' (২০শে মাঘ ১৩৪০) এবং 'Modern Review'তে 'David Hare and the Beginning of English Education in India' (January 1933), 'More light on Radhanath Sikdar' (September 1933) প্রভৃতি। কোলকাতার বিদ্বৎসমাজে তখন যোগেশচন্দ্র বাগল একটি পরিচিত নাম।

গবেষণায় আত্মনিয়োগ

গবেষণার ক্ষেত্রে যোগেশচন্দ্র বাগলের কোন বিষয়ের গভীরে যাওয়ার ইচ্ছা-ভিত্তিকা-পরিশ্রম ছিল; সেইসঙ্গে ছিল বিশেষ অন্তর্দৃষ্টি। প্রসঙ্গত দুটি কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এক, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার ইতিহাসের অনেক অনালোচিত অধ্যায়ই যোগেশচন্দ্র প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন। সাম্প্রতিক কালের ঐতিহাসিক-প্রাবন্ধিকেরা বহুক্ষেত্রেই তাঁর কাছে ঋণী। দুই, যোগেশচন্দ্র "কাঁচি ও গঁদের আঠা"র সাহায্যে গবেষণার দিন কাটান নি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তার মূল সূত্র—প্রাথমিক আকর-উপাদান, কখনো দুষ্প্রাপ্য সাময়িকপত্র বা সমসাময়িক গ্রন্থ, কখনো বা সরকারী-বেসরকারী নথিপত্র ঘেঁটে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁকে তথ্য উদ্ধার করতে হত। লালশলা যোগাড় করতে তাঁর চোখ দুটি অত্যধিক চাপ সহ্য করতে করতে শেষদিকে সম্পূর্ণ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। অফুরন্ত প্রাণ-শক্তিতে ভরপুর যোগেশচন্দ্র বাগল কিন্তু দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও গবেষণার কাজ অব্যাহত রেখেছিলেন। তরুণ গবেষকদের জন্য তাঁর দ্বার ছিল চির-উন্মুক্ত। প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তিতে নির্ভর করে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন।

গোড়াতেই বলেছি, বাংলা ভাষার মাধ্যমে ইতিহাসচর্চা যোগেশচন্দ্র বাগলের মত এত বেশী করে কেউ করেন নি। প্রবাসী, দেশ, আনন্দবাজার পত্রিকা,

জয়শ্রী, বাংলার শিক্ষক, ভারতবর্ষ, নন্দিরা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শনিবারের চিঠি, শিক্ষা, যুগান্তর প্রভৃতি বহু পত্র-পত্রিকায় তাঁর অন্যূন ১৭৩টি ইতিহাস-বিষয়ক প্রবন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে। শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক বহু প্রবন্ধও তিনি রচনা করেছেন।

বাংলা ভাষার মাধ্যমে গ্রন্থ রচনা করার ফলে যোগেশচন্দ্র শুধুমাত্র ইতিহাসবেত্তা রূপেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নি, মাতৃভাষারও সেবা করেছেন। ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী ছাড়াও বহু বাঙালীর 'বাঙ্গালার ইতিহাসে'র প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর লেখা পড়েই। যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রথম গ্রন্থ 'মুক্তির সন্ধানে ভারত' (১৯৭০) প্রকাশিত হওয়ার পরে ক্রমে ক্রমে 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (১৯৪১), 'জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত' (১৯৪৩), 'জাতি-বৈর বা আমাদের দেশাত্মবোধ' (১৯৪৬), 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' (১৯৪৭), 'বিদ্রোহ ও বৈশ্বিতা' (১৯৪৯), 'বাংলার জনশিক্ষা' (১৯৫০), 'বাংলার স্ত্রীশিক্ষা' (১৯৫০), 'বাংলার উচ্চশিক্ষা' (১৯৫৪), 'জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী' (১৯৫৪), 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি' (১৯৫৮), 'বরণীয়' (১৯৫৯), 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' (১৯৫৯), 'বিদ্যাসাগর-পরিচয়' (১৯৫৯), 'জাগৃতি ও জাতীয়তা' (১৯৬০),' বেথুন সোসাইটি' (১৯৬১), 'বাংলার নবজাগরণের কথা' (১৯৬১) এবং 'বঙ্গ সংস্কৃতি কথা' (১৯৭০) এই ১৭টি গ্রন্থ রচনা করেছেন। প্রত্যেক কারণেই প্রতিটি গ্রন্থ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার পরিসর এ প্রবন্ধে নেই; শুধু প্রয়োজনীয় আলোচনাই করব।

ইংরিজিতেও যোগেশচন্দ্র বাগল কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য: 'Woman's Education in Eastern India' (World Press, Calcutta, 1956) এবং 'Peasant Revolution in Bengal' (Bharati Library, Calcutta, 1953)। তাছাড়া ১৯৫৩ সালে 'ভারত-সভা'র প্র্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সভার তদানীন্তন সভাপতি হরেন্দ্রনাথ মজুমদার ভারত-সভার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখবার দায়িত্ব দেন যোগেশচন্দ্র বাগলকে। ঐ বছরই তাঁর 'History of the Indian Association' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৫ সালে অনুরূপভাবে স্বর্গত প্রমথনাথ বসুর জন্মশতবার্ষিকীতে তিনি 'Pramatha Nath Bose' নামে জীবনী-গ্রন্থ রচনা করেন। আর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি যোগেশচন্দ্র বাগলের প্রায় ৮০টি ইংরিজি প্রবন্ধ, যেগুলি Modern Review, Hindusthan Standard, Insurance World, Calcutta Municipal Gazette, Bengal Past and Present, Free Lance প্রভৃতি কাগজে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে।

গ্রন্থ পর্যালোচনা

'মুক্তির সন্ধানে ভারত' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখেছেন :

"মুক্তির সন্ধানে ভারত ভারতবর্ষের একশত বৎসরের ইতিহাসের একটি কাঠামো মাত্র। জাতির জীবনে একশত বছর কিছুই না একথা ঠিক কিন্তু প্রগতির পথে অবিরাম চলিতে হইলে মাঝেমাঝে এমনিভাবে আলোচনা করিয়া পরবর্তী পথ স্থির করা প্রয়োজন। এই হিসাবে এই ধরনের পুস্তকের মূল্য যথেষ্ট।"

এর পর আর এই পুস্তকের সমালোচনা না করাই ভালো। বাংলা ভাষায় জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস নেই—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের এই অভাবটা অনেকাংশে দূর হয়েছিল এই গ্রন্থটি প্রকাশের পর। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে এই গ্রন্থটি সমালোচনার ঊর্ধ্বে মোটেই নয়। মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গেলে যে সব উপাদান প্রয়োজন, তার অনেক কিছুই যোগেশচন্দ্র বাগল ঘাঁটেন নি বা হয়ত পরাধীন ভারতে ঘাঁটা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের কথার মূল্য কম নয়। জাতির আত্মানুসন্ধানের জন্য নিজেদের ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন এবং সেই আলোচনার উপজীব্য হিসাবে গ্রন্থটি অমূল্য।

ভারতীয় জাগরণের সূচনা হয় বাংলায়। স্বাভাবিকভাবেই বাংলার জাগরণকে যোগেশচন্দ্র বাগল তাঁর গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নিয়েছেন। উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে আলোর উত্তরণের ইতিহাস রচনায় তিনি অগ্রসর হয়েছেন। 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' (ভূমিকা সজনীকান্ত দাস), 'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' (ভূমিকা আচার্য যদুনাথ সরকার) এবং 'বরণীয়', এই তিনটি গ্রন্থে যোগেশচন্দ্র বাগল উনবিংশ শতাব্দীর যে ঋষিক গোষ্ঠী ভারতীয় জাগরণের পুরোধা ছিলেন তাদের কথা জানিয়েছেন দেশবাসীকে। সাধারণের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন রাজা রামমোহন, দ্বারকানাথ ঠাকুর থেকে আরম্ভ করে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, জলধর সেন, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রমুখ অনেক যুগ-পরিচালকদের। এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশ জীবনীই প্রাথমিক উপাদানের ভিত্তিতে লেখা। যোগেশচন্দ্র লিখেছেন :

"যাহারা শিবরূপে সারা জীবন বিষ পান করিয়া অমৃতভাণ্ডার বংশীয়দের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহারা ধন্য, তাহাদের জীবনকথা জাতির প্রাণের রস ও রসদ।"

'ভারতের মুক্তি-সন্ধানী' গ্রন্থের ভূমিকায় আচার্য যদুনাথ মন্তব্য করেছিলেন :

"আমাদের হালের তরুণদলাজের কথাবার্তায় বেশ বুঝিতে পারি যে তাহারা সব অতীত দেশনেতার সম্বন্ধে কিছু জানে না।"

যদুনাথ সরকারের এই আর্তি দূর করেছিলেন যোগেশচন্দ্র বাগল।

শুধু ব্যক্তিজীবনের কথাই নয়, উনিশ শতকের বহু সভা, সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের ইতিহাসও যোগেশচন্দ্র বাগল কৃতিত্বের সঙ্গে উদ্ধার করেছেন বহু দুষ্প্রাপ্য তথ্য ঘেঁটে। যেমন সোসাইটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, উত্তরপাড়া হিতকারী সভা, বামাহিতৈষিণী সভা, বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, বামাবোধিনী সভা, বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্, জাতীয় গ্রন্থাগার প্রভৃতি ঐতিহ্যশালী বহু সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিবরণ দিয়েছেন 'বাংলার নব্য সংস্কৃতি', 'কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র' এবং 'বঙ্গ সংস্কৃতি কথা' এই তিনটি গ্রন্থে। 'বিদ্রোহ ও বৈরিতা' গ্রন্থে ভারত-ইতিহাসের আর এক অনালোচিত দিক বাংলায় আলোচনা করেছেন। এতে আছে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ প্রভৃতি বিদ্রোহ এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাস। বহু-কুখ্যাত নীল বিদ্রোহ নিয়ে যোগেশচন্দ্র বাগল অবশ্য তাঁর ইংরিজি গ্রন্থ 'Peasant Revolution in India'-তেও আলোচনা করেছেন।

'হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের ভূমিকায় (দ্বিতীয় সং) ঐতিহাসিক প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন

"এ কথা হয়তো সত্য যে বাঙালী ঐতিহাসিকেরা অন্য প্রদেশের ইতিহাস-চর্চায় যে রকম উৎসাহ দেখিয়েছেন বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ইতিহাস রচনায় সে রকম উৎসাহ দেখান নি। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল এবং অল্প কয়েকজন গবেষকের চেষ্টায় সে ত্রুটি অনেকাংশে ঢাকা পড়ে গিয়েছে।"

অবশ্য যোগেশচন্দ্রের কৃতিত্বের কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করেও বলা যায়, শ্রীগুপ্তের কাছে যে "ত্রুটি" "হয়ত সত্য" বলে মনে হয়েছে, তা কিন্তু পুরোপুরি গ্রহণীয় নয় (আমার মতে ·. কেননা স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে অধিকাংশ বাঙালী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিই ছিল বাংলার ইতিহাসের দিকে নিবদ্ধ (বিশেষ করে রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সামাজিক, অর্থনৈতিক, কৃষ্টনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা বেশি করেই শুরু হয়েছে)।

১৯৩১ সাল থেকে যোগেশচন্দ্র বাগল 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ'-এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিন আগে পরিষদের সভাপতি তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

মহাপ্রয়াণের কয়েক সপ্তাহ পরেই অন্যতম সহ-সভাপতি যোগেশচন্দ্র বাগলও চলে গেলেন। 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ'-প্রকাশিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' এক অনুপম কীর্তি। এই গ্রন্থমালায় যোগেশচন্দ্রও একজন চরিতকার, যাঁর লেখা রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, কেশবচন্দ্র সেন, উমেশচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি ১৮টি চরিত। 'ভারতকোষ'-এর সম্পাদনা-সমিতির সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন।

মৌলিক গ্রন্থগুলি ছাড়াও যোগেশচন্দ্র কয়েকটি গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে সুষ্ঠুভাবে পালন করেছেন, যেমন 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ' (এক খণ্ডে), 'বঙ্কিম-রচনাবলী' (দুই খণ্ডে), 'রমেশ-রচনাবলী' প্রভৃতি। এছাড়াও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তিনশতাধিক প্রবন্ধ বিভিন্ন বাংলা-ইংরিজি পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে আছে, যেগুলির বেশির ভাগই উনিশ-বিশ শতকের বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বিচারবিশ্লেষণ।

উনিশ শতকের জাগরণ নিয়ে বড় বেশী মাতামাতি হচ্ছে এই সমালোচনা যাঁরা করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে স্পষ্টবক্তা যোগেশচন্দ্র বাগলের উক্তি :

> "উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণ সম্বন্ধে আজকাল নানা পুঁথি-প্রবন্ধ রচিত হইতেছে। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে দৃষ্টি না পড়ায় ইহা নিতান্তই একপেশে হইয়া উঠিয়াছে। সম্প্রতি একখানি সাময়িকপত্রে 'উনবিংশ শতাব্দীর ভূত' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ দেখিলাম। এই শতাব্দী লইয়া একটা হুজুগোপণার প্রতি উক্ত রচনার লেখক কর্তৃক সাধারণ শিক্ষিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই উহার উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হইল। বস্তুত এ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গেলে একদিকে যেমন পূর্বাপর অনেক বিষয়েরই মূলে যাইতে হইবে তেমনি এ কথাটিও ভুলিলে চলিবে না যে মনুষ্য-সমাজের অগ্রগতি শাশ্বত এবং আমরা প্রতিনিয়ত নূতন নূতন ভাবধারা দ্বারা আমাদের জীবনকে রূপায়িত করিয়া তুলিতেছি। এই মূলতত্ত্বটি হৃদ্‌গত হইলে অতীত যুগের বাঙালীর সমাজচিত্রের সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা করা হয়ত আর কঠিন হইবে না।" (ভূমিকা, জাগৃতি ও জাতীয়তা)

উনিশ শতকের জাগরণ (অথবা নবজাগরণ) সম্বন্ধে বুদ্ধিজীবীদের একাংশ যেমন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে ইতিহাস লিখতে বসেন, ফলে সহজেই এই শতকের বাঙালী মনীষীরা দেবতা হয়ে যান ; অন্যদিকে একদল বর্তমানের চিন্তাধারায় দীক্ষিত হয়ে বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে তখনকার সমাজের আন্দোলনের সমালোচনা করেন, ফলে বিদ্যাসাগরের মত মানুষও প্রতিক্রিয়াশীল বলে চিহ্নিত হন। কোনো দেশের জাতীয় জীবনের সামগ্রিক চিত্তজাগরণ কখনোই একপেশা

বহুত্বের ইতিহাসের পরিণতি হতে পারে না, প্রত্যেক ঐতিহাসিক একথা স্বীকার করবেন। বিশেষত: ভারতবর্ষের মত বৈচিত্র্যময় ভূমি-ভাগে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর অবক্ষয়ের তুলনায় উনিশ শতক অনেকদিক থেকেই নতুন দিকের দিশারী। বিতর্কের ঝোঝা বাড়াবার অবকাশ এ প্রবন্ধে আনছি নে—শুধুমাত্র যোগেশচন্দ্র বাগলের মন্তব্যপ্রসঙ্গে একথা স্মর্তব্য যে, ঐতিহাসিকদের objective আলোচনা করা সর্বদা প্রয়োজন এবং লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শেষ জীবন

দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা করে শেষজীবনে যোগেশচন্দ্র বাগল দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু ১৯৬১ সালে সরকারী চারুকলা মহাবিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে তিনি প্রমাণ করে গেছেন, তাঁর জ্ঞানস্পৃহা তখনও সম্পূর্ণ সজীব। দেশবাসী তাঁর দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন—১৯৫৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের রামপ্রাণ গুপ্ত পুরস্কার, ১৯৫৮ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর-বক্তার পদলাভ, ১৯৬২ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরোজিনী বসু স্বর্ণপদক লাভ এবং ১৯৬৮ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার পুরস্কার সেই স্বীকৃতির স্বাক্ষর।

যোগেশচন্দ্র বাগলের মৃত্যুর পরদিন কোলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকা সম্পাদকীয় বিভাগে লেখেন :

"বাংলাদেশ একজন সুপণ্ডিত গবেষক এবং বাংলা ভাষার একজন নিষ্ঠাবান সেবককে হারাইল।"

রচনাপঞ্জী

ক. বাংলা গ্রন্থ (প্রকাশিত হওয়ার সালানুক্রমিক) :

১। মুক্তির সন্ধানে ভারত বা ভারতের নবজাগরণের ইতিবৃত্ত। ভূমিকা : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৭ বঙ্গাব্দ (১৯৪০) ; এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, কোলকাতা। তৃতীয় মুদ্রণ (সং) ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ ; অশোক পুস্তকালয়, কোলকাতা। ১৩৫৬ সালে 'সঙ্কল্প ও সাধনা' নামে এই গ্রন্থের একটি সংক্ষিপ্ত কিশোর সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

বিষয়বস্তু : ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কাহিনী।

২। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। ভূমিকা : সজনীকান্ত দাস। প্রথম প্রকাশ

১৩৪৮ বঙ্গাব্দ (১৯৭১) ; রতন পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা। পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৬৩।

বিষয়সূচী : দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, রুস্তমজী কাওয়াসজী, ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন, সূর্যকুমার (গুডিভ) চক্রবর্তী, জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, ভগবানচন্দ্র বসু, জেনস্ লঙ্।

পরিশিষ্ট : ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, আনন্দমোহন বসু, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার অনুষ্ঠানপত্র।

৩। জাতীয়তার নবমন্ত্র বা হিন্দুমেলার ইতিবৃত্ত। প্রথম প্রকাশ ১৩৫২ বঙ্গাব্দ (১৯৪৫) ; এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, কোলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৩৭৫ ; মৈত্রী, কোলকাতা। ভূমিকা : ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র গুপ্ত।

বিষয়বস্তু : হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনের বিবরণ, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, জাতীয় সভা, জাতীয় সভার কার্যক্রম, জাতীয় বিদ্যালয় ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট : রাজনারায়ণ বসু-রচিত অনুষ্ঠানপত্র, জাতীয় সঙ্গীত, হিন্দুমেলার উপহার ইত্যাদি।

৪। জাতি-বৈর বা আমাদের বোঝাবুঝি। ভূমিকা : ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৩ বঙ্গাব্দ (১৯৪৬) এস. কে. মিত্র এণ্ড ব্রাদার্স, কোলকাতা।

বিষয়বস্তু : উনিশ শতকের গোড়া থেকে বাংলাদেশে শাসক ও শাসিতের মধ্যে সংঘর্ষের বিবরণ।

৫। ভারতের মুক্তি-সন্ধানী। ভূমিকা : আচার্য যদুনাথ সরকার। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ (১৯৪৭); ভারতী বুক স্টল, কোলকাতা। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৫৮; পপুলার লাইব্রেরী।

সূচীপত্র : রামগোপাল ঘোষ, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, শিশিরকুমার ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ মজুমদার, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ভগিনী নিবেদিতা।

৬। বিদ্রোহ ও বৈরিতা। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ (১৯৪৯) ; বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা।

বিষয়সূচী : বিদ্রোহ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওহাবী বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ। বৈরিতা। শাসক ইংরেজ ও শাসিত ভারত, হিন্দু সমাজ ও খ্রীষ্টান পাদ্রী, সিবিল সার্বিসে বর্ণ-বিচার, ভারত-ছাড়।

৭। বাংলার জনশিক্ষা। প্রথম প্রকাশ ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দ; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। মূল্য ৫০ পয়সা।

৮। বাংলার স্ত্রীশিক্ষা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। মূল্য ৫০ পয়সা।

৯। বাংলার উচ্চ শিক্ষা। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ; বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। মূল্য ৫০ পয়সা।

১০। জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ। মূল্য ৫০ পয়সা।

১১। বাংলার নবা সংস্কৃতি। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দ বিশ্বভারতী : লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা।

বিষয়সূচী : পূর্বাভাস, গৌড়ীয় সমাজ, অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, তত্ত্ববোধিনী সভা, পারসিভিয়ারেন্স সোসাইটি, সর্বশুভকরী সভা, ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি, সমাজোন্নতি বিধায়িনী সুহৃদ সমিতি, বিদ্যোৎসাহিনী সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি, বড়বাজার গার্হস্থ্য সাহিত্য সমাজ, অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা, বামাবোধিনী সভা, হেয়ার প্রাইজ ফাণ্ড কমিটি, উত্তরপাড়া হিতকারী সভা, বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা, ভারত-সংস্কার সভা, বামাহিতৈষিণী সভা।

১২। স্মরণীয়। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯)। এ. মুখার্জী।

বিষয়সূচী : গুরুমহাশয়, তিনজন শিক্ষাব্রতী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, কামাখ্যা-চরণ নাগ, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, জগদীশচন্দ্র বসু, অবলা বসু, প্রফুল্ল রায়, মেঘনাদ সাহা, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, জ্যোতির্ময়ী গঙ্গোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, যদুনাথ সরকার, হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, রামনাথ বিশ্বাস, চণ্ডীচরণ বিশ্বাস, নিশিকান্তের মা, জলধর সেন, রামকমল সিংহ, সুরেশচন্দ্র দেব, কিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রাধাচরণ চক্রবর্তী, বটুকদেব মুখোপাধ্যায়, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পিতৃদেব।

১৩। কলিকাতার সংস্কৃতি-কেন্দ্র। ভূমিকা : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯) ; শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কোলকাতা।

বিষয়সূচী : বঙ্গীয় এশিয়াটিক সোসাইটি, ইণ্ডিয়ান মোটানিক গার্ডেন, টাউন হল, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, কৃষি সমাজ, মাধ্যমিক পাঠশালা, আদি ব্রাহ্মসমাজ, ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী, হেয়ার স্কুল, ডাফ সাহেবের স্কুল, স্কটিশচার্চ কলেজ, কলিকাতা মেডিকাল কলেজ, সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ, মেটকাফ্ হল, পীসস্ ফ্রী স্কুল, বেথুন স্কুল ও কলেজ, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলা-মহাবিদ্যালয়, ইণ্ডিয়ান মিউজীয়ম, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ, সেনেট হল, অ্যালবার্ট হল, ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিট্যুট, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, জাতীয়-শিক্ষা-পরিষদ, সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদ, সায়ান্স কলেজ, বসু বিজ্ঞান মন্দির।

১৪। বিদ্যাসাগর-পরিচয়। ভূমিকা : সজনীকান্ত দাস। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৫৯) নবীন পাবলিশিং হাউস, কোলকাতা। (১৯৫৮ সালে যোগেশচন্দ্র বাগল কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর-স্মৃতি বক্তৃতামালায় যেসব প্রবন্ধ পড়েছিলেন, সেগুলি একসঙ্গে বই হয়ে প্রকাশিত)।

বিষয়সূচী : আবির্ভাব ও সমসাময়িক বঙ্গ, শিক্ষা-সংস্কারে বিদ্যাসাগর, শিক্ষা-বিস্তারে বিদ্যাসাগর, সাহিত্যসাধনায় বিদ্যাসাগর, সমাজহিতে বিদ্যাসাগর, সমাজ-সংস্কার ও সমাজসেবা।

১৫। জাগৃতি ও জাতীয়তা। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৬ বঙ্গাব্দ (১৯৬০) ; মিত্র ও ঘোষ, কোলকাতা।

বিষয়সূচী　জাগৃতি ।। পশ্চিমের সংস্রব ও বাঙ্গালীচিত্তে প্রতিক্রিয়া, বঙ্গের সংস্কৃত-চর্চা ও নবজাগৃতি, বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা, জন-জাগরণে পত্র-পত্রিকা। জাতীয়তা ।। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ, স্বাদেশিকতার ভাবনা, জাতীয় শিক্ষার কথা, জাতীয় পটভূমিকায় বাংলার জাতীয়তা, বাংলার নবযুগের কথা, রাজনীতির আবর্তে বাংলা।

১৬। বেথুন সোসাইটি। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ (১৯৬১) ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

১৭। বাংলার নবজাগরণের কথা। প্রথম প্রকাশ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ (১৯৬৩) ; বসুধারা প্রকাশনী, কোলকাতা।

১৮। বঙ্গ সংস্কৃতি কথা। প্রথম প্রকাশ ১৯৭০ ; ওয়ার্ল্ড প্রেস, কোলকাতা।

খ. কোলকাতার বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় যোগেশচন্দ্র বাগল অন্যূন ১১টি পুস্তিকা রচনা করেন।

১। রাধাকান্ত দেব। প্রথম প্রকাশ ১৩৪৯ (১৯৪২)।

২। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রথম প্রকাশ ১৩৫১ (১৯৪৪)।

৩। রাজনারায়ণ বসু। প্রথম প্রকাশ ১৩৫২ (১৯৪৫)।

৪। রামকমল সেন, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৫৫ (১৯৪৮)। পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৬২ (১৯৫৬)।

৫। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, অযোধ্যানাথ পাকড়াশী, হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ।

৬। উইলিয়াম ইয়েটস্, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ (১৯৫৭)।

৭। কেশবচন্দ্র সেন। প্রথম প্রকাশ ১৩৬৫ (১৯৫৮)।

৮। উমেশচন্দ্র দত্ত, মহেশচন্দ্র ঘোষ। প্রথম প্রকাশ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ (১৯৬৩)।

৯। সরলা দেবী চৌধুরাণী, শরৎচন্দ্র রায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ (১৯৬৪)।

১০। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ (১৯৬৪)।

১১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। প্রথম প্রকাশ ১৩৭১ বঙ্গাব্দ (১৯৬৫)।

গ. সম্পাদিত গ্রন্থ (বাংলা)

১। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ। প্রথম খণ্ড। শ্রীভারতী পাবলিশার্স। ১৩৫৪ বঙ্গাব্দ। অমৃতবাজার পত্রিকা (বাংলা) থেকে রচনা সংকলন (১৮৬৮-১৮৭০)।

২। বঙ্কিম-রচনাবলী। সমগ্র উপন্যাস। প্রকাশক : সাহিত্য-সংসদ, কোলকাতা। আশ্বিন ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' (সংক্ষিপ্ত জীবনী) ও উপন্যাস-প্রসঙ্গ, পৃ. ৯-৫১।

৩। বঙ্কিম-রচনাবলী। দ্বিতীয় খণ্ড। উপন্যাস ব্যতীত সমগ্র বাংলা রচনা। প্রকাশক : সাহিত্য-সংসদ, কোলকাতা। ১৩৬১ বঙ্গাব্দ।

৪। রমেশ রচনাবলী। প্রথম খণ্ড। সমগ্র উপন্যাস। সাহিত্য-সংসদ।

১৯৬০। যোগেশচন্দ্র বাগল রচিত 'রমেশচন্দ্র দত্ত' (জীবনী), পৃ. ৷৶০-২৷৶০।

৫। প্যারীচাঁদ মিত্র। রামকমল সেন। সংবোধি পাবলিকেশন, কোলকাতা। ফাল্গুন ১৩৭০। প্যারীচাঁদ মিত্রের মূল রচনার সঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগল কর্তৃক সংযোজন গ্রন্থটির মূল্য বৃদ্ধি করেছে।

৬। সরলা দেবী চৌধুরাণী। জীবনের ঝরাপাতা। প্রকাশনা : সাহিত্য-সংসদ, কোলকাতা। ১৮৭৯ শকাব্দ।

ঘ. ইংরেজী গ্রন্থ :

1. **Beginnings of Modern Education in Bengal Women's Education.** Ranjan Publishing House, Calcutta, 1944.

An enlarged reprint Women's Education in Eastern India, the First Phase. The World Press, Calcutta, 1956.

Subject : History of Women's education movement in Bengal upto the establishment of the Bethune School in 1849 mainly based on contemporary records.

2. **Peasant Revolution in Bengal.** With a Foreword by Sir Jadunath Sarkar. Bharati Library, Calcutta, 1953.

Subject : Mainly the history of the Indigo disturbances in Bengal including twelve letters written by Mahatma Sisir Kumar Ghosh under the initials (pen-name) M.L L. in the *Hindoo Patriot*.

3. **History of the Indian Association (1876-1951).** Published by the Indian Association, 1953.

4. **Pramatha Nath Bose.** With a Foreword by Dr. Meghnad Saha. Published by P. N. Bose Centenary Committee, New Delhi, 1955.

ঙ. পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত বাংলা রচনা :

(পত্র-পত্রিকার নামের বর্ণ অনুযায়ী না সাজিয়ে আধুনিক পদ্ধতি অনুসারে রচনার বিষয়ভিত্তিক পৃথকীকরণ করা হল। এর ফলে ভবিষ্যৎ পাঠক-গবেষকদের সুবিধা হবে। যেমন, শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ, স্ত্রীশিক্ষা-সংক্রান্ত রচনা, সমাজ ও সংস্কৃতি-বিষয়ক প্রবন্ধ, রাজনীতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের উপরে লেখা ইত্যাদি আলাদাভাবে সাজান হল। প্রথমে রচনার নাম, কোন পত্রিকায় প্রকাশিত এবং তারপর রচনা প্রকাশের তারিখ, এইভাবে তালিকা গ্রথিত।)

শিক্ষা

প্রেসিডেন্সী কলেজ (পূর্বকথা), আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬২।
বাংলার বাধ্যমে শিক্ষা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬২।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১০ মাঘ ১৩৬৩।
জাতীয় শিক্ষার কথা, আনন্দবাজার পত্রিকা, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৬৪।
শতবর্ষপূর্বে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, কৃষ্ণনগর কলেজ শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৪৮।
সে যুগের শিক্ষা, দেশ, ৫ ফাল্গুন ১৩৪০।
সেকালের জনশিক্ষা প্রচেষ্টা, ঐ (পূর্বোক্তপত্রিকা), ২৬ ফাল্গুন ১৩৪০।
কলিকাতায় শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, ঐ, ১০ চৈত্র ১৩৪০।
শিক্ষাবিস্তারে বাঙালী মনীষা, ঐ, ২৬ আশ্বিন ১৩৪১।
শিক্ষাবিস্তারে বাঙালী মনীষা (হিন্দু কলেজ), ঐ, ১৭ কার্তিক ১৩৪১।
সে যুগের জনশিক্ষা (কলিকাতার কথা), ঐ, ১৪ এবং ২১ কার্তিক ১৩৪৩।
ইংরেজী শিক্ষা ও জাতীয়তা, পাথেয়, শারদীয়া ১৩৬০।
ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের কথা, পুষ্পপাত্র, শ্রাবণ ১৩৩৯।
বাংলা শিক্ষা ও সরকারী নীতি, পূর্বাচল (সংকলন), ১৯৪৫।
জাতীয় গ্রন্থাগারের জন্মকথা, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৫৭।
জাতীয় গ্রন্থাগারের পঁচিশ বৎসর, ঐ, চৈত্র ১৩৫৭।
জাতীয় গ্রন্থাগারের তৃতীয় পর্ব, ঐ, বৈশাখ ১৩৫৮।
জাতীয় গ্রন্থাগারের রূপান্তর, ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৮।
সে যুগের শিক্ষা সংস্কৃতির কথা, ঐ, মাঘ ১৩৫৮।
কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের জন্মকথা, ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯।
কলা ও শিল্প মহাবিদ্যালয়ের প্রথম বৎসর, ঐ, আষাঢ় ১৩৫৯।
শিল্প বিদ্যালয়ের কথা, ঐ, শ্রাবণ ১৩৫৯।
শিল্প বিদ্যালয়ের পরিণতি, ঐ, আশ্বিন ১৩৫৯।
রাজা রামমোহন রায় ও ইংরেজী শিক্ষা, ঐ, পৌষ ১৩৬০।
শিক্ষা সংকট, ঐ, ফাল্গুন ১৩৬০।
সর্বশিক্ষা ও দেশজ্ঞান, বসুশ্রী, আশ্বিন ১৩৫৯।
বিদ্যার চর্চা, বসুধারা, ফাল্গুন ১৩৬৮।
সে যুগে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা, বাংলার শিক্ষক, বৈশাখ ১৩৫২।
বঙ্গে অবৈতনিক পদ্ধতিতে জনশিক্ষার প্রবর্তন, ঐ, আষাঢ় ১৩৫২।

কলিকাতায় জনশিক্ষা প্রতিষ্ঠার নূতন ধারা ১-৩, ঐ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, ১৩৫২।

সে যুগের প্রাথমিক শিক্ষার পরিকল্পনা, ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩৫২।

ইংরেজী শিক্ষার গোড়ার কথা, ঐ, ফাল্গুন ১৩৫২।

স্যার চার্লস ক্যাম্বেল ও প্রাথমিক শিক্ষা, ঐ, চৈত্র ১৩৫২।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা, ঐ, বৈশাখ ১৩৫৩।

বঙ্গে অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ১-২, পৌষ, মাঘ, ১৩৫৩।

কলিকাতার আর একটি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান—হিন্দু মেট্রোপলিটান কলেজ, ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৪।

কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, বেতার জগৎ, ভাগ ২০ সংখ্যা ১৭।

উচ্চ শিক্ষা নিরোধ প্রতিবাদ সভা, ঐ, ভাগ ২২ সংখ্যা ১৩।

বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত—শিক্ষায়, ঐ, ভাগ ২২ সংখ্যা ২২।

বেথুন স্কুল ও কলেজের কথা, বেথুন বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক গ্রন্থ, ১৯৫০।

বিজ্ঞান সাধনা ও বিশ্ববিদ্যালয়, মন্দিরা, পৌষ ১৩৬৩।

বিজ্ঞান সাধনা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ার কথা, যুগান্তর, ২৮ মাঘ ১৩৫৫।

বিদ্যাসাগর ও বেথুন বিদ্যালয়, ঐ, ১৩ শ্রাবণ ১৩৫৭।

বয়স্ক শিক্ষা ও বয়স্ক সাহিত্য, শিক্ষা, চৈত্র ১৩৬২।

পাঠ ও আবৃত্তি, ঐ, আষাঢ় ১৩৬৩।

বৃত্তিমুখী শিক্ষা, ঐ, ফাল্গুন ১৩৭০।

নারী-শিক্ষা

উচ্চ-শিক্ষায় নারী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ কার্তিক, ১৩৬৪।

বাংলার স্ত্রীশিক্ষার কথা (১৮৩৮-১৯০৯), জয়শ্রী, বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন, কার্তিক, ১৩৬৭।

সে যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা, দেশ, ২৭ আষাঢ় ১৩৪৩।

হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় ও বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫৭।

বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের নাম কি ছিল, ঐ, ভাদ্র ১৩৫৭।

সে যুগের স্ত্রীশিক্ষার প্রচেষ্টা—হিন্দু প্রচেষ্টা, ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩৪২।

সে যুগের স্ত্রীশিক্ষা প্রচেষ্টা—খ্রীষ্টানী প্রচেষ্টা, ঐ, ভাদ্র ১৩৪২।

নারীর শিক্ষা, শিক্ষা, চৈত্র, ১৩৭০।

বামা হিতৈষিণী সভা ও ভারত আশ্রম, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫৭।
স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলনে কেশবচন্দ্র সেন, ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৭।

জীবনী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র স্মরণ, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৪ পৌষ ১৩৫৬।
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, ঐ, বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৫৬।
মাতাজী মহারাণী তপস্বিনী, ঐ, ১৩ ফাল্গুন ১৩৫৭।
প্রমথনাথ বসু, ঐ, ১২ বৈশাখ ১৩৬১।
মৃণালকান্তি ঘোষ, জয়শ্রী, পৌষ ১৩৬৫।
মোহিনী দেবী, ঐ, মাঘ ১৩৬৫।
উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, চৈত্র ১৩৬৫।
মানকুমারী বসু, ঐ, কার্তিক ১৩৭০।
পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, দেশ, ২০ মাঘ ১৩৪০।
রাধানাথ শিকদার প্রসঙ্গ, ঐ, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩৪৩।
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর, ঐ, ১১ ফাল্গুন ১৩৪৪।
শিক্ষাব্রতী সতীশচন্দ্র (চট্টোপাধ্যায়), ঐ, ৭ শ্রাবণ ১৩৪৫।
শিশিরকুমার ঘোষ, প্রবর্তক, কার্তিক-মাঘ, চৈত্র, ১৩৫৬।
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাথুরিয়াঘাটা), প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১।
কবি ভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী, ঐ, আষাঢ় ১৩৫৮।
প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, ঐ, বৈশাখ ১৩৫৯।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, আষাঢ় ১৩৭২।
আচার্য যদুনাথ সরকার, বসুধারা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৫।
চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য, ঐ, আশ্বিন ১৩৬৮।
রাজশেখর বসু, ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯।
অক্ষয়কুমার নৈত্রেয়, বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮।
দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭১।
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ঐ, মাঘ-চৈত্র ১৩৭১।
পলুয়া-মাগুরার ঘোষ ভ্রাতৃগণ (১), যুগান্তর, ২৩ শ্রাবণ ১৩৫২।
পলুয়া-মাগুরার ঘোষ ভ্রাতৃগণ (২)—হেমন্তকুমার ঘোষ, ঐ, ২ ভাদ্র ১৩৫২।
পলুয়া-মাগুরার ঘোষ ভ্রাতৃগণ (৩)—শিশিরকুমার ঘোষ, ঐ, ৯ ভাদ্র ১৩৫২।
সাংবাদিক কালীনাথ রায়, ঐ, ২৯ পৌষ ১৩৫২।
সাহিত্য-সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ, ঐ, ১৪ বৈশাখ ১৩৫৯।

রাধানাথ শিকদার (১৮১০-৭০), যুগান্তর, ৮ কার্তিক ১৩১০।

পণ্ডিত উপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শিক্ষা, আষাঢ় ১৩৭১।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৪০) [প্রথম জীবনের কথা], সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ৪৭ বর্ষ, সংখ্যা ১।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ঐ, ৫০ বর্ষ, সংখ্যা ৪।

ক্ষুদিরাম বসু, সেণ্ট্রাল কলিজিয়েট স্কুল ডায়মণ্ড জুবিলী স্যুভেনির, ১৯৫৫।

রাজনারায়ণ বসু, হিন্দুস্থান, ২৯ আষাঢ় ১৩৫১।

রাজনীতি

ভারতের জাতীয় ইতিহাসের অর্ধ-শতাব্দী, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৫ পৌষ ১৩৫৭।

ব্রহ্মবান্ধব প্রয়াণে সমসাময়িক সংবাদপত্র, ঐ, ৩ কার্তিক ১৩৫৮।

গান্ধীপূর্ব যুগে জাতীয় আন্দোলন, ঐ, ১২ মাঘ ১৩৫৮।

স্বদেশী আন্দোলনের সূচনা ঐ, ১৩ শ্রাবণ ১৩৬২।

স্বদেশী আন্দোলনের সুবর্ণ জয়ন্তী, ঐ, ২১ শ্রাবণ ১৩৬২।

স্মরণীয় তিরিশে আশ্বিন, ঐ, ২৯ আশ্বিন ১৩৬২।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ভূমিকা, আর্থিক প্রসঙ্গ, ২য় বর্ষ, সংখ্যা ১২।

প্রাদেশিকতা বনাম জাতীয়তা, উষা, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩৫৭।

বাঙালীর স্বরাজ-সাধনা, চলতিকা, শারদীয়া ১৩৫৪।

জাতীয়তার ভিত্তি রচনায় স্বামী বিবেকানন্দ, জয়শ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০।

শিশিরকুমার ও হিন্দুমেলা, দীপায়ন, মাঘ ১৩৫৩।

কংগ্রেস-পূর্ব যুগে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রবাসী, ফাল্গুন ১৩৪৭।

বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের গোড়ার কথা, ঐ, কার্তিক ১৩৫০।

ভারত-সভার জয়ন্তী উৎসব, ঐ, ফাল্গুন ১৩৫৯।

বঙ্গে বিপ্লব আন্দোলনের গোড়ার কথা (প্রতিবাদের উত্তর), ঐ, আশ্বিন ১৩৬০।

চীনে নবজীবনের উন্মেষ, বঙ্গশ্রী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৫।

ভারতবর্ষীয় সভা, বিশ্বভারতী পত্রিকা, শ্রাবণ-আশ্বিন, কার্তিক-পৌষ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৬৯।

ভারতবর্ষীয় সভা, ঐ, বৈশাখ-আষাঢ়, মাঘ-চৈত্র, ১৩৭০।

ভারতবর্ষীয় সভা, ঐ, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭২, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭৩।

জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গ মহিলা, বেথুন বিদ্যালয় স্মারক গ্রন্থ, ১৯৫০।

বন্দেমাতরম ও বঙ্কিমচন্দ্র, মন্দিরা, আশ্বিন ১৩৬০।
ভারতীয় পটভূমিকায় বাংলার জাতীয়তা, যুগান্তর, শারদীয়া ১৩৬০।
ভারতীয় রাজনীতিতে বিপ্লবী ভাবধারা, শনিবারের চিঠি, কার্তিক ১৩৬৪।
কংগ্রেসপূর্ব্ব যুগের স্বদেশ প্রেমাত্মক কবিতা ও সঙ্গীত, হিন্দুস্থান, শারদীয়া ১৩৫২।

অর্থনীতি

যশোহরের নীল আন্দোলনের কথা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ৬ মাঘ ১৩৫৮।
চা-শিল্পের গোড়ার কথা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ৩য় বর্ষ, সংখ্যা ২।
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানী, প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৫১।
যশোহরের নীল আন্দোলন ও শিশিরকুমার ঘোষ, ঐ, ফাল্গুন ১৩৫৮।
যশোহরের নীল আন্দোলন সম্পর্কে আরও তথ্য, ঐ, চৈত্র ১৩৫৮।
সে যুগের ধাতু খোদাই ও কাঠ খোদাই শিল্প, ঐ, বৈশাখ ১৩৬১।
সেভিংস ব্যাঙ্কের গোড়ার কথা ঐ, পৌষ ১৩৬১।

সমাজ ও সংস্কৃতি (ব্যাপক অর্থে)

বাংলার মেলা, অমৃত, ৩ শ্রাবণ ১৩৬৮।
কলিকাতার ভিক্ষুক, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৭ কার্তিক ১৩৪৩।
পল্লীর আমোদ উৎসব, ঐ, ২৭ কার্তিক ১৩৪৩।
জাতীয় গ্রন্থাগার, ঐ, ১৮ মাঘ ১৩৫৯।
অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন, ঐ, শারদীয়া ১৩৬৩।
পল্লীর সংস্কৃতি, ঐ, ৭ অগ্রহায়ণ ১৩৬৫।
বয়ানি ও কথকথা, ঐ, ১২ পৌষ ১৩৬৫।
গাজের সংস্কৃতি, কবি ঈশ্বর গুপ্ত স্মারকগ্রন্থ, ১৯৫৮।
কৃষি ও ছাত্র সমাজ, খাদ্য উৎপাদন, ১৬ আশ্বিন ১৩৫৭।
সেকালের পূজাপার্বন, দেশ, ১৯ আশ্বিন ১৩৪১।
কলিকাতার কথা, ঐ, ৮ অগ্রহায়ণ ১৩৪১।
মহেন্দ্রলাল সরকার ও ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞান সভা, ঐ, ১৬ চৈত্র ১৩৪১।
কলিকাতার ভিক্ষুক সমস্যা, ঐ, ৩ আশ্বিন ১৩৪৩।
আসামের সংস্কৃতি ও বাংলা, ঐ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪।
আমেরিকার হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৪৮।
সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও হিন্দু সঙ্গীত, ঐ, ফাল্গুন ১৩৫৩।

স্বাধীন ভারত ও ছাত্র সমাজ, প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬।
বিদেশীর চক্ষে হিন্দু-দেব-দেবী, ঐ, কার্তিক ১৩৫৬।
সে যুগের বিজ্ঞান সাধনা, ঐ, কার্তিক ১৩৫৭।
শিশিরকুমার ঘোষ ও জাতীয় রঙ্গমঞ্চ, ঐ, পৌষ ১৩৫৮।
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ, ঐ, শ্রাবণ ১৩৬১।
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজের কথা, ঐ, চৈত্র ১৩৬১।
বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (৩য় পর্ব), ঐ, বৈশাখ ১৩৬২।
বাংলার জাগরণ (সমালোচনা প্রবন্ধ), ঐ, শ্রাবণ ১৩৬২।
বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভা, ঐ, কার্তিক ১৩৬২।
সমাজবিজ্ঞান সভার কথা (বঙ্গীয়), ঐ, পৌষ ১৩৬২।
সমাজবিজ্ঞান সভার শেষ পর্ব্ব, ঐ, চৈত্র ১৩৬২।
বাংলার নারী, প্রবাসী, ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থ, ১৩৬৭।
বাঙ্গালীর ইতিহাস চর্চা, ঐ গ্রন্থ।
দুর্গত সেবায় বঙ্গনারী, বঙ্গলক্ষ্মী, কার্তিক ১৯৫০।
বাংলার মেয়ে, ঐ, কার্তিক ১৩৫২।
গ্রামের কথা, বন্ধু, শারদীয়া ১৩৬৯।
বহরমপুরে বঙ্কিমচন্দ্র, বাণী, শারদীয়া ১৩৬১।
বারাসতের কথা, বোধন, শারদীয়া ১৩৬৫।
সে যুগের দুর্গোৎসব, মধুবাংশ, শারদীয়া ১৩৬৭।
পল্লীবাসীর দুঃখ, যুগান্তর, ১৭ চৈত্র ১৩৫২।
গ্রন্থাগার ও গবেষণা, মন্দিরা, আশ্বিন ১৩৬২।
গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার, ঐ, আশ্বিন ১৩৬৩।
পল্লীর গ্রন্থাগার, ঐ, আশ্বিন ১৩৬৪
ভারতে দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান, যুগান্তর, ৩ শ্রাবণ ১৩৫৪।
বঙ্গের সংস্কৃতি রক্ষা, ঐ, শারদীয়া ১৩৫৯।
স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতধর্ম, শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৬।
গৌড়ীয় সমাজ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, বর্ষ ৬০ সংখ্যা ১।
গৌড়ীয় সমাজ : প্রতিবাদ ও উত্তর, ঐ, বর্ষ ৬০ সংখ্যা ২।
শতবর্ষ পূর্বে হিন্দু সংগঠন ও পতিতোদ্ধার প্রচেষ্টা, হিন্দুস্থান, শারদীয়া ১৩৫১।

ইতিহাস, সাহিত্য, ভাষা ইত্যাদি

বাংলার চর্চা, আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ পৌষ ১৩৬৪।

ইতিহাসের আকর, ঐ, শারদীয়া ১৩৬৪।

সাময়িক সাহিত্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রাক্-প্রবাসী যুগ), কথাসাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২।

রসসাহিত্যে শিশিরকুমার, কালান্তর, শারদীয়া, ১৩৬৭।

প্রবাসী, জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৭২।

ইতিহাস কি গল্প ? পুরবী, শারদীয়া ১৩৬১।

বাংলা সাহিত্য, বসুধারা, মাঘ ১৩৬৯।

রাষ্ট্রভাষা ও বাংলা, বোধন, শারদীয়া ১৩৬৩, শারদীয়া, ১৩৬৪।

বাংলা ভাষা, মধুবাংশ, শারদীয়া ১৩৬৮।

বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, নন্দিরা, আশ্বিন ১৩৫৮।

বাংলা অনুবাদ সাহিত্য (গোড়ার কথা), ঐ, বৈশাখ ১৩৬৯।

বাংলা ভাষার পুষ্টি, রাখী, বিশেষ সংখ্যা (তারিখ নাই)।

আদালতে বাংলা ভাষা, শনিবারের চিঠি, ফাল্গুন ১৩৫০।

রমেশচন্দ্র দত্ত ও মনন সাহিত্য, ঐ, বৈশাখ ১৩৬৬।

মুদ্রণশিল্পের ইতিকথা, শ্রীসরস্বতী, বর্ষ ১, সংখ্যা ১-৪ ও বর্ষ-২, সংখ্যা-২।

অন্যান্য

রবীন্দ্রনাথ কি অহিন্দু ?, শনিবারের চিঠি, চৈত্র ১৩৫১।

বাংলার মৎস্য ও গোজাতি, বসুন্ধরা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৫৬।

কি দেখিলাম, আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৮ জ্যৈষ্ঠ, ৩ ও ১০ আষাঢ়, ১৩৪৫।

সেকালের লোক, দেশ, ২৭ মাঘ ১৩৪০।

শতবর্ষ পূর্বেকার ভূমিকম্পের কথা, ঐ, ১২ ফাল্গুন ১৩৪০।

পুরাতন প্রসঙ্গ, ঐ, ১২ ভাদ্র ১৩৪১।

বাদশাহী বিচার পদ্ধতি, ঐ, ২৮ বৈশাখ ১৩৪২।

প্রবাসে বাঙালীর কৃতিত্ব, ঐ, ২৪ আশ্বিন ১৩৪২।

এভারেস্ট অভিযান ও ভারতীয় শেরপা, প্রবাসী, কার্তিক ১৩৪২।

ভারতীয় নৃত্যকলা, ঐ, কার্তিক ১৩৪৯।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কয়জন, ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১।

রাজনারায়ণ বসু ও আশ্চর্য্য স্বপ্ন, প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৫১।
কোথায় আসিয়াছি, ঐ, চৈত্র ১৩৫২।
এভারেস্ট বিজয় প্রসঙ্গ, ঐ, শ্রাবণ ১৩৬০।
মধুসূদন দত্ত কি একজন ?, ঐ, আষাঢ় ১৩৬২।

[শেষাংশ ১৪৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

[পরলোকগত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করার উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রীগৌতম নিয়োগী লিখিত প্রবন্ধটি আমরা প্রকাশ করলাম। ৬ জানুয়ারি (১৯৭২ খ্রী) যোগেশচন্দ্র বাগলের মৃত্যু হয়। ১৮ জানুয়ারি যোগেশচন্দ্রের শ্রাদ্ধবাসরে নবব্যারাকপুর সমবায় হোমস লিঃ-এর পক্ষে শ্রীকানাইলাল দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীহরিপদ বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত 'যোগেশচন্দ্র বাগল' নামক পুস্তিকা বিতরণ করা হয়। এই পুস্তিকায় যোগেশচন্দ্রের জীবনকথার সাথে তাঁর গ্রন্থসমূহের একটি তালিকাও প্রকাশিত হয়েছে। উৎসাহী গবেষকেরা এই পুস্তিকা আলোচনা করলে উপকৃত হবেন।

—সম্পাদকমণ্ডলী, 'ইতিহাস']

বিশপ উইলসন—নদীয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার

রাধামাধব সাহা

বিশপ ডানিয়েল উইলসন দীর্ঘ ২৫ বৎসর ভারতে চার্চ-মিশনরী সোসাইটির কর্ণধার ছিলেন। তিনি যে সময়ে কলকাতার লর্ড বিশপ এবং ভারতের মেট্রপলিটান ছিলেন—১৮৩২ থেকে ১৮৫৮ সাল—ঐ সময়ে অনেক মিশনরী ভারতে খ্যাতি অর্জন করেছেন। শিক্ষা প্রসারের দিক থেকে এই সময়কে আলেকজাণ্ডার ডাফের যুগ বলা হয়ে থাকে। এই সময়েই রেভাঃ লঙ্ বাংলায় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। রেভাঃ ওয়েটস্লেখ্ বর্ধমানে মিশনরী কাজের জন্য বাঙালীর চিত্ত আকর্ষণ করেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এঁদের সবার উপরে থেকেও বিশপ উইলসন ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর মিশনরীদের ইতিহাসে তাঁর নাম কদাচিৎ উল্লিখিত হয়, অথবা কলকাতার বিখ্যাত সেণ্ট পলস্ ক্যাথেড্রাল নির্মাণের জন্যই কেবলমাত্র তাঁকে স্মরণ করা হয়।

উইলসন ভারতে আসার আগে অক্সফোর্ডের 'টিউটর', সেণ্ট জন্স্-এর 'মিনিষ্টার' এবং ইলিংটনের 'ভাইকার' ছিলেন।[১] তিনি দাসত্বপ্রথা-রোধ আন্দোলনে উইলবার ফোর্সের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন এবং আয়রল্যাণ্ড-এর ক্যাথলিকদের মুক্তি আন্দোলনেরও সমর্থক ছিলেন। প্রায় চল্লিশ বৎসর ভারতের ব্যাপারে আগ্রহ দেখানোর পর ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে লর্ড গ্রেনেগ ভারতের 'বিশপরিক'-এর জন্য তাঁর নাম সুপারিশ করেন।

উইলসন যখন ভারতে আসেন, তখনও এদেশে চার্চ-মিশনরী সোসাইটির শৈশবাবস্থা। উইলসনের 'ফ্লক'রা সুবিস্তীর্ণ এলাকায় ছড়িয়ে ছিল। হিমালয় থেকে সিংহল, পারস্য উপসাগর থেকে মালাক্কা প্রণালী পর্যন্ত তাঁর কর্মক্ষেত্র। অদম্য উৎসাহ, কর্মশক্তি ও প্রেরণা নিয়ে উইলসন তাঁর 'বিশপরিক'-এর প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন। ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, কুয়েডা প্রভৃতি দেশে একাধিকবার পরিভ্রমণ করতে গিয়ে তিনি সমুদ্রপথে বিপদের মুখে পড়েন, মধ্যভারতের জঙ্গলাকীর্ণ এলাকায় হিংস্র জন্তুর আক্রমণের সম্মুখীন হন, ডাকাতদের

হাতে নিগৃহীত হন, আবার অসাধারণ ঝুঁকি নিয়ে আলবোডা-অলকানন্দা এলাকায় ঘুরে বেড়ান। সাতবার তিনি 'পরিক্রমা'য় (visitation) বের হন। শেষবার, সাতাত্তর বৎসর বয়সে ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুরে। বিশপ উইলসনের আগের নয় বৎসরে চারজন বিশপ—মিডলটন (১৮২২), হেবার (১৮২৬), জেনস্ (১৮২৮) ও টারনার (১৮৩১) ভারতে অকালমৃত্যু বরণ করেন। উইলসন দীর্ঘকাল ভারতে কর্মতৎপর থেকে আশি বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করেন। এদেশে একজন ইউরোপীয়ের সুদীর্ঘ কর্মময় জীবন বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

উইলসন ভারতে আসার আগে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। এদেশে থাকাকালীন তিনি ইংলণ্ডে তাঁর আত্মীয়দের কাছে প্রায়ই চিঠি লিখতেন। মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র বিশপের প্রথম নয় বৎসরের লেখা চিঠির এক সঙ্কলন Bishop Wilson's Journal Letters নামে ১৮৬৩ সালে প্রকাশ করেন।[২] এই চিঠিগুলিতে বিশপ ভারতের ধর্ম, সামাজিক রীতিনীতি এবং বিভিন্ন স্থান সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও একান্ত ব্যক্তিগত মতামত পুত্র ও পুত্রবধূর কাছে লিখে পাঠান। বিশপ হেবার-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী হেবারের ডায়েরি এবং চিঠিপত্র সম্পাদনা করে বিখ্যাত Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India পুস্তকখানি প্রকাশ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাস লিখতে ঐতিহাসিকেরা বার বার এই বই থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে থাকেন। ভারত সম্বন্ধে ইংরেজদের লেখা আধ-ডজন বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে এটিকে ধরা হয়।[৩] বিশপ উইলসনের Journal Lettersও ভারত-ইতিহাসের ছাত্রের কাছে খুবই মূল্যবান রচনা। কিন্তু মনে হয়, বইটি এ পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের যথেষ্ট নজরে পড়েনি।

১৮৩৭ সালে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে ঢাকা থেকে বিশপ উইলসন লিখছেন,[৪] বিশপ হেবারের মন্তব্য থেকে ঢাকা শহরের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায় না। হেবার ঢাকায় থাকাকালে তাঁর সঙ্গী স্টোউ-এর অসুস্থতা ও শেষে মৃত্যুতে অতিশয় কাতর ছিলেন। ঢাকার অপূর্ব সৌন্দর্য তাঁর দৃষ্টিতে পড়েনি। ঢাকার রাস্তাঘাট, নদীবন্দর বেনারসের চেয়েও সুন্দর। চার মাইল বিস্তৃত শহরে আধুনিক ধরনের বাড়ি, পামগাছের সারি, মাঝে মাঝে নবাবদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ, গ্রীক আর্মেনিয়ান, পর্তুগীজ চার্চ, মন্দির, মসজিদ, বৌদ্ধ মন্দির, কোথাও কোথাও সুউচ্চ মিনার, সব মিলিয়ে অত্যন্ত মনোরম দৃশ্য।

> "All constitute a perfectly enchanting place, even to me, who have now seen almost all India _It is more like an English view of some portions of the Thames."

তিনি ১৮৩৮ সালের নভেম্বর মাসে চট্টগ্রাম থেকে পাঁচ মাইল দূরে স্যর উইলিয়ম জোন্সের বাড়ি দেখতে যান। সেখান থেকে লিখেছেন[৪]

"...there is a melancholy pleasure in tracing the favourite spots of the poet and the philosopher".

ঘন জঙ্গল অতিক্রম করে পাহাড়ের চূড়ায় জোন্সের বাড়ি—চল্লিশ বৎসরে ছাদ ধ্বসে পড়েছে—কেবল দেওয়াল দেখা যায়। যে দিকটায় জোন্সের পড়ার ঘর ছিল, সেখান থেকে একদিকে প্রসারিত সমুদ্র, অন্যদিকে সবুজ পাহাড়, নিচে গভীর উপত্যকা—বিস্ময়কর পরিবেশ।

ভারতের নানা প্রান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে বিশপ উইলসন এখানকার সামাজিক জীবনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেছেন। আমীরগড়ে দেখেছেন, সেখানকার স্ত্রীলোকদের দেখা হত পশুর মত। আর পুরুষদের জীবন ছিল—

"...Indolence and quietism, sugar and sweetness of diet, sleep and lust, savageness and fawning, fatness of body and sordid avarice, servility and desperate deeds...."

এই সব মিলিয়ে। এক জাতীয় ব্রাহ্মণদের ৩০-৪০ জনেরও বেশি সংখ্যায় স্ত্রী।[৫] আবার হিমালয়ের পার্বত্য এলাকার লোকেরা ঠিক বিপরীত। সেখানকার মেয়েরা বহু স্বামীত্বের গর্ব ও সুখ অনুভব করার জন্য কন্যাসন্তানদের শিশু অবস্থায় হত্যা করে।

"They usurp all the commanding offices of life, and send their husbands about to nurse children, fetch water and perform all meaner services."[৬]

বিশপ উইলসন ভারতের বহুস্থানে সহমরণ লক্ষ্য করেছেন এবং রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁর হারেম-ভুক্ত মহিলাদের মধ্যে চার স্ত্রী ও সাতজন রক্ষিতার সহমরণের প্রত্যক্ষদর্শী বিবরণ পাঠিয়েছেন।[৭]

আরাকানের পাহাড়ের চূড়ায় এক বিরাট পাথরের নিচে সাত রাজার ধন লুকানো আছে, ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করে চৌদ্দটি নরবলি দিলে এ ধন আবিষ্কার করা যাবে—এই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যেই পুরোহিতেরা প্রথমে চারজন লোককে বলি দিয়ে ধরা পড়ে যায়।[৮] অন্যত্র, একজন ব্রাহ্মণ এক শিশুকে বলি দেবার জন্য লুকিয়ে রাখে। রাজপুরুষেরা ছেলেটির উদ্ধারের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করলে ব্রাহ্মণ পুরস্কার নিয়ে ছেলেটিকে ফেরৎ দেয়, পরে নিজের পুত্রকে বলি দেয়।[৯]

ভারতীয় বাবুদের সম্বন্ধে উইলসনের মন্তব্য :

"A Baboo is a mass of ghee and sugar."[১১]

বিশপ হেবারের 'milk of human kindness' উইলসনের মধ্যে ছিল না। ভারতের সব ধর্মের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা, তাছিল্য তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। অবশ্য ধর্মপ্রচারক হিসাবে এটাই স্বাভাবিক। মিশনরীদের মধ্যে হেবার উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। উইলসন ভারতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রায় প্রত্যেক প্রধান প্রধান তীর্থস্থানে ভ্রমণ করেছেন এবং এই স্থানগুলির বর্ণনা ও এদেশীয় ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য প্রকাশ করেছেন।

পুরী থেকে লিখেছেন, সেখানে—

"...no trade but sin, no art but delusion and lies, no bond of union but communion in Idolatry...Bands of music, troops of dancers of the vilest order, noisy, intemporate debauchery, with the most profane songs and unutterable pollutions of every kind, make up the religious rites of Juggernaut."

ভারতের সব প্রান্ত থেকে প্রতি বৎসর প্রায় দেড়লক্ষাধিক তীর্থযাত্রীকে ভেড়ার পালের মত এখানে আনা হয়—এদের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ রোগে, ক্লান্তিতে ও অন্নাভাবে মারা যায়।[১২]

হেবার ও উইলসন উভয়েই আজমীরে খাজা সাহেবের সমাধি দেখতে যান। হেবার দুঃখ করেছেন, তিনি যখন যান তখন এমনি এক বালির ঝড় উঠে যে তাঁর পক্ষে সমাধিক্ষেত্র দেখা অসম্ভব হয়।[১৩] উইলসন লিখেছেন, হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পবিত্র এই সমাধিক্ষেত্র—যেখানে সম্রাট আকবর এগারবার তীর্থ করতে এসেছিলেন, সেখানে তিনি প্রবেশ করতে গিয়ে ফিরে চলে আসেন, কারণ মোল্লারা তাঁকে জুতো খুলে যেতে বলেছিল।[১৪]

লুধিয়ানায় শিখদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন :

"they are now sunk again into all the idolatry and abomination of Hinduism like those around them .."[১৫]

এমনি কত কত মন্তব্য Journal Letters-এ ইতস্তত: ছড়িয়ে আছে, উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের উপাদান হিসাবে যার মূল্য অনস্বীকার্য।

২

বিশপ উইলসনের সময়েই নদীয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার শুরু হয়। উইলসনের বই থেকে এবং সমসাময়িক অন্যান্য মিশনরীদের লেখা থেকে আমরা নদীয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের ধারাবাহিক ইতিহাস জানতে পারি।

১৮৩১ সালে রেভাঃ জে. আর. ডি. ডিয়ার-এর পরিচালনায় চার্চ-মিশনরী সোসাইটির এক শাখা কৃষ্ণনগরে খোলা হয়।[১৬] ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নদীয়ায় কোন ধর্মান্তরকরণের ঘটনা জানা যায় না। এই সময়টা রেভাঃ ডিয়ার অসীম ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করতে থাকেন এবং একজন খাঁটি 'ইভ্যানজেলিষ্ট্'-এর মত ধর্মের আলো ছড়াবার আগে জ্ঞানের আলো ছড়াতে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় কৃষ্ণনগর এবং নবদ্বীপে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শত শত হিন্দু ছেলে-মেয়েরা এখানে সোৎসাহে পাঠ গ্রহণ করে।[১৭]

নদীয়ায় প্রথম ধর্মান্তরকরণের বিবরণ মিসেস ওয়েটব্রেখট-এর বইয়ে পাওয়া যায়।[১৮] তিনি লিখেছেন, কৃষ্ণনগর শহরের তিনটি বড় পরিবারের পাঁচজন পুরুষ খৃষ্টধর্ম প্রথম গ্রহণ করে। খবরটি জানাজানি হতেই শহরে হুলস্থুল পড়ে গেল। পরদিন শহরের গণ্যমান্য লোকেরা মিলিত হয়ে ঠিক করেন, যারা ধর্মান্তরিত হয়েছে তাদের বাবা-মা আত্মীয়স্বজনদের তাঁদের বাড়িতে আসতে দেবেন না আর ওদের ধোপা, নাপিত এবং হুঁকো বন্ধ করে দেওয়া হবে। পাঁচ-জন নব-খৃষ্টানকে বাজারের পথে এক উত্তেজিত জনতা ঘিরে ধরল। জনতা তাদের প্রতি কটূক্তি করতে থাকে আর ভিত্তাদা করে, কেন তোমরা খৃষ্টান হলে। সেই পাঁচজন লোক বুঝাবার চেষ্টা করে, কিন্তু জনতা আরও উত্তেজিত হয়ে তাদের প্রতি খৃষ্টানদের কথাতেই বিদ্রূপবাণ ছুঁড়তে থাকে: "Repent, brethren repent. the kingdom of Heaven is at hand."

যে পাঁচজন নদীয়াবাসী প্রথম খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে তারা কর্তাভজা সম্প্রদায়ের লোক। সমসাময়িক মিশনরীদের লেখায় কর্তাভজাদের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আউলচাঁদ এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আউলচাঁদের প্রধান শিষ্য রামশরণ পাল কর্তাভজাদের সংগঠিত করেন। ১৮০২ সালে মিশনরী মার্শম্যান রামশরণের সঙ্গে দেখা করেন। রেভাঃ ওয়েটব্রেখট্ লিখেছেন[১৯]—কর্তাভজারা গঙ্গা ও তার শাখা-প্রশাখার তীরবর্তী জনপদগুলিতে ছড়িয়ে আছে। রামশরণ প্রথমে তাঁর বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশীদের দলভুক্ত করেন। তারপর প্রতি বৎসর কর্তাভজাদের সংখ্যা বেড়েই চলে। সকল বর্ণের হিন্দু, মুসলমান, ফিরিঙ্গী (Indo-Britons), এমন কি পর্তুগীজদের বংশধরেরাও এদের ধর্মাবলম্বী। এদের সংখ্যা দেড়লক্ষাধিক হবে। ওয়েটব্রেখট কর্তাভজাদের অসাধারণ উদ্যম ও প্রাণশক্তি লক্ষ্য করেছেন। দিকে দিকে এদের প্রচারকেরা কাজ করছিল। বর্ধমানে ওয়েটব্রেখট এমনি একজন প্রচারকের সাক্ষাৎ পান।

তিনি সুদর্শন, ব্রাহ্মণসন্তান, মার্জিতরুচি, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও সদালাপী, চমৎকার বক্তৃতা করেন।

কর্তাভজারা একেশ্বরবাদী। এরা জাতিভেদ ও বর্ণভেদ মানে না। প্রতি বৃহস্পতিবার সূর্যাস্তের পর বহুসংখ্যায় মিলিত হয়ে মাটিতে স্বগাকারে উপবেশন করে গুরুর ভজনা করে। ভজনান্তে একসাথে রুটি ছিঁড়ে খায় আর একই পাত্র নিয়ে পান গ্রহণ করে।

মিশনরীরা মনে করত, খৃষ্টের অশেষ করুণায় কর্তাভজারা বাইবেলের বাণী গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে, আর এদের দিয়ে শুরু করে সমগ্র হিন্দু-সমাজ ধর্মান্তরিত করা যাবে।

কিন্তু কর্তাভজাদের ধর্মীয় বিশিষ্টতাই ১৮৩৮-৩৯ সালে নদীয়ায় বহুসংখ্যক ধর্মান্তরকরণের কারণ নয়। ১৮৩৮ সালে জেলায় প্রবল বন্যা হয় আর ঐ সঙ্গে দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। উইলসন লিখেছেন, তিনি মোয়ার্ড-এর "taking advantage of famines"-এর দৃষ্টান্ত কৃষ্ণনগরে অনুসরণ করছেন।[২০] কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্টের Rural life in Bengal বইয়ে এর কিছু বিবরণ পাওয়া যায়।[২১] রেভা: ডিয়াস কলকাতা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে নিয়ে আসেন এবং দরিদ্র খৃষ্টানদের খাবার ও অর্থ দিতে থাকেন। এ সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই ডিয়াসের "flock of professing Christians became amazing"। গ্রাণ্ট দুজন "hypocritical Catechists"-এর উল্লেখ করেছেন যারা স্থানীয় অধিবাসীদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করে। বিশপ উইলসন রেভা: কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশপস্ কলেজের ছাত্র ব্রজনাথ ঘোষকে সেখানে পাঠান। তাছাড়া বর্ধমান থেকে ওয়েটক্রেখট আসেন, আর আসেন আর্চডেকন ডিয়েলট্রি ও মির্জাপুর থেকে স্মাণ্ডিস্।

নদীয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রসারের ক্রমিক ও বিস্তৃত বিবরণ উইলসন লিপিবদ্ধ করেছেন। ১৮৩৯ সালের ১২ই মার্চ লিখছেন[২২]—কৃষ্ণনগরের সংবাদে আমার মন আনন্দে ভরে আছে। স্মাণ্ডিস্ এবং সব প্রচারকেরাই একমত যে ১০-১২ হাজার লোক খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নিচ্ছে (enquirers) ; যদি লেগে থাকা যায় তবে এরা সবাই ধর্মান্তরিত হবে। (প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, খৃষ্ট ধর্মান্তরকরণের চারটি ধাপ ছিল—enquiry, instruction. baptismal এবং confirmation। শেষ ধাপ অতিক্রম করলে সত্যিকার খৃষ্টান বলে গ্রহণ করা হত।

তখন উইলসন সব সময় নদীয়ার খবর নিতেন। ১৮৩৯ সালের ১৭ই জুলাই লিখছেন[২৩]—কৃষ্ণনগরের বিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত 'সোলো' থেকে খবর এসেছে

কুড়িটি গ্রামের প্রায় চার হাজার লোক 'অনুসন্ধিৎসু' (enquirers) পর্যায়ে। ৫০০ জন ইতিমধ্যেই baptized হয়েছে। এটা কেবল শুনেনা, মনে হচ্ছে সমস্ত লোকই এবং আশপাশের বহু গ্রামের অধিবাসীই খৃষ্টান হতে চলেছে।

ঐ বৎসর ১৯শে অক্টোবর উইলসন কৃষ্ণনগরে যান। তিনি শুনলেন, সাত হাজার লোক হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছে। বিশপের যেন বিশ্বাস হয় না—সমস্ত বাহাত্তরটি গ্রামের অধিবাসী "জিজ্ঞাসাবাদ" করে চলেছে। কৃষ্ণনগরের কাছে জলঙ্গীর উত্তর তীরের গ্রামের কর্তাভজা সম্প্রদায়ের দুই গুরু তাঁদের দুহাজার শিষ্য নিয়ে এসে মিশনরীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে গিয়েছেন। তাঁরা এখনও সম্পূর্ণ মনস্থির করতে পারেননি ; যাই হোক—

"fire spreading all around, as a spark carried by the wind over the dried heath."[২৩]

কৃষ্ণনগরে বিশপ দেখলেন, সেখানকার বিস্তালয়গৃহ লোকে ভরে আছে। স্ত্রীলোক ও শিশুরাই সংখ্যায় দুই-তিনশ' হবে—তারা বারান্দায় ভিড় করেছে। ঘরে পাখা নেই, তবু বিশপ দুঘণ্টা ধরে চীৎকার করে করে নব-খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে বাঙলায় অভিভাষণ দিলেন এবং তাদের 'confirm' করলেন।

"It was a blessed sight. Most of the men had been Kurta-bhojites of the Mahometan class. Many were advanced in life, with fine Mussalman features, black flowing beards, eyes brightening as questions were proposed. I looked at them again and again with indescribable affection..."[২৪]

সে সময় নদীয়ার রাস্তাঘাট বন্যার জলে ভেসে গিয়েছিল। তবু বিশপ অশেষ কষ্ট সহ্য করে একটার পর একটা 'ষ্টেশন' পরিদর্শনে গেলেন। তিনি সোলো, রতনপুর, ছরা, আনন্দবাস, রাণাঘাট প্রভৃতি স্থানে ঘুরেছেন। লিখে পাঠিয়েছেন :

"I could hardly sleep for agitation, joy and anxiety to direct everything aright."

আনন্দবাসে দেড়শ' ও রাণাঘাটে আড়াইশ' জনকে baptise করার বর্ণনাও পাঠিয়েছেন।[২৫]

কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে উইলসন শুনতে পেলেন, কর্তাভজাদের তৃতীয় একজন গুরু ষাট মাইল দূর থেকে এসেছিলেন। তাঁর এক হাজার হিন্দু শিষ্য আছে। গুরু ডিয়াসকে প্রশ্ন করেছিলেন—"ধর্মের সত্যপথ কি ? আমি একজন মুসলমান শ্রেণীর কর্তাভজা। কোরান ছুঁড়ে ফেলেছি। আমি বিশ্বাস করি, ভগবানকে

দেখলে মুক্তি পাওয়া যাবে আর ভগবান দেখা দেবেন মানুষের রক্তমাংসের শরীর নিয়ে।" ডিয়ার তাঁকে বুঝালেন—"কর্তাভজারা 'গসপেলে'ই তাদের সব প্রশ্নের উত্তর পাবে।" গুরু চীৎকার করে বলে উঠলেন—"পেয়ে গেছি। আমরা এত দিন ধরে যা সন্ধান করে বেড়াচ্ছিলাম তা পেয়েছি!" ডিয়ার বিশপকে জানালেন হুগলি থেকে জলঙ্গীর আশি মাইল এলাকার লোকেরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে—"nothing else is talked about."[২৭]

১৮৪১ সালের মার্চ মাসে বিশপ তৃতীয়বার নদীয়ায় এসেছিলেন এবং ২৮শে মার্চ কৃষ্ণনগরে সেণ্ট জনস গির্জার ভিত্তি স্থাপন করে যান।[২৮] এই সময় নদীয়ার মিশনরী এলাকা পাঁচভাগে ভাগ করা হয়—প্রত্যেক বিভাগেই একটা করে গির্জা ও বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

বিশপ উইলসনের লেখা পড়লে মনে হবে, সারা নদীয়া জেলার অধিবাসীই বুঝি শেষ পর্যন্ত খৃষ্টান হয়ে গেল। কিন্তু সত্যিকারের অবস্থা অন্যরূপ। প্রথম জীবনে একজন খাঁটি "ইভ্যানজেলিষ্ট" হয়েও বিশপ উইলসন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দুর্ভিক্ষের সুযোগে খৃষ্টের আলো ছড়াতে চেয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, আংলো-স্যাক্সনদের পূর্বপুরুষ ডুইড্‌রা যেমন রোম্যানদের চেষ্টায় প্রথমে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে, পরে তাদের চারিত্রিক ও মানসিক উন্নতি করে—ভারতেও তাই ঘটবে। তিনি কিছুটা সফলকামও হয়েছিলেন; তবে যা আশা করেছিলেন, তার কিছুই হয়নি। কুঁড়ি আর ফলের মধ্যে কোন সমতা ছিল না। বিশপের 'ফ্লক'রা তাঁর চেয়েও বেশি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন ছিল। তারা সৈন্যদের উন্নতি ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির লোভে খৃষ্টান হতে গিয়েছিল। অর্থসাহায্য করে আসতে থাকলে স্বধর্ম ত্যাগের হিড়িকও চলে যায়।

এই প্রসঙ্গে ধর্মত্যাগীদের প্রতি স্থানীয় অধিবাসীদের বিরোধিতা ও অত্যাচারও স্মরণে রাখতে হবে। আমরা প্রথমেই দেখেছি পাঁচজন নব-খৃষ্টানের প্রতি কৃষ্ণনগরের নাগরিকদের ব্যবহার। বিশপ উইলসন এইরূপ অত্যাচারের কথা বারবার উল্লেখ করেছেন। খৃষ্টানরা গ্রামের কুয়ো থেকে জল নিতে পারত না। তাদের কোন কাজ দেওয়া হত না।[২৯] এক তালুকদার তার লোকজন নিয়ে একজন 'অনুসন্ধিৎসু'কে হত্যা করে। আদালতে মামলা উঠলে খৃষ্টানদের উপর সব দোষ চাপানো হল; খৃষ্টান আর মিশনরীরা ভয় পেয়ে নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল। উইলসন লিখেছেন, তাঁর দেশবাসীর হয়ত কোন ধারণাই নেই কিভাবে একজন "savage land-holder" তার দলবল পাঠিয়ে খৃষ্টানদের মাঠ-ভরা পাকা ফসল কেটে নিয়ে আসে, গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়, তাদের ভিটে-ছাড়া করে।

ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাঁর এদেশীয় কর্মচারীদের তদন্তে পাঠান। কর্মচারী তার ডান হাত বাদীদের পক্ষে আর বাঁ হাত বিবাদীদের পক্ষে প্রসারিত করে। ঘুষের পরিমাণ অনুসারে রিপোর্ট তৈরি হয়। চার আনা পয়সা দিলে ভুরি ভুরি সাক্ষী মেলে।..."no police except what aggravates the misery of the oppressed." বিশপ বারবার জেলার ইংরেজ কর্মচারী ও নীল-করদের খৃষ্টান প্রজাদের রক্ষার জন্য আবেদন করে আসেন। মিশনরীরা খৃষ্টানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকলে অবস্থার উন্নতি হয়।[৩০]

১৮৫০ সালে নদীয়ার এদেশীয় খৃষ্টানদের মোট সংখ্যা ছিল ৪৪১৭ জন।[৩১] খৃষ্টানরা সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও অনুরক্ত প্রজা এবং ভারতে ইংরেজ শাসনের মুখর সমর্থক ছিল। ১৮৪৫ সালে উত্তরাধিকার বিল নিয়ে কলকাতার হিন্দুরা হৈচৈ আরম্ভ করলে খৃষ্টানরা "quiet agricultural population" হিসাবে কলকাতার কিছু সংখ্যক ধনীর কার্যকলাপের বিরোধিতা করে এবং সরকারের সমর্থন করে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে আবেদন পাঠায়।[৩২] আবার ১৮৫৭ সালে উত্তর প্রদেশ থেকে খৃষ্টানরা যখন স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সিপাইদের ভয়ে পালিয়ে আসছিল, তখন নদীয়া ও বর্ধমানের খৃষ্টানরা তাদের আশ্রয় দেয়। এই সময় নদীয়ার সব খৃষ্টানরা সই করে গভর্ণর-জেনারেলের কাছে এক আবেদনে জানায়, তারা সরকারের বিপদের কথা শুনেছে। প্রয়োজন হলে নদীয়ার খৃষ্টানরা সব শক্তি নিয়ে সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। তারা বিনা পারিশ্রমিকে গোরুর গাড়ি নিয়ে সাহায্য করতে পারে ও কায়িক শ্রম দিতে প্রস্তুত। তারা অবশ্য সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, সম্ভবতঃ কোম্পানির রাজ্যে ইদানীং রায়তদের প্রতি কিছু অবিচার করা হচ্ছিল যার জন্য ভগবান এই বিপদ পাঠিয়েছেন।[৩৩] (মনে হয়, শেষের কথা-গুলোয় নদীয়ায় নীল-রায়তদের উপর অত্যাচারের প্রতি প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে।)

বিশপ উইলসন ও তাঁর মত ধর্মপ্রচারকদের ভারতীয় ধর্মসমূহের প্রতি শ্লেষ ও তীক্ষ্ণ আক্রমণ ভারতীয়দের মনে খৃষ্টানদের সম্পর্কে ভীতির সঞ্চার করেছিল যা শেষ পর্যন্ত সিপাই-বিদ্রোহে ইন্ধন যোগায়। মিশনরীরা অবশ্য ঝড়ের পূর্বাভাস পেয়েছিলেন; তাই ১৮৫৫ সালে তাঁদের এক সভায় স্থির হয়, এখন থেকে আর তাঁরা হিন্দুধর্মকে সরাসরি আক্রমণ করবেন না, বরং কৌশল পরিবর্তন করে হিন্দুদের কিছু কিছু আচারের প্রশংসা করবেন।[৩৪] যে উইলসন তাঁর ছেলেদের "flashy and showy piety" থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিতেন, তিনিই শেষে চার্চের বাহ্যিক আড়ম্বর ও সৌকর্যে অখৃষ্টানদের মন ভুলিয়ে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট

করতে চেষ্টা করতে লাগলেন। ভারতে ইংরেজদের প্রতি বিদ্বেষ ও বিদ্রোহের বহ্নি তখনও সম্পূর্ণ নির্বাপিত. ১৮৫৮ সালের ২রা জানুয়ারি বিশপ উইলসন 'হিদেন'দের মধ্যে 'গসপেল'-এর আলো ছড়াতে পারলেন না বলে বিলাপ করতে করতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মরদেহ তাঁরই অমর কীর্তি কলকাতার সেণ্ট পলস্ ক্যাথেড্রালের নিচে শায়িত করা হল।

মিশনরী হিসাবে বিশপ উইলসনের কাজের পূর্ণ ঐতিহাসিক মূল্যায়ণের প্রয়োজন আছে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারত-ইতিহাসের জ্ঞানবৃদ্ধিতে তাঁর অবদান স্বীকার্য।

পাদটীকা

১। Rev. Josiah Bateman, The Life of the Rt. Rev. Daniel Wilson, (London, 1860). দুই খণ্ড থেকে উইলসনের জীবনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে দেওয়া হয়েছে।

২। Bishop Wilson's Journal Letters, ed. by his son Daniel Wilson (London, 1863).

৩। George D. Bearce, 'British Attitudes towards India 1784-1858', Edinburg Review (Dec. 1828) গ্রন্থে উদ্ধৃতি, পৃ. ৮৫।

৪। Bishop Wilson's Journal Letters, পৃ. ২৫১-২৫৪।

৫। ঐ, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

৬। ঐ, পৃ. ১২৭।

৭। ঐ, পৃ. ১৫৯।

৮। ঐ, পৃ. ৩০০-৩০২।

৯। ঐ, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

১০। ঐ, পৃ. ২৮৯।

১১। ঐ, পৃ. ১৮৪।

১২। ঐ, পৃ. ৬৮-৬৯।

১৩। Narrative of a Journey Through the Upper Provinces of India, 1824-25, ed. by Mrs. Haber, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪০।

১৪। Bishop Wilson's Journal Letters, পৃ. ১৩৯।

১৫। ঐ, পৃ. ১১৫।

১৬। M. A. Sherring, Protestant Missions in India, পৃ. ৮৯।
১৭। Wilson's Journal Letters, পৃ. ২৩৪।
১৮। Mrs. Weitbrecht, Missionary Sketches in North India, (London, 1858), পৃ. ১৫১।
১৯। J. J. Weitbrecht, Protestant Missions in Bengal, (London, 1844), পৃ. ৩২২-৩২৪।
২০। Bishop Wilson's Journal Letters, পৃ. ৩৬৩।
২১। Rural Life in Bengal, পৃ. ১৮০।
২২। Bishop Wilson's Journal Letters, পৃ. ২৯৪-২৯৫।
২৩। ঐ, পৃ. ২৯৯।
২৪। ঐ, পৃ. ৩০৯।
২৫। ঐ, পৃ. ৩১১।
২৬। ঐ, পৃ. ৩১২-৩১৯।
২৭। ঐ, পৃ. ৩১৭-৩১৮।
২৮। ঐ, পৃ. ৩১৮। বিশপ প্রথম নদীয়ায় ১৮৩৭ সালের জুলাই মাসে।
২৯। ঐ, পৃ. ৩০০।
৩০। ঐ, পৃ. ৩১৮-৩১৯।
৩১। Sherring, Protestant Missions in India, পৃ. ১৩০।
৩২। John William Kaye, Christianity in India, (London, 1859), পৃ. ৪৩৩।
৩৩। Mrs. Weitbrecht, Missionary Sketches in North India, পৃ. ১৮৪।
৩৪। Historians of India, Pakistan and Ceylon, ed. by C. H. Philips, পৃ. ৩৪৯।
৩৫। Bishop Wilson's Journal Letters, পৃ. ৩৩৪।

(বিশপস্ কলেজের গ্রন্থাগারে পাঠের সুযোগ দেওয়ার জন্য লেখক কলকাতার বিশপ রা. রেভা. যোশেফ অমৃতানন্দের কাছে কৃতজ্ঞ।)

কেশব-সহচারী ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল

সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় ও দেবজ্যোতি দাশ

[পূর্বানুবৃত্তি]

ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্যচর্চা কেবল ব্রহ্মসঙ্গীত ও কীর্তন রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম, ব্রাহ্মধর্ম ইত্যাদি নানা বিষয়ের চর্চা ও আলোচনা এবং ইতিহাস, নাটক ইত্যাদি রচনাতেও তাঁর বিলক্ষণ উদ্যোগ ও আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। ১৭৫১ থেকে ১৭৯২ শকাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস তিনি সংকলন করেন ; ১৭৯৩ শকাব্দে তাঁর রচিত 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত' প্রকাশিত হয়। এর পরেই তরুণ শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নীতিশিক্ষার উদ্দেশ্যে এডওয়ার্ড ক্রুডের অনুসরণে তিনি 'জগতের বালা ইতিহাস' (১৭৯৭ শকাব্দ) গ্রন্থটি রচনা করেন ; এতে মানবজাতির পার্থিব ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বিবরণ বিধৃত হয়েছিল। চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে তিনি 'ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা' (১৮০০ শকাব্দ) গ্রন্থে চৈতন্যকথা আলোচনা করেন। এরপর ক্রমে ক্রমে 'বিধানভারত' (১৮০২ শকাব্দ) নামে ধর্মমূলক কাব্যগ্রন্থ, 'বনমালা' (১৮০৩ শকাব্দ) নামে একটি কবিতা-সংকলন এবং 'সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত' (১৮০৩ শকাব্দ) পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। 'বিধানভারত' প্রকাশের পর ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পাথুরিয়াঘাটা রাজবাড়িতে ত্রৈলোক্যনাথকে সম্বর্ধনা জানানো হয় ; ত্রৈলোক্যনাথ এই সভায় গান গেয়েছিলেন।[৩৭] ১৮০৪ শকাব্দে প্রকাশিত হয় ত্রৈলোক্যনাথের রচিত ৬ অঙ্কের নাটক 'নববৃন্দাবন', যার উদ্দেশ্য ছিল কেশব-প্রবর্তিত 'নববিধানে'র মহিমা প্রচার, সকল ধর্মের সারকথার ঐক্যমত প্রদর্শন, সর্বধর্মসমন্বয়ের আদর্শের প্রতিষ্ঠা এবং মানুষের নৈতিক জীবনের উন্নয়ন। কেশবচন্দ্র ও কেশবানুগামীরা 'নববৃন্দাবন' নাটক পড়ে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ৯ সেপ্টেম্বর কেশব-ভবন 'কমল-কুটিরে'র প্রাঙ্গণে 'নববৃন্দাবন' নাটকের প্রথম প্রকাশ্য অভিনয়ে কেশবচন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ ও প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ত্রয়ী ঋষিকের বেশে সুমধুর সঙ্গীতে সকলকে আহ্বান জানান।[৩৮] কমলকুটিরে ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে এই নাটকের দ্বিতীয়

প্রকাশ্য অভিনয় দেখতে এসেছিলেন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহেন্দ্রলাল সরকার, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ ব্যক্তিরা ;[৩৯] ঐ বছরেই ডিসেম্বর মাসে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আমন্ত্রণে পাথুরিয়াঘাটা রাজ-বাড়িতেও নাটকটি অভিনীত হয়।[৪০]

'নববৃন্দাবন' নাটকের অভিনয়ে কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ স্বয়ং, মহেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখেরা যোগ দিতে থাকেন।[৪১] পাহাড়ী বাবার ভূমিকায় কেশবচন্দ্র, পাদরির ভূমিকায় প্রতাপচন্দ্র, মৌলবির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র সেন, বৈদিক ব্রাহ্মণের রূপসজ্জায় গৌরগোবিন্দ এবং একঘরের অভিনয়ে বিবেকের ভূমিকায় নরেন্দ্রনাথ দত্তের (ভবিষ্যতের স্বামী বিবেকানন্দ) অভিনয়ের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি তারিখে কমলকুটিরে 'নববৃন্দাবনে'র অভিনয় দেখে সন্তোষ লাভ করেন।[৪২] সে বছর ১২ মার্চ, ১৭ মার্চ ও ২২ মার্চ যথাক্রমে রাধাকান্ত দেবের বাড়িতে, খেলাতচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে এবং গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের প্যাভিলিয়নে নাটকটি কেশবানুগামীদের দ্বারা অভিনীত হয়।[৪৩] এসব থেকে বোঝা যায় যে, ত্রৈলোক্যনাথের 'নববৃন্দাবন' নাটকটি তৎকালীন বঙ্গসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

ইতিমধ্যে কেশবচন্দ্রের মধুমেহ রোগ গুরুতর আকার ধারণ করে। ক্রমে তাঁর অবস্থার অবনতি হতে থাকে। সে সময়ে তাঁর রোগশয্যার পাশে ত্রৈলোক্যনাথ নিত্যসঙ্গী ছিলেন। মৃত্যুর দিন-দুই আগে কেশবচন্দ্র ত্রৈলোক্যনাথের গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন "ভাই ত্রৈলোক্য, আবার কবে তোমার মধুর সুমিষ্ট স্বরের গান শুনব ?"[৪৪] ১৮০৫ শকাব্দের মাঘোৎসবের অব্যবহিত আগে কেশবচন্দ্র পরলোক-গমন করেন। মাঘোৎসবের পরেই খাঁটুরা ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে সেখানে ত্রৈলোক্যনাথ কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে বড় মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন।[৪৫]

এর পরেই উপাসনার সময়ে ব্রহ্মমন্দিরের বেদীতে উপবেশনের প্রশ্নে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সঙ্গে শ্রীধরবাবুর অন্য অনেক সদস্যের মতভেদ হয় ; পরিণামে প্রতাপ-চন্দ্র, ত্রৈলোক্যনাথ, অমৃতলাল বসু ও কেদারনাথ দে শ্রীধরবাবুর অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন এবং শ্রীধরবাবু ত্রৈলোক্যনাথকে উপাচার্যের জন্য রক্ষিত স্বতন্ত্র বেদীতে বসে উপাসনা করতে অনুরোধ জানালে তিনি সে অনুরোধ রক্ষায় অসম্মত হন।[৪৬] বস্তুত এই সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ প্রত্যক্ষভাবে কোনও পক্ষাবলম্বন না করলেও পরোক্ষে প্রতাপচন্দ্রের মতেরই যেন আনুকূল্য করেন। অবশ্য সাধারণভাবে ব্রহ্ম-

মন্দিরের উপাসনা থেকে এসময়ে দূরে থাকলেও ১৮০১ শকাব্দের ৯ ভাদ্র ভাদ্রোৎসবের শেষদিনে তিনি অল্পক্ষণের জন্য ব্রহ্মমন্দিরের অনুষ্ঠানে আসেন,[৩৭] মাঘোৎসবের সময়ে ১৪ মাঘ তারিখে অল্পক্ষণের জন্য নগরসঙ্কীর্তনেও যোগ দেন।[৩৮] 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকার সম্পাদককে লিখিত দুটি পত্রে ত্রৈলোক্যনাথ নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপরি-উক্ত গৃহবিচ্ছেদ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করেন ; পত্র দুটি এবং পত্রের প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সম্পাদকের উত্তর 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।[৩৯]

১৮০৭ শকাব্দের মাঘোৎসবের সময়ে উভয় পক্ষে আপোষের পর ১২ মাঘ ব্রহ্মমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনার একাংশ গৌরগোবিন্দ এবং অপরাংশ ত্রৈলোক্যনাথ কর্তৃক সম্পন্ন হয়।[৪০] পরের বছর ১ বৈশাখ সকালে ব্রহ্মমন্দিরে নববর্ষ উপলক্ষে ত্রৈলোক্যনাথ উপাসনা করেন, এসময়ে প্রতি সপ্তাহেই তিনি ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্যের কাজ করতে থাকেন, সাময়িকভাবে শ্রীরবিবারের সম্পাদকের দায়িত্বও তাঁর উপরেই ন্যস্ত হয়।[৪১]

ইতিমধ্যে ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথের 'কলিসংহার নাটক' প্রকাশিত হয়েছে। ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দের ৩ এপ্রিল অ্যালবার্ট হলে ঐ নাটক প্রথম অভিনীত হয়। পরবর্তী ৭ এপ্রিল সেখানে 'নববৃন্দাবন'ও মঞ্চস্থ হয়েছিল।[৪২] কুচবিহারের মহারাজার নূতন প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কুচবিহারে ১৮০৮ শকাব্দের ৩ বৈশাখ 'কলিসংহার নাটক' এবং ৭ ও ৮ বৈশাখ 'নববৃন্দাবন' অভিনীত হয় ; মহারাজা ও শত শত দর্শক নাটক দেখে সাধুবাদ করেন।[৪৩] ত্রৈলোক্যনাথ, গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখেরাও আমন্ত্রিত হয়ে এই উৎসবে সক্রিয়ভাবে যোগ দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, কয়েক মাস পরেই ২৩ আশ্বিন তারিখে রংপুরের কাকিনায় ব্রাহ্মসমাজের শারদীয় উৎসব উপলক্ষে ত্রৈলোক্যের উপস্থিতিতে আবার 'কলিসংহার' নাটকের অভিনয় হয়।[৪৪] অ্যালবার্ট হলে সেবছর ত্রৈলোক্যনাথের 'যুগলমিলন' (১২৯৩ বঙ্গাব্দ) অভিনীত হয়েছিল।

১৮০৮ শকাব্দের ১ ভাদ্র রামকৃষ্ণদেব পরলোকগমন করেন। তাঁর শোকযাত্রায় ত্রৈলোক্যনাথ যোগ দিয়েছিলেন এবং শ্মশানে তাঁর শেষশয্যার পাশে কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। ৪ ভাদ্র ব্রহ্মমন্দিরে ত্রৈলোক্যনাথ রামকৃষ্ণদেব সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ৯ ভাদ্র বিকালে কাঁকুড়গাছিতে রামচন্দ্র দত্তের উদ্যানে রক্ষিত রামকৃষ্ণদেবের চিতাভস্মের পাশে ত্রৈলোক্যনাথ কয়েকটি মাতৃবিষয়ক গান করেন।[৪৫]

সেবছর মাঘোৎসবের সময়ে ত্রৈলোক্যনাথ নগরসঙ্কীর্তন পরিচালনা করেন, ব্রহ্মমন্দিরে উপাসনা করেন, তাছাড়া ১৩ মাঘ তারিখে ব্রাহ্মদের সাধারণ সভায়

সভাপতির আসনও গ্রহণ করেন ; ঐ সভায় নববিধান সমাজের সংগঠনবিষয়ক যে কমিটি হয়, তাতে ত্রৈলোক্যনাথ অন্যতম সদস্য মনোনীত হন।[৫৬]

কেশবচন্দ্রের মত অনুসরণ করে ত্রৈলোক্যনাথও ব্রিটিশ রাজশক্তিতে আস্থাবান ছিলেন। তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মদের সাধারণ সভায় রানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবের দিনে সকল নববিধান সমাজে উপাসনার এবং রানীকে অভিনন্দনপত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত হয় (১৩ মাঘ ১৮০৮)।[৫৭] উৎসবের দিন (৫ ফাল্গুন ১৮০৮) ত্রৈলোক্যনাথ গাজিপুরে ছিলেন এবং সেখানে তিনি স্বয়ং ভিক্টোরিয়া-জয়ন্তী উৎসব পরিচালনা করেন।[৫৮]

সংস্কারমুক্ত মানবহিতৈষী হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে ত্রৈলোক্যনাথ অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। পর পর দুবছর মাঘোৎসবের আগে তিনি বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন (২৭ পৌষ ১৮০৯, ২৮ পৌষ ১৮১০) এবং বিদ্যাসাগরের সঙ্গে নানা প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা করেন।[৫৯]

১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে ত্রৈলোক্যনাথ বাঁকিপুর, মোকামা, ভাগলপুর, আরা, কৈলোয়ার, গাজিপুর, মুঘলসরাই, বারাণসী, মঙ্গলগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নববিধান প্রচারের কাজ করেন।[৬০] পরের বছর তিনি ভাগলপুর, মোকামা, গাজিপুর, আলিগড়, লাহোর, সিমলা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারের জন্য সফর করেন। গাজিপুরে প্রখ্যাত পবনাহারী বাবার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং পবনাহারী বাবার কুটিরে তিনি ও দীননাথ হিন্দী ভাষায় ব্রহ্মোপাসনা করেন ;[৬১] পবনাহারী বাবা সম্বন্ধে তাঁর একটি নিবন্ধও 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হয়।[৬২]

সেই বছর (১৮১০ শকাব্দ) গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথ কুচবিহারে নববিধান সমাজের মন্দির প্রতিষ্ঠার উৎসবে যোগ দেন। ৭ বৈশাখ সকালে কুচবিহারের মহারাজা কর্তৃক মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন ও মন্দিরপ্রবেশের পর ত্রৈলোক্যনাথ তাঁর নূতন একটি সঙ্গীত গেয়েছিলেন। এরপর মহারাজা ইংরেজীতে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাপত্র পড়বার পর তার বঙ্গানুবাদ ত্রৈলোক্যনাথ কর্তৃক পঠিত হয়। সন্ধ্যায় নগরসঙ্কীর্তনের পর সাগরদীঘির ঘাটে তিনি ভাষণ দেন।[৬৩]

১৮১১ শকাব্দের ভাদ্র মাসে ত্রৈলোক্যনাথের 'গরলে অমৃত' নামে উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এর পরেই গৌরগোবিন্দের সম্পাদিত 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকায় উপন্যাসটি কঠোর ও তীব্রভাবে সমালোচিত হয় ; পুস্তকটিতে "পরস্ত্রীর প্রতি প্রেম সম্বন্ধে" "কুভাব কুরুচি ও অবিশুদ্ধ মতের পরিচয়" দেওয়া হয়েছে, "ব্রাহ্মনামধারীর কথা ও কার্য্য দ্বারা গ্রন্থকর্ত্তা গ্রন্থের নায়ককে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিরক্ত" করে তুলেছেন,

তিনি "ব্রাহ্মসমাজের প্রতি লোকের বিরক্তি জন্মাইবার জন্য গ্রন্থ রচনা" করেছেন, "নিরাকারোপাসনা ভাণমাত্র কপটতা" বলে তাঁর রচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে—এজাতীয় কঠিন মন্তব্য 'ধর্ম্মতত্ত্বে' বারবার প্রকাশিত হয়।[১৪] ঢাকার 'বন্ধবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদক কিন্তু এই উপন্যাসটি সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করেছিলেন। ১৮১০ শকাব্দের মাঘোৎসবের সময় থেকেই ব্রহ্মমন্দিরের বেদী থেকে উপাসনার বিষয়ে মতভেদ থাকায় ত্রৈলোক্যনাথ মন্দিরের উপাসনায় অনেক সময়েই অনুপস্থিত থাকতেন।[১৫] এবার তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পেল।

ব্রহ্মমন্দিরে বেদীর ব্যবস্থা এবং প্রেরিত প্রচারকদের সভা শ্রীদরবারের কাজকর্ম নিয়ে মতভেদ চরমে ওঠায় এসময়ে প্রেরিত প্রচারকেরা দুই দলে ভাগ হয়ে যান। শ্রীদরবারের সম্পাদক গৌরগোবিন্দ দুই দলে বোঝাপড়া ও শান্তি স্থাপনের জন্য শ্রীদরবারের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করলে ত্রৈলোক্যনাথ গোড়াতেই জানিয়ে দেন যে, গৌরগোবিন্দ ও কয়েকজনের আচরণের প্রতিবাদেই তিনি বহুদিন থেকে শ্রীদরবারের অধিবেশন বর্জন করেছেন। শান্তিস্থাপনের জন্য গৌরগোবিন্দের সাময়িকভাবে কর্মভার ত্যাগ করা প্রয়োজন বলেও তিনি মতপ্রকাশ করেন।[১৬] অচিরে ত্রৈলোক্যনাথ, উমানাথ গুপ্ত, রামচন্দ্র সিংহ, কৃষ্ণবিহারী সেন প্রমুখের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উৎসাহে 'পুনর্জীবিত শ্রীদরবার' নামে প্রতিদ্বন্দ্বী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং উমানাথ গুপ্তের উদ্যোগে দ্বিতীয় একটি 'ধর্ম্মতত্ত্ব' পত্রিকারও একটি সংখ্যা ১৮১১ শকাব্দের ১৬ অগ্রহায়ণ প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মমন্দির উমানাথ গুপ্ত ও তাঁর সমর্থকদের অধিকারে ছিল ; ত্রৈলোক্যনাথ এখানে কোনও কোনও দিন উপাসনা করেছিলেন।[১৭]

বছর তিনেক এই দুঃসহ অবস্থা চলে। অবশ্য এসময়েও ১৮১২ শকাব্দে উভয়পক্ষের মিলিত মাঘোৎসবে, ১৮১৩ শকাব্দে ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিত ভাদ্রোৎসবে এবং ১৮১৩ শকাব্দে ২০নং বিডন স্ট্রীটে গৌরগোবিন্দ ও তাঁর সমর্থকদের আয়োজিত মাঘোৎসবে ত্রৈলোক্যনাথ যোগ দিয়ে সঙ্গীত, উপাসনাদিতে অংশগ্রহণ করেন, চন্দননগর, খাঁটুরা প্রভৃতি স্থানের ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে গৌরগোবিন্দের সঙ্গে যোগ দেন এবং মাঝে মাঝে সাময়িক মিটমাটের পর গৌরগোবিন্দও ব্রহ্মমন্দিরে উপাচার্যের কাজ করেন।[১৮] কিন্তু উভয়পক্ষে স্থায়ী মিলন সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৮১৪ শকাব্দের ৭ মাঘ অ্যালবার্ট হলে ব্রাহ্ম প্রচারকদের সভায় প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, উমানাথ গুপ্ত ও প্রসন্নকুমার সেনের হাতে ব্রহ্মমন্দিরের আধ্যাত্মিক ভার অর্পিত হয় এবং তাঁরা 'ট্রাস্ট ডিড' অনুসারে ঐ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ পান।[১৯] এরপর সে বছরের মাঘোৎ-

সব সম্মিলিতভাবে উদ্‌যাপিত হয়; ত্রৈলোক্যনাথ সঙ্গীত ও নগরসঙ্কীর্তন পরিচালনা করেন। ১৮১৫ শকাব্দের ৬ বৈশাখ উপাসকমণ্ডলীর সভায় ত্রৈলোক্যনাথ শ্রীদরবারের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষসভার অন্যতম সভ্য নির্বাচিত হন।[১০]

ইতিমধ্যে ১৮১৩ শকাব্দের চৈত্র মাসে ত্রৈলোক্যনাথ নববিধান সমাজের 'জয়গায়ক দল' (জালেলুয়া ব্যাণ্ড) প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর নেতৃত্বে জয়গায়ক দলের গায়কেরা নানাস্থানে ঈশ্বরের জয়গানের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন।[১১]

১৩০০ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস (১৮১৫ শকাব্দের পৌষ) থেকে ত্রৈলোক্যনাথের সম্পাদনায় 'নববিধান' নামে একটি ক্ষুদ্রকায় মাসিকপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে ত্রৈলোক্যনাথ এই পত্রিকাটির ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা থেকে ১৭শ বর্ষ ২য় সংখ্যা পর্যন্ত (১৩০০ পৌষ—১৩১৬ ফাল্গুন) সম্পাদনা করেছিলেন। পত্রিকাটিতে ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তন, ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কিত সংবাদ, ধর্মকথা, উপদেশ প্রভৃতি প্রকাশিত হত; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকের নামোল্লেখ থাকত না। পত্রিকাটি বিনামূল্যে বিতরিত হত।

১২৯৮ থেকে ১৩১৭ বঙ্গাব্দের (১৮১৩-২৮ শকাব্দ) মধ্যে ত্রৈলোক্যনাথ-রচিত 'বিংশ শতাব্দী' (১২৯৮) নামে "কাব্যকাহিনী", 'ইহকাল পরকাল' (১৩০১), 'নবশিক্ষা' (১৩০৭) নামে ছাত্রপাঠ্য পুস্তিকা, তিন খণ্ডে 'ব্রহ্মগীতা' (১৩০৮-৯) এবং 'পথের সম্বল' (১৩১৭) নামে কবিতা ও সঙ্গীত-সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এরপর তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আর কোনও নূতন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছিল 'নগর সঙ্কীর্ত্তন' (১৩২২) এবং 'চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী' (১৯৩৪ খ্রী) নামে তাঁর দুটি সঙ্গীত-সংকলন পুস্তক।

এই অবসরে ত্রৈলোক্যনাথের গ্রন্থগুলির একটি কালানুক্রমিক তালিকা ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল। অধিকাংশ গ্রন্থই 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল। সঙ্গীত, কবিতা, নাটক, চরিতকথা, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি গ্রন্থরচনা করেছিলেন।

১. **ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত**। প্রথম প্রকাশ ১৭৯৩ শকাব্দ। পৃ. ।০+৪০৫। বইটিতে ভূমিকা, অবতরণিকা এবং তিনটি পরিচ্ছেদ আছে: প্রথম পরিচ্ছেদে ৬টি অধ্যায়, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ৯টি অধ্যায় এবং তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৮টি অধ্যায় বর্তমান। আলোচ্য পুস্তকে ১৭৫১ শকাব্দ থেকে ১৭৯২ শকাব্দের ১০ মাঘ পর্যন্ত প্রায় ৪১ বছরে ব্রাহ্মসমাজের, বিশেষত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে।

২. **জগতের বাল্য ইতিহাস**। প্রথম প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৭৯৭ শকাব্দ।

পৃ. ৵০+[২]+১৩৪। মূলত এডওয়ার্ড ক্লডের Childhood of the World পুস্তিকা অবলম্বনে লিখিত এই স্কুলপাঠ্য বইটির ১ম ভাগে মানবজাতির বাল্যাবস্থা ও পার্থিব উন্নতির এবং ২য় ভাগে আত্মিক ও ধর্মীয় উন্নতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। বইটি অল্পবয়স্ক শিক্ষার্থীদের ধর্ম ও নীতিবিষয়ক শিক্ষার জন্য লিখিত ('ভূমিকা')।

১ম ভাগের সূচী : উপক্রমণিকা ; মনুষ্যের প্রথম অভাব ; মনুষ্যের প্রথম ব্যবহার্য্য যন্ত্র বা অস্ত্র ; অগ্নুৎপাদন ; রন্ধন এবং রন্ধনপাত্র ; বাসস্থান ; ধাতু ব্যবহার ; মানবসমাজের উন্নতির সময় ; মানবজাতির পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যের কাল ; ভাষা ; হস্তলিপি ; গণিতশিক্ষা ; মনুষ্যের দেশান্তর পরিভ্রমণ ; সমুদায় বিষয়ে মনুষ্যের উন্নতি ; মনুষ্যসমাজের ভগ্নাবস্থা।

২য় ভাগের সূচী : উপক্রমণিকা ; প্রথম প্রশ্ন ; কল্পিত উপন্যাস অপদেবতা ইত্যাদিতে বিশ্বাস ; মনুষ্যের আত্মজ্ঞান ঈশ্বর জ্ঞান ভূতোপাসনা প্রকৃতি পূজা ; বহু দেবোপাসনা ; পৌত্তলিক উপাসনা ; দুই ঈশ্বরের পূজা প্রার্থনা ; প্রায়শ্চিত্ত ও বলিদান ; একেশ্বরবাদ পরকালে বিশ্বাস ধর্মপুস্তক অথবা ঈশ্বর-বাণী ; ধর্মনীতি জীবনের লক্ষ্য ; উপসংহার।

পুস্তিকার বিষয়বস্তু প্রবন্ধাকারে' ধর্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হয়েছিল।

৩. **ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা**। গ্রন্থটি 'পূর্ব্ববিভাগ' ও উত্তরবিভাগ', এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পুস্তকটি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত।

'পূর্ব্ববিভাগে'র প্রথম প্রকাশ ১ মাঘ ১৮০০ শকাব্দ ; পৃ. [২]+৵০+[৩]+vi+১৪১। সচিত্র। কেশবচন্দ্র সেনকে উৎসর্গিত। সূচী : ভগবদ্বন্দনা [কবিতা] ; সাধুবন্দনা [কবিতা] ; নবদ্বীপের প্রাচীনাবস্থা বাল্যকাল ও পাঠ্যাবস্থা ; যৌবন ও অধ্যাপনের কাল যবন হরিদাস ; চৈতন্যের ধর্ম্মভাবপরিবর্ত্তন ; ভক্তির নবানুরাগ, অধ্যাপনা সমাপ্তি ; মত্ততা ও হরিসঙ্কীর্ত্তনারম্ভ বিরহজ্বালা ও নিত্যসঙ্কীর্ত্তন ; ভক্তসম্মিলন ; নিশীথকালে সঙ্কীর্ত্তন ; গৌরাঙ্গের দরবার ; জগাই মাধাই ; রসভঙ্গ এবং পরিতাপ ; সখীভাবে নৃত্যগীত ; গৌরের শান্তিপুর দর্শন ; পাপের শাসন হরিভক্তির জয় ও নগরসঙ্কীর্ত্তন ; চৈতন্যের অমায়িকতা ; সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ ; ভক্তদিগের পরীক্ষা ; শান্তিপুরে ভক্তের মেলা। 'অবতরণিকা'য় গ্রন্থকার 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' লিখেছেন, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতির বর্ণনার সাহায্যে আলোচ্য পুস্তকটি রচিত হয়েছে।

'উত্তরবিভাগে'র প্রথম প্রকাশ ২৩ চৈত্র ১৮০০ শকাব্দ ; পৃ. [২]+১১২+[১]+৪৯। সূচী : চৈতন্যের নীলাচল গমন ; সার্ব্বভৌমের ভক্তি গ্রহণ ; তীর্থভ্রমণ ও

রামানন্দের সহিত মিলন নীলাচলে প্রত্যাগমন ; বৃন্দাবন যাত্রা এবং গৌড়দর্শন ; নিত্যানন্দের ধর্ম্মপ্রচার ; নীলাদ্রি হইয়া চৈতন্যের বৃন্দাবন গমন ; রূপ সনাতনের বৈরাগ্য ; কাশীধামে দণ্ডীদিগের সঙ্গে বিচার ; নীলাচলে প্রভুর শেষাবস্থান ; মহাপ্রভুর লীলাসমাপ্তি উপসংহার। এছাড়া 'পরিশিষ্টে' "ভক্তির ঐ তিহাসিক তত্ত্ব" বিচার করা হয়েছে, শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথাও বর্ণিত হয়েছে।

গ্রন্থের বিষয়বস্তু 'চৈতন্যের জীবন ও ধর্ম্ম' নামে ধারাবাহিক প্রবন্ধাকারে 'ধর্ম্মতত্ত্বে' প্রকাশিত হয়েছিল।

৪. **বিধানভারত**। এই কাব্যগ্রন্থটি 'প্রথমোল্লাস' এবং 'দ্বিতীয়োল্লাস', এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রথমোল্লাসে'র প্রথম প্রকাশ ৭ ভাদ্র ১৮০২ শকাব্দ ; পৃ. [৪]+১৬২। সূচী মঙ্গলাচরণ ; পবিত্রাত্মা ও আদ্যাশক্তির বন্দনা ; গৃহস্থ যোগানন্দের আশ্রম ; যুগধর্ম্ম মহাপ্রলয় ; দেবগণ কর্ত্তৃক ভগবানের স্তব ; নববিধানের জন্ম ; স্বর্গপুরী ; ধরাতলে দেবসমাগম ; উৎসবমন্দির দেবসভায় ভগবানের উক্তি ; ভগবদ্বাক্যের ব্যাখ্যান ; নববিধানের রাজ্যাভিষেক নববিধানের দিগ্বিজয়যাত্রা, সাধুভোজন ; চিরঞ্জীবের সহিত পুরঞ্জনের ধর্ম্মালাপ ; দেবাসুরের সংগ্রাম ; জয়গীত।

'দ্বিতীয়োল্লাসে'র প্রথম প্রকাশ ২০ আষাঢ় ১৮০৩ শকাব্দ। পৃ. [২]+১৬৬। সূচী : ইষ্টপূজা ; পুরঞ্জনের আত্মবিলাপ ; আত্মারামচরিত, চিরঞ্জীবের নগরপ্রবেশ ; সৃষ্টিলীলা ; ভাগবততত্ত্ব ; বিধানপ্রসঙ্গ ; পাষণ্ডদলন ; হিমালয়ে যোগশিক্ষা ; মহা-যোগসমন্বয় ; শাক্যসিংহ দেবর্ষি মুখা শিশুচরিত।

৫. **বনমালা**। প্রথম প্রকাশ ১৮৮১ খ্রী। পৃ. ৵০+৫৬। পুস্তিকাটিতে ২৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সূচী : স্তব ; আশাসন্দীপন ; প্রভাতি প্রার্থনা ; জীবনতরী ; ভ্রান্তিবিলাস ; মৃত্যু ; রোগশয্যা ; নিত্যশান্তি ; আহারকালীন ; জীবনবীণা ; কথোপকথন ; আত্মানুসন্ধান ; বৈরাগ্যী বিহঙ্গ ; দর্শনোচ্ছ্বাস ; চরম সম্বল ; প্রেমবিরহ ; ভগ্নহৃদয়ের সান্ত্বনা ; ঈশ্বর একমাত্র বন্ধু ; কৃতজ্ঞতা ; বিপন্নের আত্মবিসর্জ্জন ; চতুর ঈশ্বর ; শরীর আত্মার বিবাদ ; স্বভাবসঙ্গ ; চির-রুগ্ণ আত্মার প্রতি ; ব্রহ্মময় জগৎ ; প্রার্থনার উত্তর।

৬. **সাধু অঘোরনাথের জীবনচরিত**। প্রথম প্রকাশ ১০ মাঘ ১৮০৩ শকাব্দ। পৃ. ১১৮। সচিত্র। বিষয়বস্তু অঘোরনাথ গুপ্তের জীবনকথা। ৩য় সংস্করণে অঘোর-নাথের পরলোকগমনের পর ব্রহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র কর্ত্তৃক প্রদত্ত দুটি উপদেশও স্থান পেয়েছিল।

৭. **নবরুন্দাবন অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয় নাটক**। প্রথম প্রকাশ ১৮০৪ শকাব্দ। পৃ. ১৩৫। নববিধান ও সর্বধর্মসমন্বয় সম্বন্ধে ৬ অঙ্কের নাটক।

"যত শাস্ত্র যত ধর্ম্ম, যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম,
সকলেরই এক মর্ম্ম একেতে হইল লয়।" (পৃ. ১৩৫)

৮. **ঈশাচরিতামৃত**। যিশু খ্রীস্টের জীবনচরিত-বিষয়ক এই গ্রন্থটি 'পূর্ব্ববিভাগ' ও 'উত্তরবিভাগ', এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। পুস্তকটি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত হয়েছিল।

'পূর্ব্ববিভাগে'র প্রথম প্রকাশ ৭ মাঘ ১৮০৪ শকাব্দ। পৃ. [২] + ।/০ + [৩] + ১২৩। সূচী: ঐতিহাসিক সমালোচনা; য়িহুদী জাতি; জন্মবিবরণ বাল্যকাল; কৈশোর ও শুপ্তযৌবন; সাময়িক ধর্ম্ম ও জ্ঞানের প্রভাব; জলসংস্কার বনপ্রস্থান ও প্রলোভনজয়; প্রচার আরম্ভ; লোকসমারোহ ও আশ্চর্য্যক্রিয়া, পর্ব্বতোপরি উপদেশ; প্রথম প্রতিঘাত; শিষ্যনির্ব্বাচন; প্রচারকার্য্যের বিস্তৃতি দৃষ্টান্তের আকারে উপদেশ; গালিল্ দেশের শেষ ক্রিয়া; স্বদেশপরিত্যাগ। এছাড়া 'গ্রন্থোৎসর্গ' এবং 'ভূমিকা' বইটিতে স্থান পেয়েছিল।

'উত্তর বিভাগে'র প্রথম প্রকাশ ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৮০৫ শকাব্দ। পৃ. [২] + ১২১। সূচী: জেরুশালমে যাত্রা শিষ্যদিগকে চৈতন্যদান; প্রার্থনা শিক্ষা স্বর্গরাজ্যের ঔদার্য্য দুঃখীর প্রতি ঈশ্বরের দয়া জেরুশালমে প্রবেশ মার্থা ও মেরী শত্রুতা ও বিশ্বাসঘোষণা; জেরুশালমে প্রকাশ্য উপদেশ; বিপক্ষের সহিত বাগ্বিতণ্ডা; কপটীদিগকে তিরস্কার ভাবীবিপদ এবং আশাবাক্য; ত্রৈলোক্যবিজয় ও জুডার চিত্তবিকার; শেষভোজন; বিদায় গ্রহণ; গেথ্ শিমেনির উদ্যান বিচার ও দণ্ডাজ্ঞা; মশান প্রবেশ; স্বর্গারোহণ।

৯. **বাল্যসখা**। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত এই কবিতাসংকলন গ্রন্থটির ১ম ভাগ ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে এবং ২য় ভাগ ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম ভাগের (১১শ সংস্করণ) সূচী: বিদ্যাদেবীর বন্দনা; প্রভাত; প্রজাপতি; পড়া ও খেলা; মাতৃকোলে শিশু; দয়ালু সুরেশ; ফুলবাগান; পেটুক গণেশ; জননী; পক্ষিপ্রিয় শিশু; বর্ষারম্ভ; শৈশবকাল; মাতাল; ফুলের আদর; ফণীমণি; পুণিমার চাঁদ; সকলেই প্রেমের পাত্র; মাঠ; চঞ্চল শিশু; পল্লিগ্রামের ছেলে; নিদ্রালু ননীগোপাল; ভূতের গল্প; আদুরে গোপাল; আকাশ; সুশীল বালক; ছেলেখেলা; নীতি কথা; হিঁয়ালী প্রার্থনা।

১০. **কলিসংহার নাটক**। প্রথম প্রকাশ ১৮৮৪ খ্রী। পৃ. [২]+৮৭। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত এই নাটকটিতে ৪টি অঙ্ক বর্তমান।

১১. **গীতরত্নাবলী**। ব্রহ্মসঙ্গীত ও সঙ্কীর্তনের সংকলন। গ্রন্থটি ৪ খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ১ম খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১০ মাঘ ১৮০১ শকাব্দ. : পৃ. ২৮০ + ৪২০। ২য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১০ মাঘ ১৮০৮ শকাব্দ. পৃ. ১৮/০ + [১] + ৪২১-৬৯৪। ৩য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৮১৪ শকাব্দ, পৃ. ৷০ + ১১৬। ৪র্থ খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ২ আষাঢ় ১৩০৭, পৃ. ৷৶০ + ১৪৮।

প্রথম সংস্করণে ১ম খণ্ডে ৬০৩টি, ২য় খণ্ডে ৩৮২টি, ৩য় খণ্ডে ১৫১টি এবং ৪র্থ. খণ্ডে ১০৪টি সঙ্গীত সংকলিত হয়েছিল। গ্রন্থটি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে লিখিত।

১২. **কেশবচরিত**। প্রথম প্রকাশ ১০ মাঘ ১৮০৬ শকাব্দ, পৃ ।০ + [২] + ২৪৭। সচিত্র এবং কেশবচন্দ্র সেনের হস্তাক্ষর সংবলিত। গ্রন্থে বিষয়বস্তু কেশবচন্দ্রের জীবনকথা। সূচী: বাল্যকাল ; কৈশোর এবং বিদ্যাবিলাস ; যৌবনলীলা ; ধর্ম্মপ্রবেশ ; ধর্ম্মজীবন আরম্ভ ; প্রথম পরীক্ষা ; ব্রাহ্মসমাজে যোগদান ; দ্বিতীয় পরীক্ষা ; খ্রীষ্টীয়ানদিগের সহিত সংগ্রাম সঙ্গত সভা ব্রাহ্মসমাজে আধিপত্য ; ব্রহ্মরাজ্য সংস্থাপন ; ধর্ম্মপ্রচার এবং রাজ্যবিস্তার , ভক্তিবিকাশ তৃতীয় পরীক্ষা ; জয়লাভ , ইংলণ্ডভ্রমণ ; নূতন সদনুষ্ঠান , ধর্ম্মপরিবার গঠন ; সাধন এবং শিক্ষাদান ; শেষপরীক্ষা ; নবোদ্যম এবং নবজীবন ; নববিধান ; রোগশয্যা , চরমকাল ; মহাসমাধি। গ্রন্থটি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত।

১৩ **মুগলমিলন**। প্রথম প্রকাশ ১২৯৩ বঙ্গাব্দ। পৃ. [২] + ৭৫। ৪ অঙ্কের এই নাটকটি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়েছিল।

১৪. **যৌবনসখা**। প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৮০৯ শকাব্দ। পৃ ৶০ + ১১৫। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত আলোচ্য পুস্তকে ৪১টি কবিতা সংকলিত হয়েছিল। সূচী: বাগ্দেবী আরাধনা ; স্তব ; আশাসন্দীপন ; প্রাতাতিক প্রার্থনা ; জীবনতরী , ভ্রান্তি-বিলাস ; মৃত্যু ; রোগশয্যা ' নিত্য শান্তি ; আহার কালীন ; জীবনবীণা ; আপত্তি-খণ্ডন ; আত্মানুসন্ধান ; হিমালয় ; ভবসঙ্গীত ; অমরাপুরী ; ক্রুশবিদ্ধ যীশু ; গৃহস্থ বৈরাগী ; চরম সম্বল ; ভগ্ন হৃদয়ের সান্ত্বনা ; কৃতজ্ঞতা ; ঈশ্বর একমাত্র বন্ধু ; বিপদের আত্মবিসর্জ্জন ; চতুর ঈশ্বর ; শরীর আত্মার বিবাদ ; স্বভাবসঙ্গ ; বিস্ময় ; বন্ধু অন্বেষণ ; প্রকৃতির পরিচর্য্যা ; প্রীতিঃ পরমসাধনম্ ; সারসিদ্ধান্ত ; সতী কি বিধবা ; দেব-প্রভাব , অজ্ঞানানন্দ ; সরল বিশ্বাস ; প্রেম নিরাকার ; তত্ত্বজ্ঞান ; সৃষ্টিপ্রকরণ ; সুখী পরিবার ; সৎসাহস ; সাধুর সুখৈশ্বর্য্য।

১৫. **গরলে অমৃত**। প্রথম প্রকাশ ভাদ্র ১৮১১ শকাব্দ। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত এই উপন্যাসটি মানবজীবনের নানা ঘটনার মধ্যে নিহিত ভগবদেচ্ছা সম্বন্ধে প্রচারার্থে লিখিত।

"সভ্যতার নৈসর্গিক বিকাশ, তাহার উপর শিক্ষা ও শাসনের পরিচর্য্যা এবং অবস্থার সংঘর্ষণ, ইহা দ্বারা মনুষ্যত্বের পূর্ণ পরিণতি এবং অনন্ত উন্নতি। এই উন্নতি এবং পরিণতির প্রক্রিয়াকে এখানে গরলমন্থন এবং অমৃত উৎপাদন রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে।" ('ভূমিকা,' পৃ. ৵৹)

১৬ বিংশ শতাব্দী। গল্পে রচিত এই "কাব্যকাহিনী"টি 'পূর্ব্ববিভাগ' ও 'উত্তরবিভাগ', এই দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল।

'পূর্ব্ববিভাগে'র প্রথম প্রকাশ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৵০+১৯৪। 'পূর্ব্ববিভাগে'র ১ম খণ্ডে (পৃ. ১-৮৬) ১৯টি এবং ২য় খণ্ডে (পৃ. ৮৭-১৯৪) ২২টি পরিচ্ছেদ ছিল। গ্রন্থের আখ্যানের সূচনা ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্রে, অর্থাৎ গ্রন্থরচনার প্রায় ৬০ বছর পরে।

"...এখন আবার বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগের ইতিহাস বর্ণন করিলাম,... গ্রন্থের নাম দেখিয়াই অবশ্য সকলে বুঝিতে পারিবেন, ইহা উত্তরকালীয় লোকেদের জন্য।...সত্যের অবশ্যম্ভাবী জয় বিশ্বাসচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া কালাকালের ব্যবধান ভুলিয়া গিয়া এবং বিধাতার অখণ্ড মঙ্গল সঙ্কল্পের উপর একান্ত নির্ভর রাখিয়া লেখক ইহা বর্ণন করিয়াছেন।...যিনি এই কাব্যোল্লিখিত সময়ের পূর্ব্বে ইহার আদর্শে অন্ততঃ নিজ জীবনকে গঠন করিতে পারিবেন তিনি আরো ধন্য।" ('ভূমিকা,' পৃ. ৵০—৵০)

'উত্তরবিভাগে'র প্রথম প্রকাশ ১২৯৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১৯৫ থেকে ৩২৯, পরিচ্ছেদ-সংখ্যা ২২।

আলোচ্য গ্রন্থটি 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত।

১৭. ইহকাল পরকাল। প্রথম প্রকাশ ১৩০১ বঙ্গাব্দ। পৃ. ২২৪। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত পুস্তকটির 'ভবলীলা' বিভাগে (পৃ. ১-১৭৮) ৪টি খণ্ড (যথাক্রমে ৬, ৩, ৪ ও ৮টি অধ্যায় সংবলিত) এবং 'পরকাল' বিভাগে (পৃ. ১৭৯-২২৪) ৬টি অধ্যায়বিশিষ্ট ১টি খণ্ড বর্তমান।

১৮. নবশিক্ষা। প্রথম প্রকাশ ১ জানুয়ারি ১৯০১। পৃ. ৭০। মুদ্রক-প্রকাশক কুঞ্জবিহারী দাস, ২ গোয়াবাগান স্ট্রীট, কলকাতা। বাংলা সাহিত্য ও ব্যাকরণ বিষয়ে স্কুলপাঠ্য পুস্তক।

১৯. ব্রহ্মগীতা। 'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত এই পুস্তকটির ১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে এবং ৩য় খণ্ড পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল।

১ম-২য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৩০৮ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৵০+৷৷০+১১২+১৫২। ১ম খণ্ড কর্ম্মযোগ ও ২য় খণ্ড জ্ঞানযোগ সম্বন্ধে লিখিত। ১ম খণ্ডে 'সূচনা' ছাড়া ২২টি

অধ্যায় : শ্রীজীবের নির্দ্দেশ ; কর্ম্মসংশয়ছেদন ধর্ম্মানুগত কর্ম্ম ; জীবব্রহ্মের সাক্ষাৎ যোগ ; সাকার নিরাকারের তত্ত্ব বিরাটরূপ দর্শন ; ভগবদ্বন্দনা ; পুরুষকার ; কর্ম্ম-বন্ধন ; কর্ম্মাসক্তি নিরসন ; রাজসিক কর্ম্ম , নিষ্কাম কর্ম্ম ; যোগযুক্ত কর্ম্ম ; প্রাচীন শাস্ত্র ; স্বধর্ম্ম এবং স্বাভাবিক কর্ম্মফল ; বাহ্য ও অন্তর যজ্ঞ ; গৃহকর্ম্ম ; লৌকিক ব্যবহার ; বিষয়সুখ ও বৈরাগ্য ; বৈষয়িক নীতি ; সুখদুঃখের তত্ত্ব ; উপসংহার।

২য় খণ্ডে ২২টি অধ্যায় : জীবনোৎপত্তি বিবরণ বিজ্ঞান ও বিশ্বাস ; জীব হইতে মনুষ্যত্বের উৎপত্তি ; নিত্যানিত্য বিবেক মানব তত্ত্ব দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ ; সত্যশাস্ত্র ; দেবদেবী ও অবতার ; সাধনকৌশল ; অলৌকিক ক্রিয়া ; দ্বৈতাদ্বৈত বিভেদ ভগবত্তত্ত্ব সগুণ ব্রহ্মদর্শন ; পাপের উৎপত্তি ও বিনাশ ; মঙ্গলামঙ্গল ; শিক্ষালব্ধ এবং প্রত্যাদিষ্ট জ্ঞান ; বিশ্বজনীন নিয়ম এবং ব্যক্তিগত নিয়তি ; সামাজিক সম্বন্ধ ; রাজনীতি ; মুক্তি ও অমরত্ব পরমপুরুষার্থ সিদ্ধি ; উপসংহার।

৩য় খণ্ডের প্রথম প্রকাশ ১৩০৯ বঙ্গাব্দ। পৃ. ।৵০+৷০+১৩৫। বিষয়বস্তু ভক্তিযোগ। অধ্যায়সংখ্যা ২৬ অনুরাগ উদ্দীপন ; পত্তনভূমি ; দর্শন ; সাধন-সোপান ; আশ্রয়ধর্ম্ম ; শরণাপত্তি জীবনগত ভক্তি ; মুক্তি ও ব্যক্তি ; সারল্য ও বিশ্বস্ততা ; করুণা স্মরণ ; বাহ্যানুষ্ঠান এবং ব্যবহার লক্ষণ ; সেব্যসেবক সম্বন্ধ ; জীবে প্রেম নামে ভক্তি ; বিরহযন্ত্রণা ; ভক্তসঙ্গ পুনর্ম্মিলন ; দৈব এবং পুরুষকার ; ত্রিগুণসমন্বয় ; অভিযোগ খণ্ডন ; জপমাহাত্ম্য ; নবযুগ ধর্ম্ম ; নবভক্তির লক্ষণ ; অশ্রুজলের মাহাত্ম্য ; ভাবপ্রবাহ ; চরমফল ; মহাযোগসম্মিলন।

২০. **পথের সম্বল**। ১ম ভাগ। প্রথম প্রকাশ ১৩১৭ বঙ্গাব্দ। পৃ. [২] +১৲+[৪]+৩৯০।

"সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে পরিবারমধ্যে সন্তান সন্ততির সহিত স্বদেশের নরনারীগণ যাহাতে সহজে ভগবদ্ভক্তি উপার্জ্জন করিতে পারেন তদুপযোগী সহজ ভাষায় সরল ভাবের কতকগুলি প্রার্থনা সঙ্গীত ও ধর্ম্মচিন্তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এই গ্রন্থে প্রকাশিত হইল।" ('নিবেদন')

'চিরঞ্জীব শর্ম্মা' ছদ্মনামে রচিত এই বইটির সঙ্কীর্তন-নগরকীর্তন অংশে ১২২টি সঙ্গীত, 'কবিতাকদম্ব' অংশে ৬৬টি কবিতা, 'প্রার্থনাবলি' অংশে ১০টি প্রার্থনা এবং 'পারিবারিক ও গৃহীসাধকের প্রার্থনা' অংশে ১৬৪টি প্রার্থনা সংকলিত হয়েছে।

২১. **নগর সংকীর্ত্তন**। প্রথম প্রকাশ ১৯১৬ ফেব্রুয়ারি। পৃ. ।০+৫২। পুস্তিকায় সংকলিত নগরসঙ্কীর্তনের সংখ্যা ৪১। 'ভূমিকা'য় প্রকাশক 'ব্রাহ্ম-সঙ্ঘে'র (৮২ হ্যারিসন রোড, কলকাতা) পক্ষে গণেশপ্রসাদ লিখেছেন

"জ্ঞানের ধর্ম্ম ক্রমে কিরূপে ভক্তিবিধানে পরিণত হইল, ব্রহ্মনাম কিরূপে ক্রমে মধুমাখা মাতৃনাম ধারণ করিল, এই সমুদয় নগর সঙ্কীর্ত্তন তাহার পরিচয় দান করিবে।" ('ভূমিকা', পৃ. ৵০)

২২ **উপদেশাবলী**। ১ম খণ্ড। প্রথম প্রকাশ ১৯২০ খ্রী। পৃ. ।০+২২৫। প্রকাশক নববিধান প্রচারাশ্রম। পুস্তকটি ত্রৈলোক্যনাথের রচিত বা সংকলিত নয়, কিন্তু এতে বক্তৃতের সঙ্গে তাঁর নিম্নলিখিত উপদেশগুলি স্থান পেয়েছে: ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উদারতা (ব্রহ্মমন্দির, ২৪ জানুয়ারি ১৮৬৯); ব্রাহ্ম ধর্ম্মের উন্নতি ও তাহার প্রতিবন্ধক (ব্রাহ্মবন্ধুসভা, ২৮ আষাঢ় ১৭৯৫); ধর্ম্মশাসন (ব্রাহ্মবন্ধুসভা, ৩ আশ্বিন ১৭৯৬); প্রত্যাদেশবাদ (ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, ১১ অক্টোবর ১৮৭৪); সবাই সমান (ব্রহ্মমন্দির, ২৮ জানুয়ারি ১৮৭৮); ভক্তিবারি (ব্রহ্মমন্দির, ২৭ জানুয়ারি ১৮৭৯)।

২৩. **চিরঞ্জীব-সঙ্গীতাবলী**। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৪ খ্রী। পৃ. ৩৶০+[১]+৪৪২। সচিত্র। প্রকাশক পরিতোষ ঘোষ, নববিধান প্রেস, কলকাতা। বইটিতে ত্রৈলোক্যনাথের রচিত ১০৬০টি গান ও কীর্ত্তন সংকলিত হয়েছে; বস্তুত বইটি 'গীত-রত্নাবলী' এবং 'পথের সম্বল' গ্রন্থদুটির সঙ্গীতের সংকলন। 'পরিশিষ্টে' শেষোক্ত গ্রন্থ প্রকাশের পরে রচিত নগর-সঙ্কীর্ত্তনগুলি স্থান পেয়েছে। এছাড়া সংস্কৃত 'ব্রহ্মস্তোত্রম্' এবং 'মাতৃস্তোত্রম্' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'চিরঞ্জীব শর্ম্মার' সংক্ষিপ্ত জীবনী-সংবলিত 'ভূমিকা'টি জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত।

২৪. **নবসংহিতা**। উপরে বর্ণিত বইগুলি ছাড়া কেশবচন্দ্র সেন কর্তৃক ইংরেজীতে লিখিত The New Samhita গ্রন্থটি ত্রৈলোক্যনাথ কর্তৃক বাংলায় অনূদিত হয়ে ব্রাহ্ম ট্রাক্ট সোসাইটি থেকে 'নবসংহিতা' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির প্রথম প্রকাশ ১৮০৭ শকাব্দের মাঘ মাসে; পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৵০+১৩৫; বিষয়বস্তু কেশবানুমোদিত সামাজিক বিধিসংকলন। পুস্তকটি ৩৩টি অধ্যায়ে বিভক্ত।

(ক্রমশ)

সূত্রনির্দ্দেশ

৩১. The New Dispensation, 18 September 1881.

৩৮. 'নবধর্ম্মশাসন নাটক ও তদভিনয়,' ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ আশ্বিন ১৮০৪, পৃ. ১৯০-১৯২ ; The Liberal, 17 September 1882.
৩৯. The Liberal, 1 October 1882.
৪০. Ibid., 10 December 1882.
৪১. The New Dispensation, 11 February 1883.
৪২. Ibid., 18 February 1883.
৪৩. The Liberal, 18 March 1883 ; The New Dispensation, 25 March 1883.
৪৪. 'নববিধান-সঙ্গীতাচার্য্য প্রেরিত প্রচারক ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৩২২, পৃ. ১৪।
৪৫. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮০৫, পৃ. ৩২।
৪৬. তদেব, ১৬ ফাল্গুন ১৮০৫, পৃ. ৪৩-৪৪।
৪৭. তদেব, ১৬ ভাদ্র ১৮০৬, পৃ. ১৭৬-১৭৭।
৪৮. তদেব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮০৬, পৃ. ২৩।
৪৯. তদেব, ১ চৈত্র ১৮০৬, পৃ. ৫৩-৫৬ ; ১৬ চৈত্র ১৮০৬, পৃ. ৬২-৬৮।
৫০. 'শ্রদ্ধেয় ভাই ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের প্রাতঃকালের উপদেশের সংক্ষিপ্ত আভাস', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮০৭, পৃ. ২৮-২৯।
৫১. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ বৈশাখ ১৮০৮, পৃ. ৯২।
৫২. The New Dispensation and the Liberal, 7 April 1886.
৫৩. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ বৈশাখ ১৮০৮, পৃ. ৮৬-৮৭।
৫৪. তদেব, ১ কার্ত্তিক ১৮০৮, পৃ. ২১৯।
৫৫. তদেব, ১৬ ভাদ্র ১৮০৮, পৃ. ১৮৭-১৮৮।
৫৬. তদেব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮০৮, পৃ. ২৭ ও ৩১।
৫৭. তদেব, পৃ. ২৭।
৫৮. তদেব, ১ চৈত্র ১৮০৮, পৃ. ৫৫।
৫৯. তদেব, ১ মাঘ ১৮০৯, পৃ. ২৯৫ ; ১ মাঘ ১৮১০, পৃ. ১১।
৬০. তদেব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮০৯, পৃ. ২১।
৬১. তদেব, ১ কার্ত্তিক ১৮১০, পৃ. ২২২।
৬২. ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রী [ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল], 'গাজিপুরের বাবাজি', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৮১০, পৃ. ২০৬-২০৯।

৬৩. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ বৈশাখ ১৮১০, পৃ. ৯০-৯১।

৬৪. 'তান্ত্রিকমত প্রবর্ত্তনে সত্ত্ব,' ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আশ্বিন ১৮১১, পৃ. ২০৫-২০৮; 'সংবাদ', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ অগ্রহায়ণ ১৮১১, পৃ. ২৪৫; শ্রীবরবাসের জনৈক সভ্যের পত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ অগ্রহায়ণ ১৮১১, পৃ. ২৪৫-২৪৭।

৬৫. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ চৈত্র ১৮১০, পৃ. ৬৬।

৬৬. 'আমাদিগের অবস্থা', ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৮১১, পৃ. ২০৬-২০৯।

৬৭. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ অগ্রহায়ণ ১৮১১, পৃ. ২৬০; কান্তিচন্দ্র মিত্র, 'বিজ্ঞাপন,' ধর্ম্মতত্ত্ব, ১ পৌষ ১৮১১, পৃ. ২৭২; ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ পৌষ ১৮১১, পৃ. ২৮০।

৬৮. 'সম্মিলিত মাঘোৎসব,' ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮২২, পৃ. ১৪-২৬। ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ আষাঢ় ১৮১৩, পৃ. ১৩৯; ১৬ ভাদ্র ১৮১৩, পৃ. ১৩১ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৮১৩, পৃ. ২৫৭-২৫৮; ১৬ পৌষ ১৮১৩, পৃ. ২৮৩; ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮১৩, পৃ. ১৮-২৩।

৬৯. ধর্ম্মতত্ত্ব, ১৬ মাঘ—১ ফাল্গুন ১৮১৪, পৃ. ২২, ৩০ এবং ৩২।

৭০. তত্ত্বোধ, ১৬ বৈশাখ ১৮১৫, পৃ. ৯২।

৭১. তত্ত্বোধ, ১৬ চৈত্র ১৮১৩, পৃ. ৬৭।

লিট্‌ল্‌-লিখিত

House of Jagatseth ১৫.০০

সম্পাদনা ও ভূমিকা শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

আধুনিক ভারতীয় ও এশীয় ইতিহাসের

মনোজ্ঞ গবেষণাপত্রিকা

Bengal Past & Present

বার্ষিক চাঁদা ২০.০০

Sir Jadunath Centenary Volume ১৫.০০

ইতিহাস-গবেষকের পক্ষে অপরিহার্য

শ্রীদেবজ্যোতি দাশ কর্তৃক সংকলিত

'ইতিহাস' পত্রিকার লেখকসূচী ১.০০

প্রকাশক

ক্যালকাটা হিস্টরিকাল সোসাইটি

৩৩।১ আমহার্স্ট স্ট্রীট কলিকাতা ৯

প্রাপ্তিস্থান

দাশগুপ্ত অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ

৫৪।৩ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা ১২

অনিবার্য কারণে 'স্মৃতি-কথা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি বলে আমরা দুঃখিত। এখন থেকে নিয়মিত 'স্মৃতিকথা' প্রকাশিত হবে।—সম্পাদকমণ্ডলী, ইতিহাস

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(৪)

এই সব অসুবিধা সত্ত্বেও কলেজ অফ ইণ্ডোলজির কাজ এক রকম ভালভাবেই শুরু হয়। ক্রমে ক্রমে এর ছাত্রসংখ্যাও বাড়তে থাকে। কিন্তু তাদের পড়াতে আরম্ভ করে অল্প দিনের মধ্যেই দেখলাম যে ইংরাজী ভাষায় তাদের জ্ঞান এতই কম যে তারা এই বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ইংরাজী বই বা জার্ণাল পড়ে তার সারবস্তু সংগ্রহ করতে পারে না। একদল ছাত্র আমার কাছে স্পষ্টই স্বীকার করল যে বি. এ. পর্যন্ত তারা হিন্দী ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে এবং পরীক্ষা দিয়েছে; এজন্য ক্লাসে আমার ইংরাজীতে বক্তৃতা তারা ভাল বুঝতে পারে না। এ শুনে আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে বিভিন্ন জার্ণালের যে-সব প্রবন্ধ তাদের পড়তে বলি, তা হয় তারা আদৌ পড়ে না, কিম্বা হয়তো পড়লেও ভাল বুঝতে পারে না। মনে হয়, প্রধানত এই কারণেই ঐ কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ইচ্ছা এবং চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও তাদের পরীক্ষার ফল আশানুরূপ ভাল হয়নি। এই কথাটি আমি বিশেষভাবে লিখে রাখতে চাই। কারণ হিন্দী রাষ্ট্রভাষায় পরিণত হয়ে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যদি এই ভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার বাহন রূপে পরিণত হয় তাহলে উচ্চশিক্ষা এবং গবেষণার আশানুরূপ উন্নতি করা কোনমতেই সম্ভব নয়—এই কথাটি বিশেষভাবে আজকাল সকলের স্মরণ রাখা কর্তব্য মনে করি।

বহির্ভারতে যে হিন্দু সাম্রাজ্য ও সভ্যতার প্রতিষ্ঠা ও প্রসার হয়েছিল তার ঐতিহাসিক বিবরণ আমি কলেজ অফ ইণ্ডোলজির পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করি। বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে জার্ণাল তো দূরের কথা এ বিষয়ে কোন বইও ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য এ ধরনের বই কিভাবে

প্যারিস থেকে কিনেছিলাম, সে কথা পূর্বে বলেছি। শুনেছিলাম, দেশ-বিভাগের পর ঢাকায় আর প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চা তেমন হয় না। সেজন্য হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলারের কাছে ঐসব বই ও জার্নাল তাঁদের কেনাদামের দ্বিগুণ টাকায় কেনবার প্রস্তাব করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবশ্য এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন না। বেনারসে আমার চাকরির অল্পকালের মধ্যে ভাল লাইব্রেরি গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।

আমার আর একটি প্রস্তাব ছিল এই কলেজের সঙ্গে একটি মিউজিয়ম স্থাপন করা। ভাইস-চ্যান্সেলারকে সেকথা অনেকবার বলেছিলাম। আমার বেনারস থেকে চলে আসার কয়েক মাস আগে তিনি দিল্লী থেকে চিঠি লিখে জানালেন যে কাশী শহরে কলাভবন নামে একটি বড় মিউজিয়ম আছে, তার অধ্যক্ষ সেটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে বিক্রি করতে চান। এটি কিনলে আমাদের কাজ হবে কিনা এবং এর জন্য কত মূল্য দেওয়া যেতে পারে—সেকথাও জিজ্ঞাসা করলেন। এই প্রস্তাবে সম্মত হয়ে তাঁকে জানালাম যে, কেনার কথাবার্তা আরম্ভ করার আগে আমি একবার ঐ কলাভবনে কি কি জিনিস আছে তা ক্যাটালগ মিলিয়ে দেখতে চাই।

ঐ কলাভবনটি আসলে একজন লোকই চালাতেন এবং তিনি ছিলেন ভাইস্-চ্যান্সেলারের বিশেষ বন্ধু। আমার চিঠি পেয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলার অধ্যক্ষকে লিখলেন এবং তিনি একটি দিন স্থির করে আমাকে সেখানে যেতে লিখলেন। সেদিন গেলে সব জিনিস দেখার সুবিধা হবে—এমন ব্যবস্থা তিনি করেছেন। তবে একথাও তিনি লিখলেন যে এই কলাভবনের কোন ক্যাটালগ নেই।

নির্দিষ্ট দিনে দুজন সহযোগী শিক্ষককে সঙ্গে নিয়ে কলাভবনে হাজির হলাম। দেখি বাড়ি তালাবন্ধ; সেখানে কেউ নেই। ফিরে এসে ভাইস্-চ্যান্সেলারকে সব কথা জানালাম।

এর অল্প পরেই কোন এক ছুটিতে—গ্রীষ্ম কিম্বা পুজার—কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিলাম। ফিরে গিয়ে শুনলাম যে, কলাভবনের সমস্ত জিনিস ইতিমধ্যে কেনা হয়ে গেছে এবং তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি বেশ মোটা টাকা দিতে হয়েছে। অথচ কি কি জিনিস কেনা হয়েছে, তার কোন তালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে খোঁজ করেও পাওয়া গেল না। সমস্ত ব্যাপারটি সম্বন্ধে আমার কেমন সন্দেহ হল যে, কলাভবনের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ নিজেদের কিছু আর্থিক লাভের জন্যই এই ব্যাপারটি ঘটিয়েছেন। আমার এই

সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল যখন কিছুদিন পরে জানা গেল যে কলাভবনের অনেক হাজার টাকা দেনা আছে এবং কেনার শর্ত অনুসারে সে-টাকা এখন বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হবে। আমি এই ব্যাপারের তীব্র প্রতিবাদ করলাম এবং মিউজিয়মের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কমিটি গঠিত হয় তার সভায় অনেক অপ্রীতিকর প্রশ্নও তুললাম। এর একটা দৃষ্টান্ত এখনও মনে আছে। কোন এক আর্শালে বেরিয়েছিল যে, কলাভবনে কয়েকটি বিশেষ দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রা আছে। কিন্তু কলাভবন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে জিনিস পাঠান হয়েছিল তার মধ্যে সেগুলির কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। এই নিয়ে ভাইস্-চ্যান্সেলারের সঙ্গে আমার বেশ মনোমালিন্য হয় এবং বোধ হয় অনেকটা এই কারণেই কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার চাকরি অকস্মাৎ শেষ হয়ে যায়। আমি প্রথমে দুবছরের জন্য নিযুক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু ভাইস্-চ্যান্সেলার আমাকে বলেছিলেন যে, আমার যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে এর পরেও আরও কয়েক বছর থাকতে পারব। কিন্তু দু বছর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চাকরি শেষ হল।

(৩)

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের অন্যতম গৌরবময় প্রতিষ্ঠান হলেও এর কার্যপ্রণালী দেখে আমি কিন্তু আদৌ খুশী হতে পারিনি। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মন্দির তৈরি করা হয় এবং চাকার আনন্দময়ী মা—যিনি তখন কাশীতে ছিলেন—তাঁকে নিমন্ত্রণ করে এনে যাগযজ্ঞ করে সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইরূপ অর্থব্যয় আরও অনেক হয়েছে এবং অনেকেই তা অনুমোদন করেননি।

এর আর-একটি দৃষ্টান্ত ইতিহাসচর্চার দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার পরেই ভাইস্-চ্যান্সেলার আমাকে বললেন যে ডঃ প্রাণনাথ নামে একজন বড় পণ্ডিত মহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত সীলগুলির অক্ষর পাঠ সম্বন্ধে অনেক দূর সফল হয়েছেন এবং এ বিষয়ে তিনি একটি বড় গ্রন্থও রচনা করেছেন। ভাইস্-চ্যান্সেলার প্রস্তাব করলেন, তাঁর এই বিভাগ কলেজ অফ ইণ্ডোলজির অন্তর্ভুক্ত করা হোক। খবর নিয়ে জানলাম যে, ডঃ প্রাণনাথ মাসিক ছ-সাতশ টাকা মাইনে পান এবং তার জন্য একজন ফটোগ্রাফার, আর্টিস্ট, টাইপিস্ট প্রভৃতি পুষতে হচ্ছে। আমার মনে হল তাঁর তথাকথিত গবেষণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। তাঁর কতকগুলি সিদ্ধান্ত শুনে ভাইস্-চ্যান্সেলার খুব মুগ্ধ

হয়েছিলেন ; যেমন—হিন্দী ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা ; তা থেকেই সংস্কৃত, আরবী, ফারসী প্রভৃতি ভাষা সৃষ্টি হয়েছে ইত্যাদি। ভাইস্-চ্যান্সেলার বললেন যে, প্রায় আট-দশ বছর বহু ব্যয় করে এই যে গবেষণা হয়েছে, কলেজ অফ ইণ্ডোলজির অন্তর্ভুক্ত না হলে তার কোন সার্থকতা থাকবে না। আমি তাঁকে বললাম যে, এই গবেষণার কোন মূল্য আছে কিনা তাতে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুনে তিনি খুব আশ্চর্য হলেন। ডঃ প্রাণনাথের উচ্চ প্রশংসা করে বললেন যে, তিনি বিলেতের ডক্টরেট ; নিঃসন্দেহে তিনি একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তাঁকে বললাম যে, তিনি ইকনমিক্সের বই লিখে ডক্টরেট হয়েছেন ; প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর কোন জ্ঞান আছে কিনা সে সম্বন্ধে কোন প্রমাণ নেই। আর যে গবেষণার বিষয়ে তিনি এত বড়াই করছেন, সে বিষয়েও তো কোথাও কিছু তিনি প্রকাশ করেননি। তার জবাবে প্রাণনাথ ভাইস্-চ্যান্সেলারকে জানালেন যে, জার্ণালে এ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখলে অন্য অনেকে তাঁর আবিষ্কারের কথা জেনে ফেলবে। এইজন্য তিনি একেবারে বই প্রকাশ করতে চান এবং ভাইস্-চ্যান্সেলারও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এই বই ছাপানর জন্য খুব আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

ডঃ প্রাণনাথ বলেছিলেন যে, হায়ারোগ্লিফিক প্রভৃতি সব দুর্বোধ্য সাঙ্কেতিক লিপি তিনি পড়তে পারেন এবং তার সাহায্যেই তিনি মহেঞ্জোদাড়ো লিপি পড়তে সক্ষম হয়েছেন। তখন আমি প্রস্তাব করলাম যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন লিপি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ যে কয়েকজন পণ্ডিত ইয়োরোপে ও আমেরিকায় আছেন তাঁদের দু-একজনের কাছে এই বই পাঠান হোক ; তাঁরা অনুমোদন করলে এ বই ছাপান হবে এবং তখন কলেজ অফ ইণ্ডোলজিতে তাঁকে আমি গ্রহণ করতে রাজী আছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্চ্যান্সেলার ডঃ পারিজা আমার প্রস্তাব সমর্থন করলেন এবং ভাইস্-চ্যান্সেলারও তা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ডঃ প্রাণনাথের কাছে এই প্রস্তাব পাঠান হলে তিনি সরাসরি তা প্রত্যাখ্যান করলেন এই বলে যে বিদেশী পণ্ডিতদের কাছে বই পাঠালে তারা চুরি করে আগেই বই লিখে ফেলবে। এই উক্তি এত হাস্যকর যে আমি ও ডঃ পারিজা এ বিষয়ে আর কোন কথা বললাম না। ভাইস্-চ্যান্সেলারও চুপ করে গেলেন। কিন্তু ডঃ প্রাণনাথের ডিপার্টমেণ্ট যথারীতি চালু থাকল ; বছরে বছরে তার জন্যে বেশ কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হত। আমার চলে আসার পরেও এ ডিপার্টমেণ্ট বজায় ছিল। তার ফলে আমাদের যে কোনরকম জ্ঞান বৃদ্ধি হয়েছে, তার কোন প্রমাণ আজ পর্যন্ত পাইনি।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। কাশীতে থাকার সময়

ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের এক অধিবেশনে একজন সন্ন্যাসী ধরনের ব্যক্তি জানালেন যে, তন্ত্রশাস্ত্রের বর্ণিত সূত্র অবলম্বন করে সমস্ত প্রাচীন লিপি তিনি পড়তে পারেন এবং মহেঞ্জোদাড়ো লিপিরও পাঠোদ্ধার তিনি করেছেন। প্রথম প্রথম তাঁর এই কথা কেউ বড় তেমন গ্রাহ্য করত না। কিন্তু দু-তিন বছর ধরে ঐ সন্ন্যাসী হিস্ট্রি কংগ্রেসের অধিবেশনে একই কথা বলতে থাকেন এবং এ কাজে তাঁকে সাহায্য দানের প্রস্তাব করেন। তখন হিস্ট্রি কংগ্রেসের তরফ থেকে একটি কমিটি গঠিত হয়; স্থির হয় তাঁর কাছ থেকে সব শুনে কমিটি মতামত জানাবেন। আমি ছিলাম ঐ কমিটির সভাপতি। কলকাতায় আমার বাড়িতে তাঁকে একদিন আমন্ত্রণ করে এনে একটু পরীক্ষা করে দেখলাম। তিনি যখন দাবি করলেন যে তন্ত্রের প্রণালী জানা থাকলে যে কোন লিপির পাঠ উদ্ধার করা যেতে পারে, তখন আমি তাঁকে অনতিকাল পূর্বে আবিষ্কৃত একটি হিটাইট লিপি দিয়ে সেটি পাঠ করতে বললাম। ঐ লিপি কোথায় আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ইউরোপের কোন্ কোন্ পণ্ডিত তা পড়তে পারেন—সে-সব কথা কিছুই তাঁকে বললাম না। মুখে তিনি যতই আস্ফালন করুন, কার্যকালে দেখা গেল এক বর্ণও তিনি পাঠ করতে পারলেন না। আমার মতামতই কমিটি গ্রহণ করে এবং হিস্ট্রি কংগ্রেসেও এ বিষয়ে আর কোন আলোচনা হল না।

এর কয়েক বছর পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে এক চিঠি পাই। ঐ চিঠিতে জানলাম যে, সেই সন্ন্যাসী ধরনের ব্যক্তি সরকারের কাছে কয়েক হাজার টাকা সাহায্য চেয়েছেন তাঁর এই অমূল্য আবিষ্কার জনসাধারণের গোচরে আনার জন্য। সেক্রেটারী লিখেছিলেন যে, সরকার এই রকম একটি আশ্চর্য আবিষ্কারের সহায়তা করতে ইচ্ছুক আছেন, কিন্তু তার পূর্বে এর প্রকৃত মূল্য জানার জন্যে সরকার আমার মতামত জানতে চান। এই চিঠি পেয়ে সরকারকে পূর্বের কথা সবই জানালাম।

তারপরে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বিষয়ে কিছু করেছিলেন কিনা জানি না। ঐ সন্ন্যাসী দু-একটি বই লিখেছিলেন; আমাকেও তার কপি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তা পড়ে আমার পূর্ব মত পরিবর্তনের কোন কারণ দেখতে পাইনি। এই প্রসঙ্গে আরও বলতে পারি, আসাম থেকে এক ভদ্রলোকও মহেঞ্জোদাড়ো লিপি পাঠ করে এক বই লিখেছেন। তারও কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আমি দেখতে পাইনি। এরূপ আরও অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি, কিন্তু এই প্রসঙ্গের এখানেই শেষ করলাম।

(৬)

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার সময় আমি একবার প্যারিসে UNESCO-র এক অধিবেশনে ভারত সরকারের অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম। স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ ছিলেন প্রতিনিধি দলের নেতা এবং ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন এর অন্যতম সদস্য। এই উপলক্ষ্যে ইটালির অনেক জায়গায় প্রত্নতত্ত্বের প্রাচীন নিদর্শন দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল; এবং UNESCO-র মিটিং শেষ করে ইউরোপের অনেক জায়গায় আমি ঘুরেছিলাম।

এই মিটিং-এর একটি কথা একটু অপ্রাসঙ্গিক হলেও আমি লিখছি। UNESCOর প্রত্যেক অধিবেশনেই বিভিন্ন দেশের কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে আমন্ত্রণ করে এনে তাঁদের নিজ নিজ দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়াবার রীতি আছে। গ্রীস, ইটালি, জার্মানী এবং আরও দু-একটি দেশের প্রতিনিধিরা তাঁদের দেশ সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন। শুনলাম যে, ভারতীয় প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে ডঃ তারাচাঁদ এই বক্তৃতা দেবেন, আলোচ্য বিষয় হল—ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব। আমি স্যার রাধাকৃষ্ণণের সঙ্গে দেখা করে বললাম যে, আর সব দেশের প্রতিনিধিরা নিজেদের দেশের গৌরবের কথাই একান্তভাবে বিশ্বের দরবারে উত্থাপন করেছেন। ভারতীয় প্রতিনিধির পক্ষে ইসলামের প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা আমি পছন্দ করি না। লোকে ভাববে, হিন্দু সভ্যতা সম্বন্ধে ভারতীয়দের বলবার কিছু নেই; এতে আমাদের দেশের অসম্মান হবে। আমার যুক্তি তিনি মেনে নিলেন। বললেন যে যদিও ঠিক হয়ে গেছে তবু এখন কি করা যায় দেখছি। তিনি কি করেছিলেন জানি না; কিন্তু যথাসময়ে দেখা গেল ডঃ তারাচাঁদের বক্তৃতা আর হল না। ডঃ তারাচাঁদ কি ভাবে যেন খবর পেয়ে আমার উপর খুবই রুষ্ট হন। নানাভাবে সে ক্রোধ পরে তিনি প্রকাশ করেছেন; সে কথা যথাস্থানে বলব। সেই ঘটনার পর অনেক বছর পার হয়েছে, আজও আমার ধারণা সেদিন আমি যে কারণে প্রতিবাদ করেছিলাম তা খুবই সঙ্গত ছিল। ডঃ তারাচাঁদের বক্তৃতা বন্ধ হওয়ায় ভারতের পক্ষে ভালই হয়েছিল বলতে হবে।

(৭)

কানীতে থাকবার সময়ে আমি International Commission for a History of the Scientific and Cultural Development of Mankind-এর সদস্য নির্বাচিত হই। এটি UNESCO-রই একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর

প্রধান কার্যালয় হচ্ছে প্যারিসে। এর উদ্যোগে মানবজাতির ইতিহাস (History of the Scientific and Cultural Development of Mankind) পর্বে পর্বে প্রকাশিত হচ্ছে। যে-সব দেশ UNO ও UNESCO-র সভ্য তালিকা-ভুক্ত তাদের সরকারের কাছে এই কমিশনের সদস্য হওয়ার উপযোগী ব্যক্তিদের নামের তালিকা চাওয়া হয় এবং তদনুসারে সদস্য নির্বাচিত করা হয়। ভারত সরকার ডঃ হোমি ভাবাকে এই কমিশনের সদস্য মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু তিনি এর অধিবেশনে তেমন বড় একটা যোগ দিতে পারতেন না। একবার আমাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে যেতে লিখেছিলেন ; নানা কারণে এই অনুরোধ আমি রাখতে পারিনি।

আমি যখন কাশীতে ছিলাম সে সময় এই ইতিহাসের প্রধান সম্পাদক অধ্যাপক টার্নার (Turner) ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে বেড়ান। কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তিনি আসেন আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং দু-তিন দিন ঐ ইতিহাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। এর কয়েক মাস পরে হঠাৎ প্যারিস থেকে একটি চিঠি পাই, তাতে জানতে পারি যে আমি ঐ International Commission-এর সদস্য মনোনীত হয়েছি। সরকারী তরফ থেকে মনোনীত সদস্য ছিলেন ডঃ ভাবা, আর কমিশনের পক্ষ থেকে সরাসরি আমাকে মনোনীত করা হয়। এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের সঙ্গে আমার যে আলোচনা হয়, সেকথা বিস্তারিত ভাবে পরে বলব।

(৮)

আমাদের দেশের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে UNESCO কর্তৃক প্রকাশিত পূর্বোক্ত মানবজাতির ইতিহাসে প্রাচীন আর্যজাতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমার সঙ্গে উক্ত গ্রন্থের সম্পাদকের অনেক পত্রবিনিময় হয় ; এবং এই বিষয়টি নিয়ে এই International Commission-এর প্রকাশ্য অধিবেশনেও আলোচনা হয়। তার ফলে এই গ্রন্থের অংশ বিশেষের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে ; সেকথা পরে বলব।

UNESCO-র এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের দেশেও ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে সুতীব্র সমালোচনা হয়। দিল্লীতে লোকসভার কয়েকজন সদস্য এই বিষয়ে সরকারকে প্রশ্ন করেন এবং তার উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মিঃ চাগলা বলেন যে, ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে আমি এর প্রতিবাদ করেছিলাম। কিন্তু এই উক্তি সর্বৈব মিথ্যা। প্রথমত, আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে

এই কমিশনের সদস্য নিযুক্ত হইনি। দ্বিতীয়ত, এই গ্রন্থ প্রকাশের পূর্বে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও এবং বিষয়টি আমার দ্বারা ভারত সরকারের দৃষ্টিগোচরে আনা সত্ত্বেও সরকার কিছুই করেননি। লোকসভায় মিঃ চাগলার আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবরণ প্রকাশিত হবার পর আমি প্রকৃত ঘটনা Statesman পত্রিকায় এক চিঠিতে বিবৃত করি। এই চিঠিতে জনাব হুমায়ুন কবীরের প্রতি কিছু দোষারোপ ছিল। এই চিঠির প্রত্যুত্তরে হুমায়ুন কবীর Statesman পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশ করেন; এবং আমিও তার উত্তর দিই। এ ছাড়া আরও কয়েকজন পত্রলেখক সরকারের উপর দোষারোপ করেন; ফলে এ নিয়ে দেশে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ভারত সরকারের বিরুদ্ধে আমি যেসব অভিযোগ এনেছিলাম, তার কোন সদুত্তর না পাওয়ায় পত্রলেখকেরা অনেকেই বেশ অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়টি খুবই গুরুতর। কারণ UNESCO-প্রকাশিত এই গ্রন্থ বহুকাল পর্যন্ত প্রামাণিক গ্রন্থ বলে জগতের সর্বত্র বিবেচিত হবে এবং আর্যেরা যে বর্বর অসভ্য ছিলেন, উক্ত গ্রন্থে লিখিত এই উক্তি দেশে দেশে প্রচারিত হবে। মনে হয়, আমার মৃত্যুর পর এ সম্বন্ধে কোন বিবরণ দেশের লোকে জানবে না; সুতরাং আমি এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত বিবরণ লিখে রাখা সঙ্গত মনে করি।

১৯৪৭ সালে মেক্সিকো শহরে UNESCO-র সাধারণ বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, মানবজাতির সংস্কৃতি ও বৈজ্ঞানিক ধারণার ক্রমবিকাশ ও উন্নতির ইতিহাস সম্পর্কে একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা আবশ্যক। এই প্রস্তাবের ফলে ১৯৫০ সালে UNESCO-র সাধারণ অধিবেশনে এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন (International Commission) গঠিত হয়। এই কমিশনের সভাপতি ছিলেন ব্রাজিল নিবাসী Professor Paulo E. De Berredo Carneiro এবং এই গ্রন্থ প্রণয়নের জন্য একটি সম্পাদকমণ্ডলী (Editorial Committee) গঠিত হয়। এই মণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন আমেরিকার Professor Ralph E. Turner। এর একমাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন Professor J. H. Bhaba। সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি Professor Turner ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। নানা স্থান ঘুরে তিনি কাশীতে আসেন এবং তাঁর সঙ্গে আমার তিন-চারদিন দেখাসাক্ষাৎ এবং এই ইতিহাস সম্পর্কে অনেক আলোচনা হয়। সম্ভবতঃ এর ফলেই এবং অধ্যাপক ভাবার সভায় অনুপস্থিতির কারণেই উক্ত International Commission সরাসরি আমাকে ঐ সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য মনোনীত করে একটি চিঠি লেখেন। আমি এই পদ

গ্রহণ করি এবং ১৯৫৩ সালে এর সদস্য নির্বাচিত হই। দু-তিন বৎসর পরে আমাকে এই সম্পাদকমণ্ডলীর সহকারী সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং আমি এখনও এই পদে নিযুক্ত আছি। বহুদিন যাবৎ প্রতি বছরে এর দু-একটি অধিবেশনে যোগ দিয়েছি। গত কয়েক বছর বার্ধক্যবশতঃ নানা কারণে আমার যাওয়া সম্ভব হয়নি।

আমি যখন এই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হই এবং কমিশনের অধিবেশনে প্রথম যোগ দিই, তার পূর্বেই এই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয় স্থির করা হয়েছিল। সাধারণভাবে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে, এই গ্রন্থ ছয় খণ্ডে বিভক্ত হয়ে প্রকাশিত হবে এবং প্রতি খণ্ডে কোন সময় থেকে শুরু করে কোন সময় পর্যন্ত ইতিহাসের আলোচনা থাকবে তাও স্থির হয়েছিল। প্রতি খণ্ডের জন্য একজন সম্পাদক নিযুক্ত হবেন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য প্রয়োজন হলে দু-একজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হবেন, এই ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন খণ্ডের সম্পাদক তখন স্থির হয়ে গেছে এবং গ্রন্থ লেখার কাজও আরম্ভ হয়েছে। কমিশনের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিয়েই আমি সভাপতি ও সম্পাদক মহাশয়কে বলি যে, আমার মতে এই কার্যপ্রণালী খুব সঙ্গত হয়নি; কারণ প্রতি খণ্ডেই পৃথিবীর সকল দেশের ও সকল সভ্যতার ইতিহাস থাকবে; বিভিন্ন খণ্ডের যাঁরা সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ইউরোপ বা আমেরিকার অধিবাসী; তাঁদের সকলেরই ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি এশিয়ার প্রাচীন দেশের ইতিহাস ও সভ্যতার বিষয়ে বিশিষ্ট জ্ঞান আছে, এরূপ মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। সভাপতি মহাশয় বললেন যে, এখন আর এই প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তখন আমি তাঁদের বলি যে, ভারতের পক্ষ থেকে আমার একটা প্রস্তাব হল এই যে অন্ততঃ দু-তিন জন ভারতীয়কে এই গ্রন্থ রচনার সঙ্গে যুক্ত করা হোক। তাঁরা এ প্রস্তাবে রাজী হলেন এবং বললেন, আমি যখন ভারতের প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক তখন ভারতের বর্তমান যুগের ইতিহাস-অভিজ্ঞ দু-জন ব্যক্তিকে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত করা হোক। এই প্রস্তাবে আমি রাজী হওয়ায় অধ্যাপক কে. জাকারিয়া (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক) এবং ডঃ কে. এম. পানিক্কর এই দুইজন সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন। যতদূর মনে পড়ে, অধ্যাপক জাকারিয়া তখন লণ্ডনে থাকতেন, এবং তিনি একবছর এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি কিছুই লিখতে পারেননি; পরে তিনি নিজের অক্ষমতা জানিয়ে পদত্যাগ করেন। ডঃ পানিক্কর পূর্বে অধ্যাপক ছিলেন, পরে তিনি চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। এই গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে তাঁর অনেক মূল্যবান রচনা

স্থান পেয়েছে এবং এই খণ্ডে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে যা-কিছু লেখা হয়েছে, তিনি তা বিশেষ যত্ন সহকারে পরীক্ষা করে মতামত দিয়েছিলেন।

পূর্বেই বলেছি যে, এই ছয়খণ্ড গ্রন্থের ছয়জন সম্পাদকই ছিলেন ইউরোপীয় বা আমেরিকান এবং সকল দেশের প্রতিনিধি নিয়ে সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হওয়া সম্ভব ছিল না। এই ত্রুটি সংশোধন এবং যাতে প্রত্যেক দেশের লোকেই নিজ দেশের ইতিহাস ঠিকভাবে লেখা হল কি না তা দেখা এবং প্রয়োজন হলে তা পরীক্ষা করা এবং আপত্তি করার সুযোগ পান, সেজন্য এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হল যে এই গ্রন্থের প্রতি খণ্ডের রচনা সম্পূর্ণ হলেই তা সাইক্লোস্টাইল করে UNESCO-র সদস্যভুক্ত প্রত্যেক দেশের কাছে পাঠান হবে। এই কথা জানিয়ে প্রতিটি দেশকে অনুরোধ করা হল যে, তাঁরা যেন এই বিষয়ে একটি ন্যাশনাল কমিটি গঠন করেন, যাঁরা প্রতি খণ্ডের খসড়া পড়ে আপত্তিকর কিছু থাকলে তা কমিশনকে জানাবেন। কমিশন এই সব আপত্তি আলোচনা করে প্রত্যেক খণ্ডের যে পরিবর্তন দরকার বলে মনে করবেন তা করবেন। এই নিয়মটি এই প্রকাশনের একটি বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ প্রত্যেক দেশের অনুমোদনক্রমেই এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে, এ কথা বলা চলে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারত সরকার এই নির্দেশ অনুযায়ী একটি ন্যাশনাল কমিটি গঠন করেছিলেন; কিন্তু আমাকে তার সদস্যভুক্ত করা হয়নি। যতদূর জানি, বাংলা দেশের প্রতিনিধি ছিলেন শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়; এবং এই ন্যাশনাল কমিটিতে এই গ্রন্থের কোনও খণ্ড সম্পর্কে কোন আলোচনা হয়নি। অপরপক্ষে রাশিয়ায় যে ন্যাশনাল কমিটি গঠিত হয়েছিল সেই কমিটি থেকে কেবলমাত্র ষষ্ঠ খণ্ডের সমালোচনা যা কমিশন পেয়েছিলেন তা প্রায় ছ-সাতশত পৃষ্ঠা হবে। এ পর্যন্ত যা বলেছি তাতে এই গ্রন্থের প্রকাশন-প্রণালী সম্বন্ধে পাঠকেরা একটি সাধারণ ধারণা করতে পারবেন। অতঃপর ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যে বিতর্ক এবং গোলমাল হয়, তারই বিবরণ দিচ্ছি।

আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম খণ্ড দুইভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম খণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগ এবং দ্বিতীয় খণ্ডে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দী পর্যন্ত মানবজাতির সংস্কৃতি, সভ্যতা ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিবরণ ছিল। এই দ্বিতীয় খণ্ডের লেখক ছিলেন Sir Leonard Woolley। তিনি একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পুরাতত্ত্ববিদ। অনেক বৎসর পূর্বে ভারতের ব্রিটিশ সরকার অনেক অর্থ ব্যয় করে তাঁকে ভারতের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান বিভাগের কাজ যথাযথ নির্বাহ হচ্ছে

কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য আনিয়েছিলেন এবং তিনি এ সম্বন্ধে একটি বৃহৎ রিপোর্ট পেশ করেন। তাঁর লেখা প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় ভাগ কমিশনের সহকারী সভাপতিরূপে আমার কাছে যথারীতি পাঠান হয়। স্যার উলি ভারতের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা পড়ে কিন্তু আমি বিস্মিত হলাম। তাঁর বিবরণ ইতিহাসের বিকৃতিমাত্র। তিনি বেদ সম্বন্ধে কিছুই লেখেননি। কারণ তাঁর ধারণা বেদ খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীর পরের লেখা এবং তার মধ্যে উন্নত সভ্যতার কোন পরিচয় নেই। তাঁর মতে আর্যরা ছিল বর্বর জাতি এবং তাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর অধিবাসীদের সভ্যতা অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল এবং আর্যরা এই দুই জাতির সভ্যতা বলপূর্বক ধ্বংস করে জগতের ইতিহাসে কুকীর্তি রেখে গেছে— এইরূপ অনেক কথা সেই গ্রন্থে ছিল। আমি এই সম্বন্ধে এক তীব্র প্রতিবাদ করে সভাপতি ও প্রধান সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখি এবং পরের অধিবেশনে যোগ দিয়ে এই প্রশ্ন তুলি। অধিকাংশ সভ্য এই মর্মে মত প্রকাশ করেন যে স্যার লিওনার্ড উলির মতো একজন বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ যা লিখেছেন তা পরিবর্তন করা উচিত নয়। কিন্তু সভাপতি মহাশয় (পুর্তোক্ত Carneiro) বললেন যে, আমি যখন এরকম গুরুতর আপত্তি তুলেছি তখন তা উপেক্ষা করা উচিত নয়। তিনি সব আপত্তিকর মন্তব্য স্যার লিওনার্ড উলির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। এর ফলে স্যার উলি এবং আমার মধ্যে অনেক পত্র বিনিময় হল। কিন্তু স্যার উলি তাঁর মতের বিশেষ কোন পরিবর্তন করলেন না; কেবল আর্যরা বর্বর ছিল—এই 'বর্বর' শব্দের বদলে 'semi-barbarous' শব্দটি ব্যবহার করলেন। আরও দু-একটি বিষয়েও সামান্য বদল করলেন। আমার অবশ্য তা পর্যাপ্ত সংশোধন বলে মনে হল না। তখন আমি সভাপতি মহাশয়কে জানালাম যে, আর্যদের সম্বন্ধে যা মন্তব্য করা হয়েছে তাতে ভারতবর্ষে খুবই উত্তেজনার সৃষ্টি হবে। আমি প্রস্তাব করলাম, ভারতবর্ষের কোন পণ্ডিতের কাছে এইসব মতামত ও আপত্তি বিচারবিবেচনা করে দেখবার জন্যে পাঠান হোক। এই প্রসঙ্গে আমি বোম্বাই-এর অধ্যাপক শ্রী ভি. এম. আপ্টের নাম উল্লেখ করি। আমার এই প্রস্তাব কমিশন মেনে নিলেন।

শ্রী আপ্টে স্যার উলির মতের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। তাঁর তের পৃষ্ঠা টাইপ-করা চিঠিতে তিনি স্যার উলির প্রায় প্রত্যেকটি মতামত খণ্ডন করলেন এবং ঋগ্বেদ যে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ শতাব্দীর পূর্বেই রচিত হয়েছিল, তার অনেক প্রমাণ উল্লেখ করলেন। তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান সাহিত্যের

সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ ঋগ্বেদ যিনি পাঠ করেছেন তাঁর যে প্রাচীন আর্যজাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা কি করে হতে পারে তা আমি বুঝে উঠতে পারছি না।" তিনি স্যার উলির নিকট আবেদন করলেন যেন তিনি ঋগ্বেদ যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সাধারণভাবে একটি পরিচয় দেন।

ইতিমধ্যে আমিও ঐ কমিশন-প্রতিষ্ঠিত Journal of World History নামক পত্রিকায় "The Antiquity and Importance of Rigveda" নামে একটি প্রবন্ধ লিখি। এটির ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (vol. VI, part II, pp. 215-22)। কোন বিষয়ে বিভিন্ন মতামত জানার প্রয়োজন হলে সম্পাদক যাতে ঐ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতামত জানবার ইচ্ছা প্রকাশ করে তাঁদের রচনা বা আলোচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যেই কমিশন এই পত্রিকাটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। রচনালেখকদের কিছু সম্মানদক্ষিণা দিবার ব্যবস্থাও ছিল।

ঋগ্বেদ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দেওয়ায় এই পত্রিকায় ফরাসী ভাষায় লিখিত প্রবন্ধে আমার মতামত প্রকাশ করি। পরে আমার লেখা মূল ইংরেজী প্রবন্ধটি Bhandarkar Institute এর জার্নালে (Annals of the Bhandarkar Oriental Research Institute, vol. XL, pp. 1-15— Rigvedic Civilisation in the light of Archaeology) প্রকাশ করি।

এই সব বাদানুবাদের ফলে বিশেষ কোন সুফল হয়নি। তবে মুদ্রিত গ্রন্থে উক্ত অধ্যায়ের শেষে আমার মতামত, স্যার লিওনার্ড উলির প্রত্যুত্তর, এবং সবশেষে সাধারণ সম্পাদকের মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে (History of the Scientific and Cultural Development of Mankind, vol. I, pp. 405-07 and 411, 412, footnotes 37 and 43)।

যখন স্যার উলির সঙ্গে আমার এই বাদানুবাদ চলছিল, তখন একবার দিল্লীতে জনাব হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী। আমি স্যার উলির মতামতের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, ভারতবর্ষে যে ন্যাশনাল কমিটি আছে তার পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ হওয়া উচিত। উত্তরে তিনি বলেন যে, ন্যাশনাল কমিটির এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। আমি বললাম যে, ন্যাশনাল কমিটি তো এই উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়েছিল যাতে প্রত্যেক দেশের মতামত সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে জানানো যায়। এই কথা বলার ফলে কিম্বা আর যে কোন কারণেই হোক অল্পদিন পরে কেন্দ্রীয়

শিক্ষা বিভাগ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। এই চিঠিতে তাঁরা লেখেন যে, ভারতের ন্যাশনাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হয়ে উঠছে না; এবং এ বিষয়ে কি করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁরা আমার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। আমি তখন কয়েকজন এদেশীয় পণ্ডিতের নাম পাঠিয়ে বললাম যে, এঁদের মতামত সংগ্রহ করে সেগুলি প্যারিসে সম্পাদকমণ্ডলীর কাছে পাঠানো হোক। পরে জেনেছিলাম যে এটি করা হয়েছিল; কিন্তু তা করতে এত দেরী হয়েছিল যে সম্ভবত তখন বই ছাপা হয়ে গিয়েছিল বলেই এই প্রতিবাদের কোন ফল হয়নি।

আমার বিশ্বাস, ভারতবর্ষের ন্যাশনাল কমিটি থেকে সময়মত প্রতিবাদ পাঠান হলে নিশ্চয়ই কাজ হত। আমার মতামত ব্যক্তিবিশেষের মতামত। তার চেয়ে একটি দেশের মতামতকে সম্পাদকমণ্ডলী অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দিতেন। আমার ব্যক্তিগত মতামতের মর্যাদা রাখবার জন্যে যখন তাঁরা সেটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন তাঁরা ভারতবর্ষের ন্যাশনাল কমিটির মতামতের নিশ্চয়ই বেশি মূল্য দিতেন।

যাই হোক, ব্যাপারটি এখানেই শেষ হল না। এই গ্রন্থ প্রকাশের পর এ নিয়ে Statesman পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হল এবং দিল্লীর লোকসভার একজন সদস্যও এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। তার উত্তরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মিঃ এম. সি. চাগলা বলেন যে, ভারত সরকার আমার মারফৎ প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এটি সর্বৈব মিথ্যা। কারণ আমার প্রতিবাদ আমি কমিশনের সহকারী সভাপতি হিসাবে সম্পাদকমণ্ডলীকে জানিয়েছিলাম। তারপর স্যার উলির সঙ্গে আমার যে বাদ-প্রতিবাদ হয়, তার সঙ্গে ভারত সরকারের কোন সম্পর্কই নেই।

পূর্বেই বলেছি যে, মিঃ চাগলা একবার বলেছিলেন যে আমি ভারত সরকারের প্রতিনিধি। তাও সত্য নয়। তাঁদের প্রতিনিধি ছিলেন অধ্যাপক জে. এইচ. ভাবা।

এই বিষয়ে আমি Statesman কাগজে একটি চিঠি লিখে যথাযথ ঘটনা বিবৃত করি (১৩ মে, ১৯৬৬)। সেই চিঠিতে জনাব হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে আমার ন্যাশনাল কমিটির বিষয়ে যে-কথা হয়েছিল এবং তিনি যা বলেছিলেন সে-সবই উল্লেখ করি। তার উত্তরে হুমায়ুন কবীর লেখেন যে, এ বিষয়ে তাঁর প্রতি আমি যে দোষারোপ করেছি তা পড়ে তিনি আশ্চর্য হয়েছেন। এ বিষয়টি তাঁর দপ্তরের নয়। অর্থাৎ প্রথমে সেটি শিক্ষা বিভাগের অধীনে ছিল; সে সময় শিক্ষা বিভাগ দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—একটি শিক্ষা (Education), অন্যটি সংস্কৃতি

(Cultural Affairs) । এই ন্যাশনাল কমিটি যে ভাগে ছিল, তিনি তখন তার মন্ত্রী ছিলেন না ; একথা সত্য হলেও আমি যখন তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম তখন তিনি আমাকে বলতে পারতেন যে এটা তাঁর দপ্তরের বিষয় নয় ; এবং বিষয়টির গুরুত্ববোধে তিনি সহযোগী মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতেন এবং আমিও তাহলে তখনই এর গুরুত্ব বিবেচনা করে বিষয়টি তাঁর সহযোগী মন্ত্রীর দৃষ্টিগোচরে আনতে পারতাম । তিনি আমাকে যে বলেছিলেন ন্যাশনাল কমিটির এ বিষয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নেই—একথা তাঁর নাকি মনে নেই । তিনি ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে তা সম্ভব নয় । কারণ আমি এই উত্তরে খুবই আশ্চর্য বোধ করেছিলাম এবং নিরাশ হয়েছিলাম । তাঁর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমি এখনও মনে করি যে, এই রকম একটি গুরুতর বিষয়ে তিনি যে ঔদাসীন্য দেখিয়েছিলেন তা একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ ও মন্ত্রীর পক্ষে খুবই অসঙ্গত মনে করি ।

(ক্রমশঃ)

যোগেশচন্দ্র বাগল

গৌতম নিয়োগী

(১০১ পৃষ্ঠার পর)

৮. পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত ইংরেজী রচনা :

(পত্র-পত্রিকার নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে ইংরেজী বর্ণমালার বর্ণানুক্রমিক এবং রচনাসূচী কালানুক্রমিক ভাবে সজ্জিত।)

All India Printers' Conference Exhibition, 1954 :

Book Illustrations in Bengal in the Early 19th Century.

All India Writers' Conference Souvenir, 1957 :

Our Cultural and Literary Institutions.

Bengal Past and Present

Primary Education in Calcutta (1818-1833), July-December 1962.

Bethune College and School Centenary (1849-1949) Volume, 1949

History of the Bethune School and College.

The Calcutta Municipal Gazette :

The Beggar Problem of Calcutta, 6 December 1941.

Pre-Mutiny Political Institutions of Calcutta : Early History of the British Indian Association, 11 July 1942.

Free Schools in Calcutta in Early Nineteenth Century, 8 August 1942.

Free School Movement in Calcutta in Mid-Nineteenth Century, 12 September 1942.

Societies and Associations of Old Calcutta, 14 May 1949.

Calcutta's Cultural Achievements : 1. Royal Asiatic Society of Bengal, 9 September 1950.

Calcutta's Cultural Achievements : 2. Bangiya Sahitya Parishad, 16 September 1950.

Calcutta's Cultural Achievements : 3. Sanskrita Sahitya Parishad and other Cultural Associations, 23 September 1950.

Calcutta's Achievements in Science and Medicine, 30 September 1950.

Centenary : Government College of Arts and Craft, 1966 :
History of the Government College of Art and Craft.

Forward :
Nationalist Forces in Bengal in Pre-Congress Era, 10 October 1947.

Old Club (Bowbazar) Golden Jubilee Souvenir, 1906-1956
The Bengali Stage.

(The) Free Lance :
The Presidency College, 15 June 1955.
Koshub Chunder Sen, 19 November 1955.
Nabin Chandra Sen, 10 February 1956.
Deshapriya Jatindra Mohan, 22 February 1956.

(The) Hindusthan Standard :
Some Unpublished Letters of Raja Radhakanta Deb, 26 August 1945.
Letters of Ananda Mohan Bose, 15, 22, 29 October 1950.
National Library in the Making, 31 August 1952.
The National Library, 1 February 1953.
Hindu Mela or National Gathering, Puja Annual 1953.
Romance of the Bengali Types, 2 March 1954.
P. N. Bose, Discoverer of the Tata Iron Ores, 15 May 1954.
Calcutta—The Cultural Capital of India, Puja Annual 1954.
From Hindu College to Presidency College, 15 June 1955.
Swadeshi Movement : Genesis of Partition, 7 August 1955.
Swadeshi Movement : Its Implications, 16 October 1955.
Jogesh Chandra Roy, 17 April 1956.

Homa's Annual of Calcutta, 1953 :
The Calcutta Press.

Insurance World :
Light on the Earliest Indian Insurance, December 1931.
Indian Insurance of those days, May 1932
State Competition and Indian Insurance of those days, August 1932.
Insurance of those days, December 1932.
More light on Oriental Life Insurance Company, February 1933.
Inner working of an Insurance Company of those days, June 1933.

The Romance of Indian Life Insurance, July 1933.
Indian Life Insurance Companies in the Making, August 1933.
Landmarks in Indian Insurance, September 1933.
More about the Universal Life Insurance Society, October 1933.
Indian Insurance of the Agency Houses of Calcutta, December 1933.
Mutual Insurance Concerns of those days—The Laudable Societies, Janurary 1934.
Beginning of Life Insurance in India, April 1934.
Marine Insurance of those days—(Activities of Marine Insurance Society of those days), December 1934.
Life Insurance in the making, November, 1935.
Pioneers of Indian Insurance, January 1936.

The Modern Review

David Hare and the Beginnings of English Education in India, Janurary 1933.
The Charter Act of 1833 and Indian Public Opinion, March 1933.
Radhanath Sikdar, April 1933.
More light on Radhanath Sikdar, September 1933.
Rustomji Cowasji, July 1933.
David Hare as a promoter of Education in India, January 1934.
Henry Derozio, June 1934.
Spanish Turmoil and Trend of British Diplomacy, Apri 1937.
Trouble on the North-West Frontier and After, May 1937.
Votle Face of the Soviet Foreign Policy and Finland troubles, March 1940.
Raja Radhakanta Deb on Women's education in India, July 1941.
Radhanath Sikdar—A Great Mathematician and Scientist, July 1942.
Raja Radhakanta Deb on the Reactionary attitude of the Europeans in India and the Revival of Sanskirt Learning, August 1942.

Female Education Movement in Mid-Nineteenth Century : Origin of the Bethune School, July 1953.

Rajnarain Bose and Indian Nationalism, June 1944.

Early years of the Calcutta Medical College, September and October 1947.

Ananda Mohan Bose on the Future of British rule in India, March 1948.

Indian Journalism and our Freedom Movement, the First Phase. November 1948.

Our Freedom Struggle in England, December 1948.

Three Eminent Friends of India, March 1949.

Those who served us in India, May 1949.

The Bethune School : The First Phase, June 1949.

Three Pioneer Free Institutions in Calcutta, September 1951.

Women in India's Freedom Movement, June and July 1953.

Milestones to our Freedom Struggle, September, October and November 1953.

The Cult of Swadeshi, December 1954.

The Hindu College, Predecessor of the Presidency College—The story of its Foundation, July 1955.

The Hindu College. The First Phase, September 1955.

The Hindu College, The Second Phase, December 1955.

Studies in the Bengal Renaissance (*edited by A. C. Gupta*), *Jadavpur, 1958* :

Congress in Bengal (1885-1920).

পুস্তক-পরিচয়

পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক। শ্রীঅমলেন্দু দে। রত্না প্রকাশন, ১৪/১ পিয়ারীমোহন রায় রোড, কলিকাতা-২৭। মূল্য ১৫.০০।

R.C. MAJUMDAR.

4, Bepin Pal Road,
P. O. Kalighat, Calcutta, 26
21. 8. 72

প্রিয় অমলেন্দু বাবু

"পাকিস্তান প্রস্তাব ও ফজলুল হক" বইটি মুদ্রণ করেছ। ইহা সাধারণ পাঠকের খানি ঘনিষ্ঠ ভাবেই প্রয়োজন এই গ্রন্থের লিখিত হয়। সব ঘটনাই আমার জানের মধ্যে ছিল। ইহা সত্ত্বেও অনেক কথা না জানতে সম্পূর্ণ সমাধান না থাকতে তাঁর সম্বন্ধে আমার মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে এই, মুসলমান দেশ সেবী মধ্যে অন্যতম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করি। তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস - সম্মত প্রশংসনীয় আলোচনা করে বর্তমান যুগের ইতিহাসের, এটি সম্ভব অভাব আপনি দূর করেছেন। আমার এই গ্রন্থের জন্য ধন্যবাদ জানাই। অনুরোধ, আপনি ছিলা

ভবিষ্যতে, ইতিহাসের এটি: একটি সুখ্যাতির অধিকারী বলে বিবেচিত হবে। আমি এই বিশ্বাস পোষণ করি।

ইতি
শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার

উনিশ শতকের সমাজ ও সংস্কৃতি। প্রবন্ধ সংগ্রহ। শ্রীঅমিতাভ মুখোপাধ্যায়। জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা। পৃ. ১৭৫। মূল্য ৬ টাকা। মুখবন্ধ: শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার।

সমগ্র বইটি পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত।

প্রথম বিভাগে সমাজ সম্পর্কে আলোচনাকালে বাঙ্গালী সমাজ ও জাতিভেদ প্রথা, হিন্দু সমাজে বর্ণ ও বৃত্তি, কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার, বিধবাবিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর, বাংলার চড়কপূজা ও নরবলি সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় বিভাগে ধর্ম সম্পর্কে আলোচনাকালে লেখক রামমোহন, হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন, আর্যসমাজ ও স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ বিভাগে যথাক্রমে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান এবং বালগঙ্গাধর টিলক ও উনিশ শতকের রাজনীতিতে সন্ন্যাসবাদের সূচনা সম্পর্কে আলোচিত হইয়াছে।

সর্বশেষে লেখক উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রকৃত সীমারেখা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া গ্রন্থটি শেষ করিয়াছেন।

বাংলা ভাষায় ইতিহাস বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। সেইদিক দিয়ে লেখকের এই বই প্রশংসার যোগ্য। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষকদের জন্য এই বইতে আরও মৌলিক উপকরণ থাকার প্রয়োজন ছিল।

উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ এবং জাতিভেদ প্রথা আলোচনায় তখনকার দিনের অনেক উপকরণ এখানে স্থান পায় নাই। এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পুস্তক ও পুস্তিকাগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য: ১। জাতি প্রবন্ধ—সূর্যকুমার ধর ২। কুলসার সংগ্রহ—রোহিনীকান্ত মুখার্জী ৩। জাতিভেদ—শিবনাথ শাস্ত্রী ৪। মনুসংহিতা ও কুলকভট্ট—কৈলাস ভট্টাচার্য ৫। জাত নেই তার কুলের আশা—গোপালচন্দ্র সেন ৬। কুলসার—কালিনাথ ব্যানার্জী। এ ছাড়া The Bengal Spectator কাগজেও জাতিভেদ প্রথা সম্পর্কে ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হইয়াছে।

বাংলাদেশে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচার সম্পর্কে আলোচনাকালে লেখক অনেক তথ্য উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু কুলীন জামাতাদের আদর-আপ্যায়নের রীতিনীতি সম্পর্কে কিছুই আলোচনা করেন নাই। ঐ বিষয় আলোচিত হইলে কৌলীন্য প্রথার অত্যাচারের ছবি আরও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিত। মনে

হয়, ঐ বিষয়ে আলোচনাকালে লেখক যদি নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য লইতেন, তাহা হইলে এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইত : ১। সমাজকলঙ্ক—আশুতোষ বসু ২। কুলিন কুতন—রাসবিহারী মুখার্জী ৩। কুলরক্ষক—চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ৪। কুলকালিমা—যাদবচন্দ্র লাহিড়ী ৫। কৌলিন্য কি স্বর্গ দেবে—অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী ৬। সমাজ কালিমা—প্রাণবল্লভ মুখার্জী ৭। অবিনাশ উপাখ্যান—প্রথম সংখ্যা—কুলের গোমড় এতেই যাবে—অবিনাশ সিংহ রায়।

বিধবা-বিবাহ আন্দোলন ও বিদ্যাসাগর সম্পর্কে আলোচনাকালে লেখক শুধু বিধবা-বিবাহের পক্ষে প্রচলিত মতের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তখনকার দিনের বিধবা-বিবাহের বিপক্ষেও প্রবল মত ছিল। লেখক সে সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করেন নাই। ফলে তাঁর আলোচনা একপেশে হইয়াছে। বিধবা-বিবাহকারী-দের সমাজে অনেক নির্যাতন সহ্য করিতে হইত। সেই সম্পর্কে কোন ঘটনার বিবরণ এখানে নাই। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে (কলিকাতা, সিগনেট প্রেস, ১৩৫৯, পৃ. ৭৫-৭৭) তাঁর বন্ধুর বিধবা-বিবাহ ও সামাজিক নির্যাতন সম্পর্কে একটি মর্মান্তিক চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। লেখক যদি বিধবা-বিবাহের পক্ষে ও বিপক্ষের মতবাদ তুলিয়া ধরিবার জন্য নিম্নলিখিত বইগুলির সাহায্য লইতেন, তাহা হইলে তাঁর বক্তব্য আরও জোরালো হইত : ১। বিধবাবিবাহের শাস্ত্রীয়তা ও যুক্তিযুক্ততা—দেবেন্দ্রনাথ মুখার্জী ২। বিধবাবিবাহ বিষবৃক্ষছেদন—যাদবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ৩। বরের বিয়ে ডিস্‌মিস্—জগৎচন্দ্র গুহ ৪। বিধবা বেদান নিষেধক পুস্তক—রামধন তর্ক পঞ্চানন ৫। বিধবা বিবাহ অনুচিত নামক গ্রন্থ ৬। বিধবা বিবাহ ও যশোহর ধর্মরক্ষিণী সভা ৭। বিধবা বিবাহ প্রতিবাদ—মধুসূধন স্মৃতিরত্ন ৮। ন্যায়সঙ্গত—শেখ আব্বদুল গফুর।

উনিশ শতকে বাংলায় চড়কপূজা সম্পর্কে বলিতে গিয়া লেখক এই বই-য়ের পৃ. ৮৩-তে বলিয়াছেন : "এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হওয়ার পর কলিকাতা সহরে ও সহরতলীতে চড়ক ঘোরা, বানফোঁড়া ইত্যাদি বীভৎস অনুষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে যায়।" এই বইয়ের পৃ. ৮৪-তে পুনরায় বলা হইয়াছে : "এর পর ধীরে ধীরে বাংলাদেশের সর্বত্রই চড়কের বীভৎস অনুষ্ঠানগুলি বন্ধ হয়ে যায়।" এই বক্তব্য দুইটি যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, তা নিম্নলিখিত সূত্র হইতে জানা যায়—

১। K. P. Chattopadhyay, The Cadak Festival in Bengal (In the Journal of the Asiatic Society of Bengal, Letters, 1935, vol.3, no.3,p.397-406).

২। The Nature and Extent of Munda-Hindu Interactions, by Buddhadeb Chaudhuri (In Bulletin of the Cultural Research Institute, 1968, vol 7, Nos.1&2, p. 154-165).

গ্রাম-বাংলায় খোঁজ নিলে লেখক এসম্পর্কে আরও তথ্য পাইতে পারেন।

উনবিংশ শতকে বাংলায় হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা-কালে লেখক বলিয়াছেন : "সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যেও নব হিন্দুবাদ আত্মপ্রকাশ করে তিনজন খ্যাতনামা লেখকের রচনার মধ্য দিয়ে। এঁরা হচ্ছেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।" এই প্রসঙ্গে মনে হয়, লেখক আরও কয়েকজন ব্যক্তির নাম করিতে পারিতেন। তাঁদের মধ্যে রাজনারায়ণ বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি (রাজনারায়ণ বসু) ১৮৭১ সালে (কাহারও মতে ১৮৭২) নবগোপাল মিত্রের জাতীয় সভায় হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয় বক্তৃতা করিতে গিয়া বলেন : "হিন্দুধর্ম ক্রমে ক্রমে উন্নত হইয়া এমন আকার ধারণ করিয়াছে যাহা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বজনীন। ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বজনীন অসম্প্রদায়িক ধর্ম। কিন্তু তা বলিয়া কি তাহাকে আর হিন্দুধর্ম বলা যাইবে না?" (সূত্র : রাজনারায়ণ বসু—যোগেশচন্দ্র বাগল, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৬২, পৃ. ৭১)। তাঁর ঐ বক্তৃতা এত সুন্দর হইয়াছিল যে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (সোমপ্রকাশে) লিখিয়াছিলেন : "হিন্দু ধর্ম্ম নির্ব্বাণোন্মুখ হইতেছিল। রাজনারায়ণ বাবু তাহাকে রক্ষা করিলেন।" সনাতন ধর্ম্ম রক্ষিণী সভার সভাপতি কালিকৃষ্ণ দেব তাঁহাকে "হিন্দুকুলশিরোমণি বলিয়া বর্ণনা করিলেন।" (সূত্র : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী, তৃতীয় সংস্করণ, কলিকাতা, এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোং, পৃ. ৩২২)। ১৮৮৬ সালে তিনি সমগ্র ভারতে হিন্দুজাতির এক মহাসমিতি বা মহা-সম্মেলন স্থাপনের উদ্দেশ্যে "মৃত হিন্দুর আশা" নামে একটি প্রস্তাব রচনা করেন। প্রস্তাবে বলা হয় "হিন্দুদিগের ধর্মসম্বন্ধ স্বত্ব ও অধিকার রক্ষা করা; হিন্দু-দিগের জাতীয়ভাব উদ্দীপন করা; এবং সাধারণতঃ হিন্দুদিগের উন্নতি সাধন করা সভার উদ্দেশ্য হইবে।" (সূত্র : রাজনারায়ণ বসু—যোগেশচন্দ্র বাগল, ২য় সংস্করণ, কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৬২, পৃ. ৯১)। যে সমস্ত সমিতি হিন্দু নবজাগরণ আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল, তাঁহাদের সম্পর্কে বলিতে গিয়া লেখক শুধু আর্যসমাজ, Theosophical Society, রামকৃষ্ণ মিশনের উল্লেখ করিয়াছেন। তখনকার দিনে আরও অনেক সভা বা সমিতি গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাদের নাম না করায় হিন্দু নবজাগরণ

আন্দোলনের রূপরেখা অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তাহাদের কার্য-কলাপ মূল্যায়ন করিবার প্রয়োজন ছিল। ঐ সমস্ত সমিতির মধ্যে কালিকৃষ্ণ দেবের সনাতন ধর্ম রক্ষিণী সভা, রাণাঘাট সনাতন ধর্মোৎসাহিনী সভা, যশোহর ধর্ম রক্ষিণী সভা ও ফরিদপুর কৌলীন্য প্রথা সংশোধনী সভার নাম করা যাইতে পারে। ফরিদপুর কৌলীন্য প্রথা সংশোধনী সভার পক্ষে কালিদাস মুখোপাধ্যায় কৌলীন্য প্রথা ও কন্যাবিক্রয়ের বিরুদ্ধে ১৮৭১ সালে 'কৌলিন্য প্রথার সংশোধন ও কন্যাবিক্রয়' নামে একখানি পুস্তিকা সংকলন করেন।

বইটিতে নির্দেশিকার অভাব চোখে পড়ে। নির্দেশিকাহীন বই গবেষকদের প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম।

লেখকের সহজ ও সরল ভাষা এবং প্রকাশভঙ্গী সাধারণ পাঠকের নিশ্চয় ভাল লাগিবে।

বিনয়ভূষণ রায়

National Awakening and the Bangabasi. Shyamananda Banerjee. Amitava-Kalyan Publishers, Calcutta. 1968. Pp. 226+Appendix. Price Rs. 25.00.

সংবাদ চলাচলের সুলভ মাধ্যমরূপে আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পরিবর্তনশীল ঘটনাঘটনের প্রতি দৃষ্টি ও মনোযোগ আকর্ষণে তা এক দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন বক্তব্য বিচারবিবেচনার কেন্দ্ররূপে পত্রিকার স্তম্ভগুলি নিয়ত তৎপর থাকে। সেজন্য এমন এক ভাষায় তথা পরিবেশন করতে হয়, যা সহজে অনুধাবনীয়, অন্তরঙ্গ। সংবাদপত্রের প্রচার পরিসংখ্যানের মধ্য দিয়ে আমরা তাই স্থানকালবিশেষে মানসমণ্ডলীর পরিচয় পাই। জনমত এবং পারিপার্শ্বিকের সেতুবন্ধনে সংবাদপত্রের স্থান ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসায় তাই এত মূল্যবান। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়-সম্পাদিত 'বাংলা সাময়িক পত্র' এবং 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' একদা যে আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলো, শ্রীবিনয় ঘোষের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' অনেকাংশে তা পরিপূরণ করেছে। সম্প্রতি-কালে এ বিষয়ে গবেষণা আরো বিস্তৃত হয়েছে। চিন্তাভূমিতে সংবাদপত্রের অবদান ফিরে ফিরে এসেছে। শ্রীশ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-রচিত 'ন্যাশন্যাল অ্যাওকেনিং অ্যাণ্ড দি বঙ্গবাসী' নতুন একটি দিক তুলে ধরেছে। গ্রন্থকার পেশায় ঐতিহাসিক নন, কিন্তু দীর্ঘ অধ্যবসায়ের মধ্য দিয়ে তথ্যবহুলভাবে আলোচনাটি উপস্থিত করেছেন। একদিক দিয়ে এটি তাঁর পিতা 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক শ্রদ্ধেয় কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনও বটে। অনেকটা

এক-ই কারণে, মনে করা যেতে পারে, ডন-গোষ্ঠির প্রতিষ্ঠাতা দেশবৎসল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণে কিছুকাল পূর্বে অধ্যাপক হরিদাস এবং উমা মুখোপাধ্যায় কতকগুলি নিবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। উনিশ শতকের প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিদের ধরে রাখার চেষ্টা যে বিশ শতকে তাঁদের সন্ততিরা করছেন, এ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য। ইংলণ্ডের ইতিহাসচর্চায় এ ধরনের কাজের রেওয়াজ খুবই, উদাহরণত মার্লবরো-র ওপর চার্চিল-এর রচনাটি ধরা যাক। আরো একটি কারণে শ্রীশ্যামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। সেকালে সর্বাধিক প্রচলিত কাগজগুলির মধ্যে অন্যতম 'বঙ্গবাসী'র সংস্করণগুলি অধুনা লুপ্ত। সংখ্যাগুলির চড়া সুরের জন্য, লেখক মনে করেন, সাধারণ পাঠাগারে কিম্বা ব্যক্তিগত সংগ্রহে রাখা সম্ভবত নিরাপদ ছিল না ফলে ঘটনা অনুস্থিতির জন্য তাঁকে তৎকালীন দলিল-দস্তাবেজের বহু বিক্ষিপ্ত উল্লেখের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। নূন 'বঙ্গবাসী'র উদ্দীপক বাগ্‌ধারা বহুস্মারিত হলেও তৎসংশ্লিষ্ট অভিযোগ-প্রত্যুত্তরের বাগ্‌বিতণ্ডা সংস্থাপনে লেখক যে অসম্ভব প্রয়াস পেয়েছেন তার চিহ্ন বইয়ের সর্বত্র ছড়ানো।

সাতটি অধ্যায় সমন্বিত আলোচ্য গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মোটামুটি অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক আখ্যায় ভাগ করা যায়। যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং উপেন্দ্রচন্দ্র সিংহ রায়ের যৌথ কর্তৃত্বে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ ডিসেম্বর 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার কাজ শুরু হয়। ঐ একই বছর কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এবং উক্ত গোষ্ঠির মালিকানায় 'দৈনিক' পত্রিকাটি প্রথম দেখা দেয়। পরে 'দৈনিক' প্রভূত উন্নতি করলে যোগেন্দ্রচন্দ্রের অনুরোধে কৃষ্ণচন্দ্র ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' সম্পাদনার ভার এবং মালিকানায় অংশগ্রহণ করেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' পরিত্যাগ পর্যন্ত তিনি এই দুটিরই সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এইটিই বঙ্গবাসীর স্বর্ণযুগ। তার গ্রাহকসংখ্যা তখন ছিল বিশ থেকে ত্রিশ হাজারের মতন। জাতীয়তাবাদীদের কণ্ঠে সোচ্চার 'ধননিষ্কাষণ' (ড্রেইন অফ ওয়েল্‌থ) তত্ত্ব তখন 'বঙ্গবাসী'র পাতায় পাতায় ঘুরে ফিরে দেখা দিত। 'দেশীয় পত্র বিবৃতি' (রিপোর্ট অন নেটিভ পেপারস্‌) থেকে 'বঙ্গবাসী'র অর্থনৈতিক অভিযোগগুলির সমাহার ঘটেছে গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১ এপ্রিল থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৯০০,০০,০০০ টাকার বস্ত্র ইংরেজী দ্রব্য আমদানির কথা উল্লেখ করে ৩১ মে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' লেখে যে, ঐ সংখ্যা পূর্বোক্ত কটি বছরে বৃদ্ধির দিকে। অর্থনৈতিক শোষণের দিক দিয়ে ঐ প্রবন্ধটি ব্রিটিশ-শাসনের জাত মুঘল আধিপত্যের থেকে আলাদা করে। উৎপীড়নের উৎস সম্পর্কে 'বঙ্গবাসী'র দৃষ্টি সজাগ ছিল। 'দেশীয় পত্র বিবৃতি' থেকে

একটি বক্তব্যের একাংশ তুলে দিচ্ছি : "The real oppressors of India are not its English Governors, but the Manchester cloth merchants" (গ্রন্থপৃষ্ঠা ৪৩)। এইজন্য ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে 'বঙ্গবাসী' শ্লেষাত্মক ভঙ্গীতে বলেছিল—অগস্ত্য এক চুমুকে যেমন সমুদ্র নিঃশেষ করেছিলেন, তেমনি ব্রিটিশরা গণ্ডুষবারিতে ভারতবর্ষ নিঃশেষ করলেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিবরণে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, রেলপথ বিস্তারের জন্য ব্রিটিশরা যে উঁচু জমি হেঁটে করছিল তার ফলে বন্যার সর্বগ্রাসী প্রকোপ বেড়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীদের বাঁধ বাঁধার চেষ্টা সরকার রোধ করে (গ্রন্থপৃষ্ঠা ১০)।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে 'বঙ্গবাসী' বর্ণবৈষম্য নীতির তীব্র বিরোধিতা করে। 'ইংরেজরা সভ্য—আমরা অসভ্য' প্রবন্ধে 'বঙ্গবাসী' মন্তব্য করে—"ইংরেজরা সভ্য বলে ন্যায়দণ্ড বেচবে ; আমরা অসভ্য বলে নিলামে তা কিনবো " (গ্রন্থপৃষ্ঠা ১২)। অন্যত্র 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা বিচারালয়গুলিকে 'নরককুণ্ড' বলে বর্ণনা করে (ঐ)। অর্থনৈতিক নিগ্রহের বিরুদ্ধে 'বঙ্গবাসী'—বাংলা সরকারের ১৩ জুন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের গোপন পত্র থেকে জানতে পাই—স্বদেশী পণ্য ব্যবহার এবং বিদেশী জিনিস বয়কটের চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে চরমপন্থীদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে 'বঙ্গবাসী' বলেছিল—ভিক্ষার দ্বারা ফললাভ হবে না। আগে মানুষ হয়ে পরে রাজনৈতিক অধিকার চাইতে হবে। 'রাজকুটুম্বদের অধমি লাঞ্ছনা' শীর্ষক প্রবন্ধে 'বঙ্গবাসী' বলে : "The day on which those 20 crores of subjects, no matter whether unarmed or without food, weak or dispirited, will become rebels only in their minds, there will not be much delay in striking the Bisarjan Music of the English Raj" (গ্রন্থপৃষ্ঠা ৬৬)। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা মনিপুর রাজ্যে হস্তক্ষেপ করলে ২৭ জুন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এক প্রবন্ধে 'বঙ্গবাসী' জানায় যে, বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সামাজিক সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে 'বঙ্গবাসী'র ভূমিকা নিরূপণ করতে গিয়ে শ্রীবিনয় ঘোষ বলেন—"The astonishing popularity of the Bangabasi clearly indicates the ideological triumph of Hinduism over all other current thoughts and ideas." (History of Bengal, Calcutta University, 1967, pp.230-31)। হিন্দু পুনরুত্থানের এই মুখপত্রটি বলে—"But then we tell you, one word clearly, once for all, that, if you

give your Indian subjects anguish in heart, rendering them intolerant by interfering with their religion, then it does not seem likely, that your auspicious stars will long remain propitious". গত শতাব্দীর শেষের দিকে উচ্চারিত এই কথা থেকে যেমন একদিকে ব্রিটিশ শাসকদের ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপে অনীহার কারণ বোঝা যায়, তেমনি অন্যদিকে তদানীন্তন ভারতীয় প্রগতিশীলদের যে বোঝা ঠেলে অগ্রসর হতে হয়েছিল তার পরিচয় মেলে। ইংরেজী শিক্ষিতদের বাদ দেওয়া যায় না জেনে 'বঙ্গবাসী' গোষ্ঠিকেও 'টেলিগ্রাফ' বলে একটি ইংরেজী পত্রিকা বার করতে হয়েছিল। অন্যদিকে স্বদেশীয়ানার সাংস্কৃতিক মূল্য বোঝা যায় 'বঙ্গবাসী' গোষ্ঠির উদ্যোগে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন-সম্পাদিত প্রাচীন শাস্ত্র প্রকাশে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে বাংলাভাষাকে স্বীকৃতিদানের জন্য 'বঙ্গবাসী'র চেষ্টা ছিল প্রাথমিক। আসলে 'বঙ্গবাসী' গোষ্ঠির ভয় ছিলো পাছে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবে দেশের প্রাচীন সংস্কৃতি নস্যাৎ হয়। 'চরমপন্থা' ভারতীয় ক্ষেত্রে, অধ্যাপক অমলেশ ত্রিপাঠি বলেন, টয়েনবি প্রযুক্ত 'আর্কেইসিস' শব্দটি স্মরণ করায়।

১৮৮৬ থেকে ৯৭-র মধ্যে, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, 'বঙ্গবাসী' সত্যিই দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে পত্রিকাটি বহু ঝড়-ঝাপটার সম্মুখীন হয়। 'বয়ঃ সম্মতি আইন' প্রণয়নের বিরুদ্ধে তীব্রতম প্রতিবাদ এসেছিল মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক এবং বাংলাদেশে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার পক্ষ থেকে। 'প্রেস্টিজ' শীর্ষক ঐ পত্রিকার ২৩ মে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এক প্রবন্ধে বলা হয়—"The great fear caused by the apprehension of religion has agitated Hindus, Mussalmans, all. Do not fear of losing prestige ; clear the path that leads to ruin." ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে 'বঙ্গবাসী'র বিরুদ্ধে সরকার থেকে যে কেস্ করা হয়, তার কারণ সম্পর্কে লণ্ডনের 'সেণ্ট জেমস্ গেজেট' বলে—"The Bangabasi provoked the extreme measure by the virulence of its attack on the Manipur trial". সরকারপক্ষ থেকে 'বঙ্গবাসী'র প্রবন্ধগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করেন—আশ্চর্য হলেও সত্যি—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শেষ পর্যন্ত জুরিরা অধিকাংশ জুরিরা 'বঙ্গবাসী'র বিপক্ষে সিদ্ধান্ত করলেও 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক এবং ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক কৃষ্ণদাস পাল এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে

আপোষে বাংলার গভর্নর স্যার চার্লস এলিয়ট এবং তাঁর সরকারের প্রধান সচিব স্যার জন এগডার 'বঙ্গবাসী'-সহ দেশীয় পত্রিকাগুলির মার্জনাভিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে অভিযোগ উত্থাপিত করেন। পুনা থেকে প্রকাশিত 'মারাঠা' পত্রিকায় তিলক লেখেন —"Those who fearlessly express, what they honestly feel, believing that loyalty requires that we should speak out our minds, are men of the second generation—a generation that is decidedly in advance of its predecessors, and we believe, that men who will fall victim to the advocacy of their principles will come from the third generation". (গ্রন্থপৃষ্ঠা ১৯৩)।

বইটির রচনাশৈলী আরো সুসমঞ্জস হতে পারতো। পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনার ফলে অসংলগ্নতার ত্রুটি অনেক সময় দেখা দিয়েছে। 'বঙ্গবাসী'র মামলা নিয়ে ইংলণ্ডে 'সেণ্ট জেমস্ গেজেট', 'মর্নিং নিউস্' ইত্যাদি সরকারপক্ষীয় কাগজের সঙ্গে 'দি মর্নিং একো' জাতীয় কাগজের মতভেদ প্রসঙ্গে বিলেতে রাজনীতি এবং সংবাদপত্রের যোগ নিয়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল। সাংস্কৃতিক রক্ষণশীলতার বিষয়ে লেখক যেভাবে কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করেছেন, তাতে ব্যক্তিগত পক্ষপাতিত্বের প্রশ্ন এসে যায়। তবু সত্ত্বেও বলবো, বইটি একটি অভাব মেটাবার প্রয়োজনে অগ্রসর হয়েছে।

নিখিলেশ গুহ

With Compliments from

SYNTHETICS AND CHEMICALS LTD.

2, BRABOURNERE ROAD,
CALCUTTA-1.

Pioneers in Synthetic Rubber Industry
In India.

Telephone : 22-2652
2553

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ইতিহাস

৭ম খণ্ড | কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭৯ | ৩য় সংখ্যা

রাজা রাধাকান্ত দেব

ভবতোষ দত্ত

উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে কলকাতায় যে সামাজিক আন্দোলন ক্রমেই বেগবান হয়ে উঠেছিল তার প্রধান নেতা ছিলেন রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর পরে নব্যবঙ্গের মনস্বী যুবকেরা। আধুনিক বাংলার প্রগতির ইতিহাস মূলত এঁদেরই কর্মকীর্তির সঙ্গে জড়িত। হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির ফলস্বরূপ আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির উন্মেষ ঘটে। এই কলেজ থেকে উত্তীর্ণ ছাত্ররাই রামমোহনের আদর্শকে তুলে নেন এবং নানা আলাপ-আলোচনা সভাসমিতির মাধ্যমে সেই আদর্শকে জীবন্ত রেখে উনিশ শতকের উত্তরার্ধে পৌঁছে দেন।

এই বিষয়টাকে আমরা একটি সহজ সূত্রেই দেখতে অভ্যস্ত। রামমোহন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় স্থায়িভাবে চলে আসার পর যে-সব সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তুললেন, তার দ্বারাই জড়প্রায় বাঙালি জীবনে নূতন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। একদিকে তিনি ভারতবর্ষের বিশুদ্ধ ধর্মসংস্কৃতির প্রাচীন বাণীকে উদ্ধার করলেন। অপর দিকে বৃহত্তর বিশ্বের চিন্তা ও চেতনার সঙ্গে বাঙালির মনকে যুক্ত করে দিলেন। তাঁর এই প্রধান দুটি কাজের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়াল বেদান্ত গ্রন্থ-সম্পাদন, সতীদাহবিরোধী আন্দোলন, শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন। এই সবক্ত কাজের মহত্বে অবশ্যই আজ আর কোনো সংশয় নেই ; রামমোহন এইসব কাজের মধ্যে দিয়ে মহিমান্বিত হয়ে আছেন। সেকালে এই কাজের যাঁরাই বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরা আমাদের কাছে রক্ষণশীল ও প্রাচীনপন্থী বলে পরিচিত হয়ে

আছেন। রক্ষণশীল এবং প্রগতিশীল এই দুটি ভাগে বিভক্ত করে উনিশ শতকের সমাজকে আমরা বিচার করে দেখি। সেই সময়ের একজন শক্তিশালী সমাজনেতা রাজা রাধাকান্ত দেব রক্ষণশীল চূড়ামণিরূপে আজ আমাদের কাছে পরিচিত। রাধাকান্ত দেবের দুটি কাজ বিশেষ করে আমাদের সমালোচনার উদ্রেক করে; দুটিই হিন্দু সমাজের সংস্কার সম্বন্ধে। একটি সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রয়াস এবং অন্যটি বিধবা-বিবাহ প্রচলনে তাঁর বিরোধিতা। রাধাকান্ত দেব কর্মী পুরুষ ছিলেন। বহু বিচিত্র কর্মগৌরবে তাঁর জীবন অলংকৃত। কিন্তু তাঁর এই দুটি কাজকে বিশেষ ভাবে প্রগতিবিরোধী বলে মনে করা হয়। তাঁর এই বিরোধিতা তাঁর জীবনের অন্যান্য কীর্তিকে যেন ম্লান করে দিয়েছে। রাধাকান্ত দেবকে সমালোচনা করে তীক্ষ্ণ ভাষায় মন্তব্য করেছিলেন অন্যতম বিশিষ্ট নব্যবঙ্গ কিশোরীচাঁদ মিত্র। তিনি রাধাকান্তকে পিতা রাজা গোপীমোহন এবং খুল্লতাত রাজা রাজকৃষ্ণ অপেক্ষাও গোঁড়া বলে বর্ণনা করেছেন ১—

The superstitious element which had been mild in his father, Rajah Gopeemohun and torpid in his uncle Rajah Rajkissen, assumed in him an aggressive development. It is, therefore, not to be wondered at, that his attachment to the antiquated customs and usages of his country, was as devoted as his advocacy of educational measures was zealous. In him the argument had a strong hold that what has lasted a long time, must be right and was intended to last. The reverences for existing usages which is strong in human nature was stronger in Radhakanta Deb. His belief in the wisdom of his ancestors was unlimited. Thus impressed he proved during the latter end of his life an anachronism. He witnessed the beginning of a new age. More than half a century had passed, since he was the pet of his grandfather Maharaja Nabakrishna. A new world had come into being.

১

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে রাধাকান্তের মৃত্যু উপলক্ষে আহূত শোকসভাতেও কিশোরীচাঁদ কঠোর ভাষায় তাঁর প্রগতিবিরোধী মনোভাবের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। তাতে তিনি বলেন রাধাকান্তের রাজনীতি বিষয়েও কোনো দৃঢ় মত ছিল না ফলে **he led a party which he did not strictly represent.** রাধাকান্ত সম্বন্ধে

কিশোরীচাঁদের এই সুস্পষ্ট ধারণা পরবর্তী কালের মতামত গঠনের ভিত্তি হয়েছে বলে মনে হয়। অথচ আর একজন নব্যবঙ্গ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সেই সভাতেই বলেছিলেন it is unfair to compare him with persons who were his juniors by more than half a century. কৃষ্ণমোহন নাকি ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে কোনো একটি বইতে রাধাকান্তকে 'গাধাকান্ত' বলে অভিহিত করেছিলেন।[২]

কিশোরীচাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সারবত্তা নেই, সে-কথা বলব না। রাধাকান্ত তাঁর সম্মুখে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে প্রবল পরিবর্তন দেখেছিলেন, সে-পরিবর্তনকে ভারতবর্ষের এতদিনকার ইতিহাসেই দ্বিতীয়রহিত বলা যেতে পারে। এই পরিবর্তনের গভীরতা বোঝা সহজসাধ্য নয়। ইংরেজি শিক্ষা স্ত্রীশিক্ষা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁর সহযোগিতা শুধু নয়, তাঁর নেতৃত্ব ছিল। কিন্তু ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ উৎসাহে অনুকূলতা করেন নি। এ বিষয়ে রাধাকান্ত এমন একটি মনোভাবের অধিকারী ছিলেন যাকে শুধু রক্ষণশীল বলে নির্দিষ্ট করে দিলেই হয় না—বহু বৎসরের ভারতীয় দৃষ্টিবৈশিষ্ট্য বলাই বোধহয় ঠিক হয়। এই দৃষ্টিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনকে কখনোই তত গুরুতর বলে ভাবা হয় নি, যতখানি গুরুতর বলে গণ্য হয়েছে ধর্ম ও সমাজ-বোধ। আমাদের দেশে সমাজকে রক্ষা করাই ছিল প্রধান। সমাজকে রক্ষা করতে পারলে—তার বিধি-নিষেধ ও নিজস্ব প্রকৃতিকে অক্ষুণ্ণ করে রাখতে পারলে জীবনের অন্যান্য পরিবর্তনগুলিকে মেনে নিতে কখনো আপত্তি হয় নি। রাজাশাসনের প্রতি অসন্তোষ সেভাবে কখনো গড়ে ওঠে নি, সমাজ-বন্ধনের প্রতি আনুগত্য যতটা দেখা গেছে।

২

রাধাকান্ত উচ্চ ধনবান কায়স্থ বৈষ্ণব বংশের সন্তান। রামমোহনের দশ বৎসর পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তাঁর জন্ম। তাঁর পিতৃপিতামহের সঙ্গে ইংরেজ শাসকের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ইংরেজরাও দেশের ধর্ম বা সমাজে কখনও হস্তক্ষেপ করে নি বলে তাদের সম্বন্ধে কখনো কোনো অভিযোগ ছিল না। সমাজ যেমন ছিল তেমনিই চলছিল। মুসলমান রাজার আমলেও হিন্দুরা নিজস্ব সমাজ-বন্ধনে বাস করেছে। নদীয়ার রাজা সমাজনেতারূপে গণ্য ছিলেন। রাজা রাজবল্লভের বিধবা কন্যার পুনর্বিবাহ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে বিরোধিতা হয়। শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণচন্দ্রের অসম্মতিতেই এ বিবাহ ঘটতে পারে নি। নবদ্বীপে

হিন্দু সমাজের নেতা যেমন ছিলেন নদীয়ার রাজবংশ, নতুন রাজধানী কলকাতার হিন্দু সমাজের নেতা হয়ে উঠছিলেন তেমনি শোভাবাজারের দেব-গণ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ধর্ম ও সমাজসংস্কারের যথার্থ অর্থ খুঁজতে গেলে হিন্দু সমাজের এই বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিকে মনে রাখা দরকার।

রামমোহন যখন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন অথবা সহমরণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরি করে তুললেন তখন হিন্দু সমাজে যে-অসন্তোষ দেখা দিল তার কারণ তিনি সমাজের চেহারাকে বদলে দিতে চেয়েছেন। আচার-অনুষ্ঠানের দ্বারাই সমাজ চিহ্নিত হয়ে থাকে। সুতরাং রামমোহন যে সর্বমানবিক অনুভূতির প্রবর্তনায় সংস্কারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, সে-অনুভূতি বিশিষ্ট সামাজিক অনুভূতির চেয়ে স্বতন্ত্র। এ জন্য রামমোহনের বিরুদ্ধে উদ্যত হয়েছে যে-সমাজ, সংস্কারের জন্য সে-সমাজ বাইরের হস্তক্ষেপ সহ্য করে নি। হিন্দু সমাজেও সংস্কার হয়েছে। রঘুনন্দনের কথা আমরা জানি। তিনি সমাজে থেকেই এ কাজ করেছিলেন। বস্তুত রাধাকান্ত সহমরণ প্রথাকে উৎকৃষ্ট সামাজিক আচার বলে মনে করতেন কিনা বলা শক্ত, কারণ তাঁর নিজের পরিবারে সত্য সত্যই সহমরণ কখনো হয় নি ; কিংবা এটা কোনো অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্তব্য হিসাবেও প্রচলিত ছিল না। এমন কি এ তথ্যও আজ অবিদিত নেই যে রামমোহন সহমরণ বিষয়ে গ্রন্থ রচনার পূর্বেই মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার এই প্রথার অশাস্ত্রীয়তা প্রতিপন্ন করেছিলেন। এতে এটাই প্রমাণ হয় যে সহমরণ রীতি সম্বন্ধে পূর্বে থেকেই ঐকমত্য ছিল না। রাধাকান্ত দেবও প্রথমেই রামমোহনের বিরোধিতা করেন নি। কেননা কোনো শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের যৌক্তিকতা আলোচনার অধিকার চিরকালই স্বীকার্য। তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাই থাক, রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক বাদ-বিতর্কে তিনি কোনো প্রতিবাদ করেছিলেন বলে জানি না। তাঁর প্রতিবাদ তখনই উচ্চারিত হল যখন ইংরেজ শাসক এ বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে এগিয়ে এল। কেন না তাঁর মনে হল সমাজের অধিকারকে শাসক হরণ করে নিচ্ছে। সমাজের স্ব-তন্ত্রতাকে বিসর্জন দিতে তিনি সম্মত ছিলেন না। রাধাকান্তকে এ স্থলে আমরা দেখি একটি ঐতিহাসিক অধ্যায়ান্তরের যুগে একটি বিশিষ্ট সমাজ-মানসের শেষ প্রতীক হিসাবে, সে মানস বস্তুতই বিলীয়মান। সমাজের সেই অনন্যপরতন্ত্রতা আর থাকছে না, ব্যক্তি মানুষের উদ্ভেদ ঘটছে, গোষ্ঠীমুক্ত স্বাধীন চিন্তার সৃষ্টি হচ্ছে। নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে ভূমিকা একদা গ্রহণ করেছিলেন, রাধাকান্ত দেব বুঝতে পারেন নি—এখন আর সে ভূমিকা

পালনের মূল্য নেই। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সামাজিক প্রবন্ধে' মন্তব্য করেছিলেন—[১]

'ইউরোপে ধর্মশাসনের গৌরব ন্যূন। শুদ্ধ ধর্মশাসনের গৌরব ন্যূন এমত নহে, ইউরোপে ধর্মোপদেষ্টৃগণকে রাজ্যপালের অধীন হইয়াই চলিতে হইয়াছে।... ভারতবর্ষে ওরূপ হইতে পারে নাই। এখানে রাজ্যশাসন ও ধর্মশাসন উভয় শক্তিই আর্যপুরুষদিগের আয়ত্ত হইয়াছিল। এখানে ধর্মশাসন রাজ্যশাসন অপেক্ষা অল্প গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে হয় নাই।...এখানে ধর্মশাসন রাজ্যশাসনের অধীন হইয়া পড়া দূরে থাকুক, উহাই প্রবলতর এবং রাজশক্তির অযথা বৃদ্ধির নিবারণে সক্ষম হইয়াছিল।'

ইংরেজরা আসার পর রাজশাসন এবং সমাজশাসন আলাদা হয়ে গেল। যতদিন ইংরেজ সমাজের বিধি নিয়মে হস্তক্ষেপ করে নি এতদিন এ-প্রশ্ন ওঠে নি। কিন্তু সমাজের ইচ্ছার বিরোধিতা হওয়াতেই রাজা এবং সমাজের ভেদ সম্পূর্ণ প্রকট হয়ে পড়ল। এখন এমন একটা যুগে আমরা উত্তীর্ণ হয়েছি যখন এ ভেদ মেনেই চলবে। রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক বিধানে প্রজা চালিত হবে। সামাজিক বিধি নিয়মগুলির সর্বময়তা ক্রমেই অর্থহীন হয়ে পড়বে। অনেকদিন পর্যন্ত শাসক ধর্মশাসনের নিরঙ্কুশত্বে হস্তক্ষেপ করেনি। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ ডিসেম্বর হেস্টিংসের বিদায়-গ্রহণ উপলক্ষে যে মানপত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে ধর্মবিষয়ে রাজ্যশাসনের নিরপেক্ষতার বিশেষ সপ্রশংস উল্লেখ করা হয়েছিল।[৪] কিন্তু বেন্টিঙ্কের সময়ে এবং পরে হিন্দু কলেজে অহিন্দু ভর্তি করায় এবং বিধবাবিবাহ আইনসিদ্ধ করায় রাধাকান্ত দেখলেন রাজশাসন সমাজশাসনের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠছে। রাজা এবং সমাজের মধ্যে সম্পর্কের চরিত্রই বদলে যাচ্ছে।

এই পটভূমিতেই রাজা রাধাকান্ত দেবের ব্যক্তিত্ব নির্ণয় করে নেওয়া উচিত। বিগত দিনের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাকে সাধারণ ভাবে রক্ষণশীলতা বলা হয় বটে, কিন্তু এ রকম নিষ্ঠামাত্রকেই রক্ষণশীলতা বলা উচিত নয়। এই নিষ্ঠার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত। ব্যক্তিরূপে কেউ কেউ ভিন্নতর পথ অবলম্বন করতে পারেন অবশ্যই, কিন্তু সমগ্র সমাজের বৃহত্তম অংশের চিন্তাধারার প্রতিনিধি রূপে রাধাকান্ত ভেবেছিলেন সেই ন্যায়ান্যায়-বোধের মূল্যমান বুঝি অব্যাহতই থাকবে। ইতিহাসে তথাকথিত প্রাচীন এবং নবীনের কোনো নির্দিষ্ট কালভাগ নেই। এ কথাটা সব সময়ে মনে রাখি না বলে আমরা 'স্ববিরোধিতা-তত্ত্বের' আশ্রয় নিই। রামমোহন-সভ্যবদ্ধের সংস্কার-আন্দোলনের কয়েক দশক পরেও এই প্রাচীনের চিহ্ন

মুছে যায়নি। আমরা তাই উনিশ শতকের শেষেও স্ববিরোধিতা-তত্ত্বের সূত্র প্রয়োগ করি ; এমন কি স্ববিরোধিতা একালেও প্রবল।

রাজা রাধাকান্ত দেবের জীবনী পর্যালোচনা করলেও এ-বস্তুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। রাধাকান্ত সতীদাহ নিবারণের বিরুদ্ধে ধর্মসভা গঠন করেছিলেন আবার ইনিই হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বৎসরে ডিরেক্টর-সভার সভ্যরূপে ইংরেজি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। হিন্দু কলেজের নিয়মাবলী তিনিই রচনা করেছিলেন। রাধাকান্ত তৎকাল প্রচলিত প্রথানুযায়ী আরবি এবং ফারসি শিখেছিলেন ; সংস্কৃতও তিনি উত্তমরূপেই শিখেছিলেন। কিন্তু প্রথমেই কাজে লাগালেন ইংরেজি শিক্ষাকেই। কানিংহাম সাহেবের ক্যালকাটা একাডেমিতে ইংরেজির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় : সে-পরিচয় হিন্দু কলেজে ইংরেজি বিস্তারিতরণের পরিকল্পনায় রূপান্তরিত হয়। এখানে আধুনিক পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া হত। ধর্মশিক্ষা দেওয়ার কোনো কথাই এতে ছিল না।[৫] এর নিয়মাবলীর প্রথম সূত্রই ছিল **The tuition of the sons of respectable Hindoos in the English and Indian language and in the literature and science of Europe and Asia.** রাধাকান্ত দেব শিক্ষা পরিকল্পনায় সমাজ-সংরক্ষণের কথা চিন্তা করেন নি, যদিও রামমোহন উপনিষৎ গ্রন্থাবলী প্রচারের দ্বারা ধর্মসংস্কারের আয়োজন করেছেন। রাধাকান্ত এতে কিছুমাত্র ত্রস্ত না হয়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিতরণের উপরেই ঝোঁক দিয়েছিলেন। একজন সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক এই ঘটনাটির বিশদ পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত করেছেন—[৬]

The Orientalist belief that Western education should serve not as an end in itself but as the stimulus for changing the indigenous culture from within explains why Bengalis accepted the experiment without a recorded murmur of dissent.

এ-সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে হয়। রাধাকান্ত সমাজের ও সংস্কৃতির পরিবর্তন চান নি—এ-কথা সত্য নয়। তিনি পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রভাবে বাঙালি সংস্কৃতির মধ্যে ধীরে এবং স্বাভাবিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। সে-পরিবর্তন সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করেই আনতে হবে—অশ্রদ্ধা করে নয়।

ডিরোজিও-অপসারণের ঘটনাটা পর্যালোচনা করে দেখা যায়। ডিরোজিও হিন্দু কলেজে শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন ১ মে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে। ডিরোজিও আমলে কলেজে শিক্ষা দীক্ষা যে ভালো ভাবেই অগ্রসর হচ্ছিল ১৮২৮ এর ১৪ই

ফেব্রুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটের বিবরণেও তার প্রমাণ আছে। তখনও পর্যন্ত ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতার কোনো সংবাদ নেই।[৭] অতঃপর ১৮২৮-এ ডিরোজিওর নেতৃত্বে তাঁরই বাড়িতে একাডেমিক এসোসিয়েশন স্থাপিত হল। হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্র এই সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় যোগ দিত। বস্তুত এই সভা থেকেই নৈপ্রবিক চিন্তাধারা ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। এই সভার অনুকরণে কলকাতাতে কলকাতা স্কুল সোসাইটির স্কুলগুলির উদ্যোগে আরও সাতটি সভা স্থাপিত হয়েছিল।[৮] এই সব সভাতেও ডিরোজিও উপস্থিত থাকতেন। এই সমস্ত আলোচনার দ্বারাই নবশিক্ষিতদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। নব্যবঙ্গের আন্দোলন হিন্দু কলেজের শিক্ষাপদ্ধতির প্রত্যক্ষ ফল ছিল না। এ ছিল একাডেমিক এসোসিয়েশন ও ডিরোজিওর অনুপ্রেরণার ফল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮২৯-এর নভেম্বর মাসে হিন্দু কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত করে পটলডাঙ্গা স্কুলে শিক্ষকতা গ্রহণ করেন। ডিরোজিওর প্রভাব তখন তাঁর উপর পূর্ণ মাত্রায়। ১৮৩১-এ রাধাকান্ত সার এডওয়ার্ড রায়ানকে লিখেছিলেন কৃষ্ণমোহনকে শিক্ষকপদ থেকে বরখাস্ত করতে।[৯] রাধাকান্ত তখন স্কুল সোসাইটির সম্পাদক। দেখা যাচ্ছে, ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ প্রভাবেই নব্যবঙ্গের প্রথাবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ১৮৩০-এর আগে পত্রপত্রিকায় এই আন্দোলনের কোনো সংবাদ নেই। এই বছরের জানুয়ারি মাসে সতীদাহ-নিবারণের আইন প্রণয়ণ হয়েছিল। ডিরোজিও এই উপলক্ষে একটি সনেট রচনা করেছিলেন।

রাধাকান্তকে তখন দুই দিক দিয়েই সতর্ক থাকতে হচ্ছিল। ধর্মসভা স্থাপন ও বেন্টিঙ্কের নিকট আবেদন প্রেরণ, আর একদিকে তাঁর স্থাপিত হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণের উপায় বের করা। নব্যবঙ্গের অননুমোদনীয় আচরণ চরমে উঠেছিল ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল থেকে জুন মাসের মধ্যে। এপ্রিল মাসেই ডিরোজিওকে কর্মচ্যুত করা হয়। জুন মাসে ঘটে কৃষ্ণমোহনের বাড়িতে নিষিদ্ধ মাংসাহারের ঘটনা। ডিরোজিওকে অপসারণের ব্যাপারে রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন দুইজনেই বিশেষ সক্রিয় হয়েছিলেন। কলেজের অভ্যন্তরে ডিরোজিওর শিক্ষাদান নৈপুণ্য সম্বন্ধে কারো সন্দেহ ছিল না, তথাপি যেহেতু ছাত্রদের বাইরের সভাসমিতিতে যোগদান নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পরিচালক সভার নেই, কলেজ ছাত্রদের ভবিষ্যৎ কল্যাণের কথা ভেবে ডিরোজিওকেই ছাত্রদের পক্ষে অবাঞ্ছিত বলা ছাড়া গত্যন্তর রইল না। রাধাকান্ত এ ব্যাপারে আইনের সূক্ষ্ম প্রয়োগের ছলে তাঁর চিন্তিত সমাজের কল্যাণকে এড়িয়ে যেতে

চান নি। ডিরোজিও দক্ষ শিক্ষক—এবং কলেজের বাইরে একাডেমিক এসোসিয়েশনের ফল তাঁদের বিচার্য নয়—এই যুক্তিতে ডিরোজিওকে কলেজে রেখে দিলে সমাজের প্রতি তাঁর কর্তব্যে অবহেলা ঘটত। বিশেষ করে অনেক ছাত্রই কলেজে যোগদানে বিরত থাকছিল; তাতে হিন্দু কলেজের অস্তিত্বের মূলেই অনিশ্চয়তা দেখা দেবার উপক্রম হয়েছিল। ফলে যে উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা কলেজ স্থাপন করেছিলেন, সেই উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার আশঙ্কা। রাধাকান্ত ডিরোজিওর বৈদগ্ধ্যে বা পাণ্ডিত্যে কোনো সংশয় প্রকাশ করেন নি। রাধাকান্ত উইলসনকে লেখা ডিরোজিওর চিঠির সম্পর্কে লেখেন—

As to the excuses contained in Mr. Derozio's resignation they are of no use and shall not be attended to when he was dismissed on the public feeling.

এক্ষেত্রেও রাধাকান্তকে দেখি সমাজনেতারূপে। সমাজে যেভাবে তিনি প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছেন তাতে বাধা ঘটে সবটাই চোরাবালিতে হারিয়ে যেত। ডিরোজিওকে না সরিয়ে উপায় ছিল না।

আধুনিক কালের উপযোগী শিক্ষা প্রসারে রাধাকান্তের অক্লান্ত প্রয়াস ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবার যোগ্য। পুরনো যুগের শিক্ষানীতি অচল হয়ে নতুন শিক্ষানীতির প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে—এ উপলব্ধি রামমোহনের মতো রাধাকান্তের মনেও এসেছিল। কিন্তু রামমোহন ধর্মসংস্কারেই প্রধানত ব্যাপৃত ছিলেন। শিক্ষার ব্যাপারে বেশি মন দিতে পারেন নি। নানা কারণে রামমোহন হিন্দু কলেজের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে পারেন নি। রামমোহনের যোগদানে কলেজ প্রতিষ্ঠাতেই বাধা ঘটতে পারত। তথাপি তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষার পক্ষপাতী। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে লর্ড আমহার্স্টকে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত পত্র। রামমোহন ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেই অ্যাংলো হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন। শিক্ষার প্রসারে রামমোহন এর চেয়ে বেশি করতে পারেন নি।

রাধাকান্ত কিন্তু আজীবন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। এ যুগের উপযোগী পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা-কার্যকে যেমন অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই গ্রহণ করেছিলেন তেমনি নতুন শিক্ষার উপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে স্কুল বুক সোসাইটি এবং স্কুল সোসাইটির দায়িত্বও তিনি ততোধিক গুরুত্বের সঙ্গেই পালন করেছিলেন। আবার সংস্কৃত শিক্ষার জন্যও তাঁর সতর্ক চেষ্টা ছিল। গোড়ার দিকে

সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, তখন তিনি স্কুল সোসাইটি এবং হিন্দু কলেজ নিয়েই ব্যস্ত। তিনি নিজে সংস্কৃত বিদ্যার চর্চা করতেন। তাঁর সম্পাদিত বিরাট শব্দকল্পদ্রুম তার সাক্ষ্য। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম খণ্ড বেরিয়েছে। ১৮৫১-তে এর সপ্তম খণ্ড প্রকাশিত হলে তিনি ম্যাক্স মুলারকে লিখেছিলেন—[১০]

When I ventured to assume the character of a Lexicographer my most ambitious wish was but to revive the study of Sanskrit in my own country where it has been on decline. But I should not dissemble that love of fame stimulated my exertions through worldly tribulations where patience must have failed and perseverence wearied.

ইন্দোইউরোপীয় ভাষা আবিষ্কার এবং তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব চর্চার ফলে গত শতাব্দীতে ইউরোপে সংস্কৃত-অনুশীলন আরম্ভ হয়। তখন রাধাকান্ত দেবের শব্দকল্পদ্রুম সংস্কৃত চর্চার একটি প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়ায়। সেই সূত্রে রাধাকান্তের সঙ্গে য়ুরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিদদের পত্রযোগে আলাপ হয়। এটা একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাতে সন্দেহ নেই। ভারতীয় সংস্কৃতির বাণীবাহকের কাজ বলতে গেলে শব্দকল্পদ্রুমই করেছিল। আজকের দিনে যাকে 'মানবিকী বিদ্যা' বলে রাধাকান্তের সংস্কৃতবিদ্যা সেকালে ছিল তাই। কেননা স্কুল বুক সোসাইটি বা হিন্দু কলেজে মোটের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞানের (useful science) শিক্ষাক্ষেত্র রূপেই স্বীকৃত হয়েছিল। তাকে সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ করে রাখবারই চেষ্টা হয়েছে। রাধাকান্ত যেন বুঝতে পেরেছিলেন শুধু ব্যবহারিক বিদ্যা দিয়ে মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। সাংস্কৃতিক শিক্ষা বা মানবিক বিদ্যার চর্চা একই সঙ্গে হওয়া দরকার। সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য দেখে তিনি নিজেই শোভাবাজারে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৩৭)। রাধাকান্ত ১৮৩৬ থেকে ১৮৩৭ পর্যন্ত কিছুকাল সরকারী সংস্কৃত কলেজের সম্পাদকও ছিলেন।

তবু আধুনিক শিক্ষা বিস্তারেই তাঁর চিন্তা পরিকল্পনা সবভাবেই কার্যকরী হয়েছিল। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ছয় মাসের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি গঠিত হয়। এর প্রতিষ্ঠা থেকেই রাধাকান্ত দেব এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হলেন।[১১] সোসাইটির বেশ কয়েকটি বই তিনি 'সংকলন, অনুবাদ এবং পরিমার্জনা' করে দিয়েছেন। তারিণীচরণ মিত্র এবং রামকমল সেনের সহযোগে রাধাকান্ত রচনা করেছিলেন নীতিকথা (১৮১৮)। তাঁর বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থ (১৮২১) ২৮৮ পৃষ্ঠার একটি কোষগ্রন্থ। এতে ভূগোল, ইতিহাস,

ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয় ছিল। রাধাকান্ত বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝেছিলেন। তিনি জ্যোতির্বিদ্যার একখানি অনুবাদ-গ্রন্থও স্কুল-বুক সোসাইটির পক্ষে পরিমার্জনা করে দিয়েছিলেন।

এই বইটি পাদরি ফেটন-রচিত এবং এর কিয়দংশ রাধাকান্তের লেখা বলে ডেভিড-কফ অনুমান করেন।[১২] যোগেশ বাগল অবশ্য 'পাণ্ডুলিপি সংশোধন' রাধাকান্ত-কৃত বলেছেন। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত আর একটি বইয়ের বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে গৌরমোহন বিদ্যালংকারের 'স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক' নামে বইটি লেখেন।[১৩] তখন বিদেশনারীদের চেষ্টায় বালিকা বিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু বাঙালিদের মধ্যে স্বভাবতই নানা সংস্কারের ফলে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে নানা সংকোচ ছিল। এই সংকোচ দূর করবার জন্যই রাধাকান্ত এই বইটি লেখানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। যদিও বইটি প্রত্যক্ষত রাধাকান্ত নিজে লেখেন নি। বই লেখার প্রেরণা ও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। এ বইয়ের উপকরণ বিশেষত পৌরাণিক স্ত্রীশিক্ষার কাহিনী এবং বিবরণ রাধাকান্তই সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। আধুনিক দৃষ্টান্তের অনেকগুলি তাঁর সংগ্রহ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেথুনকে লিখিত একটি চিঠিতে তিনি লেখেন—[১৪]

To this extent I have a share in the execution of the work and no further. I cannot therefore conscientiously take upon myself the credit of an author.

নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কর্তব্য পালন দ্বারাই রামমোহন যে-আধুনিক মনোভাবের সূচনা করেছিলেন রাধাকান্ত সেই মনোভাব নিয়েই স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। এ বিষয়ে বিদেশনারীদের সহযোগিতা করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। রাধাকান্ত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে সাহসিক যুক্তিও দিয়েছিলেন। লেখাপড়া শিখলে স্ত্রীলোককে বৈধব্য বরণ করতে হয় এই কুসংস্কারের উপযুক্ত প্রতিকূল শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত রাধাকান্ত দিয়েছেন গৌরমোহনের বইতে। গৌরমোহনের ওই বই বের হবার আগেই রাধাকান্ত ১৮২১-এ 'ব্রিটিশ এণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি'র উদ্যোগকে সমর্থন করেন। অবশ্য তিনি মেয়েদের বাড়িতে পড়াবারই পক্ষপাতী ছিলেন দরিদ্র ছাত্রীদের জন্য সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিদেশনারী স্কুলগুলির প্রচেষ্টায় তাঁর পূর্ণ সম্মতিও ছিল। রাধাকান্ত এই মত প্রকাশ করেছেন এমন সময়ে যখন কলকাতায় হিন্দু নারীদের বিদ্যাশিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না। ১৮২১-এর ২রা জুনের কলকাতা স্কুল সোসাইটির দ্বিতীয় বার্ষিক সভায় স্যার এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট এ বিষয়ে দেশীয় ব্যক্তিদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি অবশ্য সাধারণের জন্য স্ত্রীবিদ্যালয়ের

প্রয়োজনের কথাই বলেছিলেন। কিন্তু তার পূর্ব থেকেই বাড়িতে মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর রীতি গৃহশিক্ষক রেখেও, সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রচলিত ছিল। বেথুন যখন তাঁর বিখ্যাত স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে এগিয়ে এলেন, তার পূর্বে রাজা রাধাকান্ত দেবের সতীদাহ সমর্থন আন্দোলনে এবং হিন্দু কলেজ থেকে সম্পর্কচ্ছেদ ইত্যাদি ব্যাপারে কারো কারো ধারণা হয়েছিল তিনি নারীশিক্ষার মত প্রগতিমূলক আন্দোলনের বিরোধী। সে-জন্যই রাধাকান্ত বেথুনকে খুব স্পষ্ট ভাষাতেই এ বিষয়ে তাঁর অভিমত লিখে পাঠান। তিনি লেখেন—

আপনি যে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে এতটা প্রয়াসী হইয়াছেন সে সম্বন্ধে আমার অভিমত সম্পর্কে বিপরীত ধারণা দূর করিবার জন্য আমি এই সুযোগে বলিয়া রাখি যে আমি নিজে এত কাল উপদেশ ও কর্মের দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমি স্ত্রীশিক্ষার একজন প্রধান উদ্যোক্তা। জাতির নৈতিক চরিত্র ও সামাজিক সুখ বৃদ্ধির পক্ষে স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা যে কত অধিক, তাহা এখন আর ব্যাখ্যা করিয়া বলিতে হইবে না।

কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটির সঙ্গে রাধাকান্তের যোগ দীর্ঘকালের। স্কুল বুক সোসাইটি (১৮১৭) প্রতিষ্ঠিত হবার পরের বৎসরেই এই সভার সভ্যদের আগ্রহে ও উদ্যোগে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি গঠিত হল। এই শিক্ষাসমাজ ছিল দেশের আকাঙ্ক্ষিত ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষাকে সংহত রূপ দেবার প্রথম চেষ্টা। কলকাতায় যে-সব বিদ্যালয় ব্যক্তিগত আয়োজনে চলছিল সেগুলির সাহায্য ও উন্নয়ন এবং প্রয়োজন হলে নতুন বিদ্যালয় স্থাপন। এই সমাজকেই বলা যায় সরকারী জেনারল কমিটি ফর পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের পূর্বাভাস। দেশে নতুন শিক্ষার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা দেখা দিয়েছে, তা মেটাবার জন্য দেশীয় ব্যক্তিদের উদ্যোগেই হিন্দু কলেজ এবং স্কুল সোসাইটি স্থাপিত হয়। স্কুল সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন রাধাকান্ত দেব। সেই সঙ্গে তিনি ছিলেন হিন্দু কলেজের পরিচালক সভার সদস্য, আবার স্কুল বুক সোসাইটিরও তিনি ছিলেন সভ্য। এই তিনটি ক্ষেত্রেই রাধাকান্তের অপ্রতিহত কর্মোদ্যম ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে সরকার অপেক্ষাকৃত উদাসীন ছিলেন। কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন সংস্কৃত কলেজ ও মাদ্রাসা স্থাপন করেছিল। তা ছাড়া সংস্কৃত আরবি এবং ফারসি গ্রন্থ প্রকাশে অজস্র অর্থব্যয় করেছে। আর রাধাকান্ত দেবের সক্রিয়তায় কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি বাঙলা ভাষায় আধুনিক প্রয়োজনীয় বিস্তার বই এবং ইংরেজি বইও প্রকাশ করে চলেছে। ট্রেভেলিয়ন দেখেছিলেন, দুই বছরে স্কুল বুক

সোসাইটি ৩১০০০ ইংরেজি বই বিক্রয় করেছিল, সেই তুলনায় তিন বছরে কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশনের বই ছাপার খরচও ওঠে নি।

সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগ সার্থক হয়ে উঠছিল। কলকাতার প্রাথমিক স্কুল ও পাঠশালাগুলিকে তিনিই স্কুল সোসাইটির নিয়মশৃঙ্খলাধীনে নিয়ে এলেন। তিনি কলকাতাকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করে চারজন পরিদর্শক নিযুক্ত করলেন। ১৬৬টি পাঠশালার মধ্যে ৮৫টিই ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সোসাইটির অধীনে এসেছে। এসব স্কুলে স্কুল বুক সোসাইটির বই বিতরণ করা হত। শোভাবাজার অঞ্চলের কার্যক্রম তাঁর বাড়ি থেকেই পরিচালিত হত। তিনি নিজেই ছিলেন এর তত্ত্বাবধায়ক।[১৭] সোসাইটির অধীনে প্রথমে আসতে কোনো কোনো পাঠশালার আপত্তি হয়েছিল। কিন্তু রাধাকান্ত বই এবং শিক্ষাপ্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম বিষয় মুক্ত রাখতে সচেষ্ট হওয়াতে ভয় কেটে গিয়েছিল। বলা বাহুল্য খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত কথা থাকবে—এই ছিল তাদের আশঙ্কা। রাধাকান্ত কোনো রকম ধর্ম বিষয়ই বইতে রাখতে দেন নি। ব্যক্তিগত ভাবে, বলা বাহুল্য, তিনি হিন্দু ধর্মে উৎসাহী ছিলেন কিন্তু খ্রীষ্টধর্মের অনুপ্রবেশ রোধ করবার জন্য হিন্দুধর্মের বিষয় সন্নিবেশের অধিকারও তিনি ত্যাগ করেছেন। নোটের উপর রাধাকান্ত শিক্ষানীতিতে যে ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন সেটা আজকের দিনে বিশেষ ভাবেই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। তিনি এ বিষয়ে শক্তিশালী সহযোগী পেয়েছিলেন ডেভিড হেয়ারকে। রাধাকান্তের মত প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ধর্ম বিষয়ে গোঁড়ামির পরিচয় দিতে চাইলে অবশ্যই দিতে পারতেন। হয়তো সেরূপ ক্ষেত্রে হেয়ারের সঙ্গে মতানৈক্যের পার্থক্য ঘটত এবং তার কী পরিণাম হতে পারত বলা যায় না। কিন্তু তার কিছুরই কারণ ঘটল না। রাধাকান্ত এবং ডেভিড হেয়ার দুজনেই একটি শিক্ষিত মানবতন্ত্রী সমাজের কল্পনাই করেছেন এবং এদিক দিয়ে আধুনিক জাগরণে তাঁদের বিশিষ্ট ভূমিকাটিকে কোনো দিক দিয়েই তুচ্ছ করা চলে না। রাধাকান্তের শিক্ষানীতির আর একটি বৈশিষ্ট্যও আমাদের চোখ এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার উৎসাহের কথা জানি, হিন্দু কলেজে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষায় তাঁর গভীর আগ্রহের কথাও জানি। আবার ইংরেজি বা সংস্কৃত কোনো শিক্ষার সর্বাত্মকতার দ্বারাই জনসাধারণকে জাগ্রত করে তোলা সম্ভব নয়। খ্রীষ্টান মিশনারীরা বাংলা ভাষার চর্চা শুরু করেছিল তাদের সংকীর্ণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দেই জন্তরা মারশম্যান Hint Relative to Native Schools নামে একটি বই প্রকাশ করে বাংলা ভাষার সাহায্যে শিক্ষা-

বিস্তারের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। এ ধরণের প্রস্তাবের দরকার এই জন্যেই ছিল যে, আগে উচ্চ শিক্ষা চলত সংস্কৃতের সাহায্যে। এ কালে যখন ইংরেজি শিক্ষা এল তখন ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষার প্রবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই হতে পারত। রাধাকান্ত ইংরেজি শিক্ষার জন্য পূর্ণ সমর্থন করেও দেশী পাঠশালার মাধ্যমে বাংলা ভাষার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে চেয়েছিলেন। সোসাইটির ইংরেজি স্কুল থেকে হিন্দু কলেজের জন্য ছাত্র তৈরি করা হত। বাংলা পাঠশালা তুলে দেওয়ার জন্য হেয়ার ১৮৩৩-এ যে-প্রস্তাব করেন, রাধাকান্ত তার বিরোধিতা করেছিলেন। 'সোসাইটির পাঠশালা বিভাগের উন্নতিপক্ষে রাধাকান্ত দেবের কৃতিত্ব সর্বাধিক'। বাংলা-ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করে কারিগরি শিক্ষাদানকে কার্যকরী করে তোলা দরকার—এমন অভিমত রাধাকান্ত দেব প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবার পর। ভাবমাধ্যমের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানকে সহজ এবং স্বাভাবিক করে তোলার পক্ষে আমাদের দেশের মনীষী ব্যক্তিরা আজও বলে আসছেন। রাধাকান্তের অভিমতটি আজও বিশেষ প্রনিধানযোগ্য—১৩

As soon as the people will begin to reap the fruits of a solid Vernacular education, agricultural and industrial schools may be established in order to qualify the enlightened masses to become useful members of society. Nothing should be guarded against more carefully than the insensible introduction of a system whereby with a smattering knowledge of English, youths are weaned from the plough, the axe and the loom, to render them ambitious only for the clerkship for which hosts would besiege the Government and Mercantile offices.

শিক্ষানীতির প্রসঙ্গে রাধাকান্ত দেবকে প্রগতিশীল মত ও কার্যক্রম পোষণ করতে দেখলেও সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁকে রক্ষণশীল বলে অনেকে মনে করেন। সতীদাহ-নিবারক আইন প্রণয়ন নিয়ে রাধাকান্ত দেবের এই ভূমিকা আমাদের কাছে অস্বস্তির সৃষ্টি করে। বস্তুত এ দুয়ে কোনো বিরোধ আছে কিনা ভেবে দেখা দরকার। তিনি ধর্মবিষয়ে বিদেশী শাসকের হস্তক্ষেপ চান নি। তাই বলে সহমরণ-প্রথাটাই সমর্থনযোগ্য এমন নাও হতে পারে। বিধবাবিবাহ আন্দোলনের সময়েও আইন করে বিধবাবিবাহের প্রচলন তিনি চান নি। এসব বিষয়ে তিনি সমাজের আপন অধিকার রক্ষা করতেই চেয়েছেন। পরিবর্তন কিছু করবার দরকার অনুভব করলে সমাজের ভিতর থেকেই তার তাগিদ আসবে এবং

যথাযোগ্য ব্যবস্থা হবে। এজন্য অবশ্য কুপ্রথা অনির্দিষ্টকালের জন্য সহ্য করে যেতে হয়। রামমোহন বা বিদ্যাসাগর অবশ্যই তা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। আবার সহমরণে যে অনেক সময় নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে অথবা স্বার্থসন্ধী আত্মীয়স্বজনের বলপূর্বক প্রবর্তনা থাকে, সে-সব অন্যায় কার্যের জন্য তাঁদের কঠিন প্রতিবাদ ছিল এই প্রথার বিরুদ্ধে। রাধাকান্ত দেব সম্ভবত ভেবেছিলেন এই অন্যায় দূর করতে হলে হিন্দু সমাজই সামাজিক পদ্ধতিতে এগিয়ে আসবে। বেন্টিঙ্কের কাছে দেওয়া আবেদনে তিনি লিখেছিলেন—১৭

That the Hindoo Religion is founded, like all religions, on usage as will as precept and one when immemorial is held equally sacred with the other. Under the sanction of immemorial usage as well as precepts, Hindoo widows perform, of their own accord and pleasure, and for the benefit of their Husband's souls and for their own, the sacrifice of self-immolation called Suttee—which is not merely a sacred duty but a high privilege to her who sincerely believes in the doctrines of her religion.

এখানে তিনি হিন্দু রমণীর আত্মত্যাগ এবং গৌরবের উল্লেখ করেছেন। আত্মত্যাগ বস্তুটার মধ্যেই মহত্ত্ব আছে। তবে বিচার্য এই যে স্বামীর মৃত্যুতে এভাবে মৃত্যু বরণ করে এভাবে আত্মত্যাগের সত্যই প্রয়োজন আছে কিনা। রবীন্দ্রনাথও একটি লেখাতে সহমরণে আত্মার যে নির্ভীকতা প্রকাশ পায় তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। কিন্তু এ আত্মত্যাগের দ্বারা দেশ সমাজ বা জাতির কী উপকার সাধিত হয়? রাধাকান্ত এখানে দেশাচার এবং শাস্ত্রের উল্লেখ করেছেন আর বলেছেন স্বামীর আত্মার কল্যাণের কথা। এ বিশ্বাস অবশ্যই প্রশ্নাতীত।

প্রথা অনুসরণ করা যুক্তিসঙ্গত কিনা, প্রথার ভালো-মন্দ বিচার শিক্ষা এবং বিবেচনাসাপেক্ষ। রামমোহনের মত শিক্ষিত চেতনায় এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিতে পারে, তারপর আস্তে আস্তে সে-সংশয় সমগ্র সমাজে ব্যাপ্ত হয়ে পড়তে পারে। রাধাকান্ত দেব সমাজের এ-অধিকার মানতেন, কিন্তু যে-রাজা এই সমাজের নয়, তার অধিকারকে মানতেন না। রাধাকান্ত শিক্ষার পথ রুদ্ধ করে সমাজকে ভ্রান্ত পথে চালিত করতে চান নি। বেদপাঠ এবং সংস্কৃত শিক্ষা শুধু ব্রাহ্মণদেরই একমাত্র অধিকার রাধাকান্ত দেব সে-মতে বিশ্বাস করতেন না। শিক্ষার দিকেই তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। শিক্ষা ও শাস্ত্রালোচনার দ্বার তিনি উন্মুক্ত রাখতেই চেয়েছেন। ১৮১৫ রামমোহন রায় আত্মীয় সভা স্থাপন করলেন। সে সভায় 'বেদের উপনিষদ হইতে আপনাদের মতানুযায়ি বাক্য পড়া গেল

ও তাহার অর্থ করা গেল ও তাঁহারা বেদান্তের মতানুসারে গীত গাইলেন।' ১৮২৩-এর ১১ই ফেব্রুয়ারি রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন, প্রসন্নকুমার ঠাকুর দ্বারকানাথ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারিণীচরণ মিত্র প্রভৃতি ব্যক্তিগণ 'গৌড়ীয় সমাজ' স্থাপন করলেন।[১৮] এতে রামমোহনকে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু রক্ষণশীল এবং উদারপন্থী সবাই এতে সম্মিলিত হয়েছেন দেখতে পাই। আত্মীয়সভা ছিল বিশেষ ভাবেই ধর্মালোচনার সভা, কিন্তু গৌড়ীয় সমাজের কর্মসূচী ছিল ব্যাপকতর। এর উদ্দেশ্য ছিল 'জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার, বাংলা ভাষায় গ্রন্থাদির প্রচার, নীতি ও শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন, গ্রন্থাগার গঠন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ'। রাধাকান্ত দেবের আজীবন অনুসৃত কার্যক্রমের সঙ্গে গৌড়ীয় সমাজের কার্যক্রম সম্পূর্ণই মিলে যায়। সম্ভবত এই সভার উদ্যোগেই রাধাকান্ত দেব বেদের আলোচনা এবং অনুবাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।

গৌড়ীয় সমাজ সম্ভবত রামমোহনের আত্মীয়সভার প্রভাবেই গঠিত হয়ে থাকবে। এই সমাজ যদিও মাত্র দু' বছরই চলেছিল, কিন্তু একে ১৮৩০-এ প্রতিষ্ঠিত ধর্মসভার বীজ বলা যেতে পারে। আত্মীয় সভাতে সহমরণের শাস্ত্রীয়তা আলোচনা হত। গৌড়ীয় সমাজে শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমনের চেষ্টা হয়েছে। ধর্মসভা মুখ্যত সহমরণ আইন রোধ করবার জন্যই স্থাপিত হয়েছে। ফলে প্রসন্নকুমার ঠাকুর এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর আর ধর্মসভায় ছিলেন না। দেশে দেশাচার-বিরোধী যে আবহাওয়া রামমোহন তৈরি করে তুলছিলেন, গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্য ছিল সে-সম্বন্ধে যথার্থ শিক্ষা ও আলোচনার সুযোগ তৈরি করা। রাধাকান্ত রামমোহনকে সমর্থন করতেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। তথাপি শাস্ত্রানুসন্ধানের প্রয়োজনকে অস্বীকার করেন নি আবার শুধু ধর্মালোচনাতেই সমাজের লক্ষ্যকে সীমিত করে রাখেন নি।

ধর্মসভার লক্ষ্য ছিল মূলে একটিই—আইনের রোধ। বেন্টিঙ্ক হিন্দু নাগরিকদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করলে বিলাতে আপীল করার যে-পরিকল্পনা হয়, তার ব্যবস্থাদি করার ভারও পড়ে ধর্মসভার উপর। বিলাতের প্রেরিত আবেদনটি রচনা করেছিলেন রাধাকান্ত দেব। কিন্তু সে-আপীল অগ্রাহ্য হয়। তারপরেই ধর্মসভার ভাঙন দেখা দেয়। এই সূত্রেও রাধাকান্ত দেবের ভূমিকাটি লক্ষনীয়। ধর্মসভার মুখ্য কাজ যখন বিফল হল তখন কেউ কেউ এ-সভা ত্যাগ করে সতীদেবীদের সঙ্গে মেলামেশা আরম্ভ করে। ফলে নানা বাদবিতর্ক দোষারোপ ইত্যাদি করে ধর্মসভা বিভক্ত হয়ে যায়। ধর্মসভা তখন বেঁচে থাকতে চাইল শুধু আচার-বিচার অনুশাসন

ইত্যাদি দিয়ে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রামকমল সেন সভার হাস্যকর কলহবিবাদ দেখে প্রস্তাব করেছিলেন এসব বিবরণ প্রকাশ না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তিনি অন্য কর্মসূচী গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে সম্মত হন নি। এই সব বাদ বিতর্কের মধ্যে রাজা রাধাকান্ত দেবের নাম আর দেখি না। সংবাদপত্রে সেকালের কথার ধর্মসভাসম্পর্কিত সংবাদগুলিতে রাধাকান্তর নাম উল্লিখিত হয় নি।

রাধাকান্তের ব্যক্তিত্ব ছিল উচ্চতর। সংকীর্ণ কলহ বিবাদ এবং দলাদলিতে থেকে এই সব ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য দিয়ে ধর্মকে রক্ষা করা যায় না। সতী আইন প্রতিরোধের ব্যর্থতায় তিনি নিরাশ হয়েছিলেন। ধর্ম কি সে-সম্বন্ধে তাঁর জিজ্ঞাসার কথা আমরা জানি না। তাঁর বিশেষ চিন্তার বিষয় ছিল আমাদের সমাজ-শাসনে অন্যের হস্তক্ষেপ। তিনি হিন্দু কলেজের পরিচালনা সভা থেকে পদত্যাগ করেছিলেন—তারও মূল কারণ ছিল এটাই। হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি করতে দেওয়ায় তিনি দেখলেন হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার মৌলিক মর্মের লঙ্ঘন। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার নীতির সঙ্গে এই আচরণ মেলে না বলেই মনে হয়। রাধাকান্ত দেব এই পরিবর্তনকে মেনে নিলেই ভালো হত, কিন্তু মনে হয় তাঁর আসল আপত্তি এই নিয়ে তত ছিল না। উইলসনকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছেন—

On one occasion a serious difference arose between these two bodies on a subject involving the violation of certain fundamental rules of the college which terminated in the retirement of Baboo Prosunnocoomar Thakoor the Governor of the college from his post. On a similar subject after an interchange of many angry minutes between myself and the late President my feelings were so exasperated that I was obliged to dissolve my connection with the institution.

সমাজনেতারূপে রাধাকান্ত দেবকে আর একবার দেখি খ্রীষ্টীয়ধর্মান্তরণের বিরুদ্ধে। হিন্দু কলেজের শিক্ষক কৈলাসচন্দ্র বসু খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হলে হিন্দুসমাজে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের আর একটি ঘটনার কথা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন।[১৮] সে-বছর উমেশচন্দ্র সরকার তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে ডাফ সাহেবের কাছে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা নেয়। এই সংবাদে উত্তেজিত হয়ে দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্তকে দিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখালেন। রাধাকান্ত দেব, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি হিন্দু সমাজের নেতার সঙ্গে নব্যবঙ্গের নেতা একত্র মিলিত হয়ে ব্রাহ্ম নেতা দেবেন্দ্রনাথকে সাহায্য করলেন।

দলাদলি দূর হল। স্থাপিত হল হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়। রাধাকান্ত হলেন তার সভাপতি, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং হরিমোহন সেন হলেন তার সম্পাদক। রাধাকান্ত যে ধর্মসভাপন্থীদের ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে ছিলেন তাঁর ধর্মের ও সমাজের আদর্শ যে ভিন্নতর ছিল এটা তারই প্রমাণ। রাধাকান্ত দেবের কর্ম ও কীর্তি সেকালের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাঁর উদ্দেশ্য সততা নিষ্ঠা সম্বন্ধে কারো সন্দেহ নেই, তবু তিনি একটি ভুল করেছিলেন। যে-সমাজের অধিকার এবং শক্তির উপর তাঁর অবিচল আস্থা ছিল, সে-সমাজ এখন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে পরিবর্তিত। এখন আর পুরণো যুগের সমাজনেতারও কার্যকারিতা নেই। ধর্মকে রক্ষা করে সমাজকে যদি বাঁচাতে হয়, তবে বোধ হয় সর্বমতসহিষ্ণু দেশাচারের শাসনবর্জিত নিখিলগঠন মানবসমাজকেই অবলম্বন করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর উত্তরার্ধে সে-সমাজের আভাস ফুটে উঠতে আরম্ভ করেছে।

সূত্রনির্দেশ

১। Calcutta Review (1867) Life of Raja Radhakanta Deb. pp.7-8

২। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ৩য় সং, পৃ ১১৭

৩। ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সামাজিক প্রবন্ধ, 'পাশ্চাত্য ভাব—রাজার সমাজ প্রতিভূ'।

৪। সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম খণ্ড পৃ ২৩৩-৩৪। সভাতে কেউ কেউ প্রস্তাব করেছিলেন সতীদাহ নিবারণে হেস্টিংসের হস্তক্ষেপ না করার জন্য প্রশংসা করে বাক্য সন্নিবেশিত হক। কিন্তু রসময় দত্ত এবং রামকমল সেন বলেন 'এই ক্রিয়া আমাদের দেশের নিন্দনীয়। অতএব সে কথা ইহাতে বিন্যাস করা কর্তব্য নহে'—এ জন্য সতীদাহের কোন উল্লেখ হয় নি। এই সভার উদ্যোক্তাদের অন্যতম ছিলেন রাধাকান্ত দেব এবং রামকমল সেন। পরে উভয়েই ধর্মসভার কর্মকর্তা হয়েছিলেন।

৫। বস্তুত একথা সুবিদিত যে রামমোহন ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্যই শিক্ষালয় স্থাপন করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু সে পরিকল্পনা মেনে না নিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়েছিল।

দ্রষ্টব্য Peary Chand Mittra, *Biographical Sketch of David Hare*, 1877

৬। David Koff, British Orientalism and Bengal Renaissance. 1969, p. 181

৭। The Days of John Company Ed. Anil Chandra Dasgupta, 1959, p.288

৮। Alexander's East India Magazine, London, June 1831. A. F. Salahuddin Ahmed, *Social Ideas and social change in Bengal*, Leiden 1965 p 41-এ উদ্ধৃত।

৯। A. F Salahuddin Ahmed বেন্টিঙ্কের কাগজপত্র থেকে এই তথ্য জানিয়েছেন। দ্র. পূর্বোক্ত গ্রন্থ পৃ ৪৩-৪৪।

১০। সাহিত্যসাধকচরিতে 'রাধাকান্ত দেব' পৃ ৩৫।

১১। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Proceedings of the Indian Historical Records Commision, 9th session Lucknow 1926-এ Raja Radhakanta Deb's service to the Country নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। তাতে রাধাকান্ত দেব সম্পর্কিত একটি মূল্যবান চিঠি আছে। তার অংশ যোগেশচন্দ্র বাগল 'রাধাকান্ত দেব' (সা-সা-চ) বইতে উদ্ধৃত করেন।

১২। David Koff, *British Orientalism and Bangal Renaissance* 1969, পৃ ১২৫ পাদটীকা। স্কুল বুক সোসাইটি থেকে ১৮৩০-এ প্রকাশিত 'প্রাচীন ইতিহাস সমুচ্চয়' বইটিও রাধাকান্তের লেখা বলে মনে করেন।

১৩। সমাচার দর্পণে (৬ এবং ১৩ এপ্রিল ১৮২২) এই বইয়ের বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, ১ম, পৃ ১৩-১৪।

১৪। বেথুনকে লেখা চিঠির অংশ বিশেষ 'গৌরমোহন বিদ্যালংকার' (সা-সা-চ) বইতে এবং বিস্তৃততর অনুবাদ দেওয়া আছে 'রাধাকান্ত দেব' (সা-সা-চ) বইতে।

১৫। যোগেশচন্দ্র বাগল, বাংলার জনশিক্ষা (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ), পৃ ১৬।

১৬। *Reports on the State of Education in Bengal* by William Adam, (University of Calcutta, 1941), p. 495.

১৭। এই আবেদনটি ১৮৩৫-এর ১৮ই জানুয়ারির ক্যালকাটা গেজেটে বেন্টিঙ্কের উত্তর সহ মুদ্রিত হয়। দ্র. The Days of John Company 1824-1832 Ed. Anil Chandra Dasgupta, 1959, p. 466-471.

১৮। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'রামমোহনের বিপ্লবী ধর্মীয় ও সামাজিক মত প্রতিহত করবার জন্য বর্ণ হিন্দুরা 'গৌড়ীয় সমাজ' গঠন করেছিলেন (৮ মার্চ ১৮২০)।'
রামমোহন ও তাঁহার সমাজ ও সাহিত্য, ১৯৭২, পৃ ৩০৮।

১৯। এ সম্পর্কে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী, ১৩ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

অক্ষয় দত্ত ও উনবিংশ শতকের বাংলার ধর্মচিন্তা

অসিত ভট্টাচার্য

রামমোহন রায় : ধর্ম ও সমাজ চিন্তা

উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মচিন্তার বিবর্তনের ভূমিকা হিসেবে আমরা ইয়োরোপীয় ইতিহাসে ধর্মচিন্তার বিবর্তনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় নিলাম। এতে আমরা দেখি যে, (১) ধর্মচিন্তা, সমাজ-চিন্তার অঙ্গ ও অংশ; (২) সমাজ পরিবর্তনের ফলে ধর্মচিন্তারও বিবর্তন ঘটে, (৩) সংস্কৃতির, তথা বিজ্ঞানের বিকাশের ফলে, সমাজ-বিবর্তনের নিজস্ব সূত্রগুলি মানব-চৈতন্যে গুরুত্ব পায় এবং ধর্মচিন্তা সমাজ-চিন্তার থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে; (৪) ফলে, ধর্মচিন্তার আপেক্ষিক গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং ক্রমেই তা বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির আবেগানুভূতির ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এই সময়েও যাঁরা ধর্মীয় ভিত্তিতে সমাজ-চিন্তার পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন, তাঁরা স্পষ্টত-ই প্রতিক্রিয়ার সমর্থক হয়ে দাঁড়ান।

উনিশ শতকের বাংলায় ধর্মচিন্তার পরিবর্তনে অগ্রগামী হিসেবে অবশ্যই রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা কর্তব্য। যদিও পরলোকগত অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, তাঁর 'যুগগুরু রামমোহন'[২৪] নীর্ষক পুস্তিকায় অষ্টাদশ শতকের কোনো কোনো মানব প্রেমিক হিন্দু ধর্মসাধকের সঙ্গে বিশেষত শিবনারায়ণী[২৫] সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে রামমোহনের সাযুজ্য আবিষ্কারে আগ্রহ প্রদর্শন করেন তবু আমরা এই বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অন্তর্দৃষ্টি প্রমাণ জ্ঞানে উল্লেখ করি :

"ইনি [রামমোহন রায়] সমাজ যে ভাঙিয়াছে তাহা বুঝিয়াছিলেন, সমাজ যে পথে যাইবে, তাহাও বুঝিয়াছিলেন, এবং প্রাণপণে সর্বপ্রযত্নে সমাজকে সেই পথে চালাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন"। [২৬]

রাজা রামমোহন রায় এর ধর্মচিন্তার কালগত ও সামাজিক ভিত্তি সম্পর্কে উপরোক্ত উদ্ধৃতি থেকে আমরা যে আলোক পাই সেইটাই তাঁর ধর্ম-ভাবনার বিচারের উপযুক্ত প্রেক্ষাপট রচনা করে বলে, মনে করি। বস্তুত, মনীষী হরপ্রসাদ উক্ত প্রবন্ধে রামমোহনের যুগকে সংস্কৃতিক বিচারে 'Age of transition' বা 'পরিবর্তন সময়' বলে উল্লেখ করেন এবং রামমোহন রায়কে সেই 'পরিবর্তন সময়'

এর অগ্রগামী ধারার সচেতন নায়ক রূপেই নির্দেশ করেন। এক্ষেত্রে, আমরা যদি মনে করি যে, রামমোহনের ধর্ম-চিন্তা তাঁর সমাজ-ভাবনার একটি অংশ, এবং তাঁর যুগের সমাজ বিশেষভাবে ধর্মনিয়ন্ত্রিত ছিল বলেই তাঁকে বিশেষত ধর্মালোচনায় আত্ম-নিয়োগ করতে হয়েছিল, তাহলে সেইটাই সঠিক সিদ্ধান্ত হবে, মনে হয়। বস্তুত রামমোহনের ধর্ম-সংস্কারের প্রেরণা যে, সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা সঞ্জাত এ-কথা আমি পূর্বেই একটি গ্রন্থে উল্লেখ করি।[২৭] এই মতের স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ সমসাময়িক পত্রাদি থেকে পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত কয়েকটি পত্রের অংশ বিশেষ উল্লেখ করতে চাই।

রামমোহনের প্রভাবে উইলিয়াম এ্যাডাম নামে যে, পাদ্রী একেশ্বরবাদ বা খৃষ্টীয় সূত্র অনুযায়ী 'একত্ববাদ' (unitarianism) গ্রহণ করেন, এবং যে কাজ কোলকাতার তৎকালীন পাদ্রীমহলে অন্তত 'Second fall of Adam', বলে ধিক্কৃত হয়েছিল, সেই এ্যাডাম সাহেব মার্কিণ একেশ্বরবাদী ডাঃ টাকারম্যানকে (Dr. Tuckerman) হিন্দু ও খৃষ্টধর্মের সঙ্গে রামমোহনের সম্পর্কের বিষয়ে ১৮২৬ এর ১৮।২০ ফেব্রুয়ারিতে লিখিত একটি পত্র মারফৎ জানান

"...রামমোহন রায় কি নিজেকে খৃষ্টান বলে স্বীকার করেন ("profess to be a christian")? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার কাছে খুব কঠিন মনে হয়; এ বিষয়ে হুবহু সত্য না হলেও সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি পৌঁছানো যাবে, যদি বলি যে, তিনি [একাধারে] হিন্দু ও খৃষ্টান, দুইই বটে—খৃষ্টানদের মধ্যে খৃষ্টান এবং হিন্দুদের মধ্যে একজন হিন্দু। এবং আমি স্ব-বিরোধিতা করছি কিম্বা ধর্মের ব্যাপারে তিনি কপট (insincere) এ কথা বলার আগে, আপনাকেও, তিনি যে অবস্থায় রয়েছেন, সেটা খোলাখুলিভাবে বিচার করে দেখতে হবে।

প্রথমত তাঁর প্রতিমাপূজা বর্জন চূড়ান্ত, সম্পূর্ণ, প্রকাশ্য ও দ্বিধাহীন; এবং তিনি কি ও কে, এ বিষয়ে আপনি যদি চিন্তা করেন তাহলে, শুধু এইটাই তাঁর ধর্মীয় নীতি ও আচরণের সত্যনিষ্ঠা (integrity) প্রমাণ করবে। কিন্তু তাঁর প্রতিমা-পূজা বর্জন ও ব্রাহ্মণ্য সংরক্ষণ এবং জাতি নিয়ম পালন পরস্পর বিরোধী [কাজ] নয়; দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রয়োজনেই ঘটে, এবং তাঁকে তাঁর স্বদেশবাসীর কাছে লাগাতে হলে এ দুয়েরই প্রয়োজন আছে আর সেইটাই তাঁর হৃদয়ে সর্বাপেক্ষা বড়ো" [২৮]

এরপর ঐ চিঠিতেই এ্যাডাম তাঁর খৃষ্টান না হবার যে সব কারণ উল্লেখ করেছেন সেগুলির সারাংশ নিম্নরূপ: (১) এতে তাঁর সামাজিক প্রভাব

প্রতিপত্তি, সম্পত্তি জাতি মর্যাদা সব যাবে, মিলবে শুধু একটি ফাঁকা নাম। (২) নিম্ন শ্রেণীর যে সব লোককে আগে পর্তুগীজরা ও পরে ইংরেজ মিশনারীরা ধর্মান্তরিত করেছে তাঁকে সেই দলে ভিড়তে হবে। এবং (৩) মুসলমানরা তাঁকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন [কিন্তু] খৃষ্টান হলে তাঁরা তাঁকে ত্রিত্ববাদীদের (Trinitarian) দলে ফেলবেন, কারণ মুসলমানদের চোখে খৃষ্টান মাত্রেই তাই।

দেখা যায় যে, উপরোক্ত তিনটি কারণই সামাজিক। ধর্মীয় কারণ একটিই শুধু চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। রামমোহনের মতে, "হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত অসহিষ্ণুতার প্রতিষেধক হিন্দু ধর্মেই আছে"।[২৯] কিন্তু এটিও সমাজ-সংস্কারকের আবিষ্কৃত সত্য এবং উনিশ শতকের বাঙ্গালী সমাজ সংস্কারকের। কেন, সে বিচারে পরে প্রবৃত্ত হবো।*

যন্ত্রত স্ব-সমাজ থেকে বিচ্যুত হলে, সমাজ-মানসকে সদর্থক ভাবে প্রভাবিত করা সম্ভব নয়, এই রকম একটা ধারণা তাঁর মধ্যে কাজ করছিল বলেই প্রতিমা-পূজা বা প্রতীকোপাসনার এই ঘোর বিরোধী সম্পর্কে উক্ত এ্যাডাম কর্তৃক ঐ ডা: টাকারম্যানকেই লিখিত (তারিখ ২৪ জুন ১৮২৭) আর একটি চিঠিতে দেখি :

"হিন্দু সমাজের বর্তমান অবস্থায় পানাহারের বিষয় যে সব বিধি প্রচলিত রয়েছে তিনি তা পালন করা প্রয়োজন মনে করেন। ব্রাহ্মণদের পক্ষে নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ বা হিন্দু বাতীত অন্য সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে কি অন্য বর্ণ ও জাতির সঙ্গে একত্রে আহার করা তাঁর কখনোই চলে না। জাতি-বর্ণের এই ভগ্নাংশ টুকুই শুধু তিনি এখনও মেনে চলেন কিন্তু আমার জানার কারণ ঘটেছে যে, এটুকু ও তিনি প্রায়ই গোপনে ভঙ্গ করেন।"[৩২]

বস্তুত রামমোহন শুধু ব্রাহ্মণের আচার মেনে চলেছিলেন তাই নয়, তাঁর বেদান্ত গ্রন্থ (১৮১৫) শীর্ষক পুস্তকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন যে তাঁর প্রচারিত বিশুদ্ধ জ্ঞানমূলক একেশ্বরবাদের প্রভাবে জাতিভেদ বাতিল বা রহিত হয়ে

---

*প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে যদিও কলেৎ এর রামমোহন জীবনীর বর্তমান সম্পাদকদ্বয় (বিশ্বাস ও গাঙ্গুলী) এ্যাডামের মনস্তাকে অর্থাৎ প্রতিমা পূজা বর্জন করলে খৃষ্টান হতে হবে, এই বিশ্বাসকে 'অদ্ভুত' বলে বিবেচনা করেছেন[৩০]। তবু এ্যাডাম স্বয়ং ঐ পত্রের শেষে উল্লেখ করেন : "উপরোক্ত প্যারাগুলি লেখার পর ঐ লেখা রামমোহন রায়কে দেখানোর সুযোগ আমার ঘটে। তিনি এটিকে তাঁর নিজ ভাব ও অনুভূতির সঠিক বর্ণনা বলে বিবেচনা করেন"।[৩১]

যাবে না।[৩৩] অথচ একথা মনে করার কারণ আছে যে, তাঁর একেশ্বরবাদ প্রচারের অন্যতম লক্ষ্যই ছিল বহুধা-বিভক্ত হিন্দু সমাজকে একটা সংহতির মধ্যে আনা-স্পষ্টত জাতিভেদ দূর করা। বস্তুত 'পথ্য প্রদান' পুস্তিকায় তিনি স্পষ্টত-ই বলেন : "জ্ঞানাধিকারে বর্ণাশ্রমাচারের অপেক্ষা নাই।"[৩৪] তবু, আচার পালনের জন্য, নৈতিক তথা ধর্মীয় কারণে, ইয়ং বেঙ্গলের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অনেকে-ই রামমোহনের সমালোচনা করেছেন। তাঁদের কাছে এটা কপটাচার মনে হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের যুগের সামগ্রিক সামাজিক পরিস্থিতি ও তাঁর সামাজিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য স্মরণে রাখলে তাঁর জন্যে দুঃখ হয়। এক্ষেত্রে তাঁর প্রয়োজন বোধটাই বিশেষত বিচার্য মনে করি।

যাই হোক, রামমোহনের মৌল লক্ষ্য সম্বন্ধে এ্যাডামের সাক্ষ্য ছাড়াও স্বয়ং রামমোহনের সাক্ষ্যই অধিকতর প্রামাণ্য হবে। রামমোহন, উক্ত ডাঃ টাকার-মানকে ১৮ জানুয়ারি ১৮২৮-এ, একটি চিঠিতে লেখেন :

"আমি এ বিষয়ে একমত যে পাপাচারের বিচার করলে, হিন্দুরা ইয়োরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান সাধারণের থেকে খারাপ কিছু নয়; কিন্তু এ-কথা আমায় দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে, বর্তমানে হিন্দুরা যে ধর্মাচারণ পদ্ধতি আঁকড়ে আছে তা তাদের রাজনৈতিক স্বার্থের অনুকূল নয়। জাতি ও বর্ণভেদ—যা হিন্দুদের মধ্যে অজস্র ভেদ-বিভেদ সৃষ্টি করেছে—তা তাদের সম্পূর্ণ ভাবে দেশপ্রেম থেকে বঞ্চিত করেছে। ধর্মাচরণ ও অনুষ্ঠানের বাহুল্য এবং শুদ্ধির নিয়ম কানুন তাদের যে কোনো দুরূহ উদ্যোগের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত করে ফেলেছে...। আমার মনে হয় যে [হিন্দুদের] রাজনৈতিক সুবিধা ও সামাজিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে ও তাদের ধর্মে কিছু পরিবর্তন হওয়া দরকার। আমি এ বিষয়ে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, যীশু যে নীতি শিক্ষা দিয়েছেন তার চেয়ে মহৎ কিছু নেই।"[৩৫]

রামমোহনের জীবনীকার কলেট উল্লেখ করেন যে "এর পর [ঐ চিঠিতে] খৃষ্টানরা কি ভাবে তাকে [খৃষ্টের নীতি] অগ্রাহ্য ও বিকৃত করেছে তার জন্যে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং আশা প্রকাশ করেন যে জ্ঞানানুসন্ধান ও মানবতার ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ফলে [এর] পরিবর্তন আসবে।"[৩৬]

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, রামমোহন যে ধর্মান্দোলনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন তার একটি প্রধান প্রেরণা ছিল সামাজিক। আমাদের পূর্ব্ব প্রস্তাবিত ভাব-ভিত্তি স্মরণে রাখলে সহজে ই বোঝা যায় যে, সমাজ-বিকাশের প্রাথমিক স্তরে, দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমাজ ও ধর্মচিন্তার মধ্যে পার্থক্য নির্দিষ্ট হয় না, কারণ ধর্ম-ই

সমাজ-কাঠামোর ভিত্তি রূপে স্বীকৃত হয়। রামমোহনের সমাজ চিন্তা ও ধর্ম চিন্তা তাই ওতপ্রোত। রামমোহনের যুগে এ-দেশের সমাজ সম্পূর্ণ ধর্মশাসিত ছিল। (বস্তুত এখনও অনেকাংশে তাই আছে)। রামমোহনকে তাই দেশের সমাজ-ব্যবস্থার সমালোচনা-করে দেশের ধর্ম-ব্যবস্থার সমালোচনা দিয়েই শুরু করতে হয়েছিল।

প্রসঙ্গত আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের প্রচারিত ধর্ম বা ধর্মমত খৃষ্টধর্মের কতোটা নিকটবর্তী এবং রামমোহন কেন খৃষ্টান হন নি, সে-বিষয়ে তাঁর যুগে পাদ্রীদের দ্বারা এবং উনিশশতকের শেষভাগে, কেশবচন্দ্রের প্রভাবে; অন্য অনেকের দ্বারা অনেক আলোচনা হয়েছে। অথচ তাঁর প্রচারিত একেশ্বরবাদের শিক্ষা তিনি ইসলামের তৌহিদবাদ থেকেই গ্রহণ করে ছিলেন একথা বিশ্বাস করার কারণ আছে। মুসলিম সমাজের চোখে হেয় হওয়াটা যে যে তাঁর বিচারে একটা শোচনীয় ব্যাপার ছিল, এ্যাডামের পূর্বোদ্ধৃত একটি পত্র থেকে তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি। তবু তার প্রচারিত ধর্মমতের সঙ্গে ইসলামের সাযুজ্য ও পার্থক্যের বিষয়েও তেমন কোনো আলোচনা হয় না।[৩৭]

অথচ রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন যে, "তিনি পিতৃগৃহেই পারস্যভাষা শিক্ষা আরম্ভ করেন; কিন্তু উক্ত ভাষায় বিশেষ উন্নতি ও আরবী শিক্ষার জন্য নবম বৎসর বয়সে রামকান্ত রায় তাঁহাকে পাটনায় প্রেরণ করেন। তিনি তথায় দুই তিন বৎসর অবস্থিতি করিয়া আরবী ভাষায় ইউক্লিড ও আরিস্টটলের গ্রন্থ পাঠ করেন।...

...এমনও বোধ হয় যে, আরবী ভাষায় কোরাণ পাঠজন্য ও মুসলমান মৌলবী দিগের সংস্পর্শে আসাতে তাঁহার মনে এই সময়েই একেশ্বরবাদের ভাব প্রথমে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।"[৩৮]

রামমোহন পাটনায় কতো বছর ছিলেন অথবা ছিলেন না, এবং পার্শী বা আরবী তিনি কোথায় শিখেছিলেন, এ সব বিষয়ে প্রামাণিক সত্য কি, তা নিয়ে যতোই তর্ক থাক পার্শী ও আরবী যে তিনি গভীর ভাবে শেখে নএটা সত্য এবং ইসলামের একেশ্বরবাদ বা তৌহিদ যে তাঁর চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, তার প্রমাণ—তাঁর প্রথম প্রকাশিত রচনা (১৮০৩) 'তুহফাৎ উল মুয়াহহিদীন'[৩৯] বা 'একেশ্বর বাদীদের প্রতি উপহার'। একেশ্বরবাদে তার ঐকান্তিক আস্থা এই পুস্তিকার ছত্রে ছত্রে ফুটে ওঠে। এ বিষয়ে কয়েক বৎসর পূর্বে যে আলোচনা করি, প্রাসঙ্গিক জ্ঞানে, তার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হোল:

"গ্রন্থপাঠে বোঝা যায় যে, রামমোহন তাঁর পৈত্রিক ধর্ম-বিশ্বাসে বেশ কিছুকাল আস্থা হারিয়েছেন। তিনি স্বয়ং একেশ্বরবাদী। অন্যান্য একেশ্বরবাদীদের উদ্দেশে একেশ্বরবাদী হিসেবে সংশোধিত ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাকল্পে আপন বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি। তাঁর উদ্দিষ্ট একেশ্বরবাদীরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী বলে মনে হয়। বস্তুত, তুহফাৎ পাঠে স্পষ্ট হয় যে, ইসলাম ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত বা মৌলানাদের তিনি ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় একান্ত অভ্যস্ত। ইসলামের ধর্মীয় আদর্শ ও চিন্তার দ্বারা তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। এতদ সত্ত্বেও এই ব্রাহ্মণ-তনয় কেন যে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন নি [পাঞ্জাবের প্রসিদ্ধ উর্দু কবি স্যার মহম্মদ ইকবালের পিতামহের মতো] তা-ও ঐ এক-ই তুহফাৎ পাঠে বোঝা যায়।

"স্পষ্টই দেখা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূলে চিন্তার যে কাঠামো রয়েছে, ধর্মকে ঘিরে যে অনুশাসন ও ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে, সেইটাই তিনি মানতে পারছেন না। তাঁর কাছে নিজের যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে ধর্মকে যাচাই করার অধিকার—অপরিহার্য মানবিক অধিকার বলেই মনে হয়েছে। এই বিচার বুদ্ধিকেই তিনি মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ ও ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠদান বলে বিবেচনা করেছেন। তুহফাৎ এ উল্লেখিত হয়েছে :

"প্রত্যেক মানুষকে যে ঈশ্বর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়েছেন, তার মধ্যে এই ভাব নিহিত যে, অন্য নিম্নস্তরের জীবের মতো স্ব-জাতীয়ের দৃষ্টান্ত-এর চরম অনুকরণ করা তার উচিত নয়। পরন্তু নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালোমন্দ এরূপ বিচার করা চাই যাতে ঈশ্বর দত্ত এই মহামূল্য দান যেন অকেজো করে ফেলা না হয়।"[৬]

বস্তুত তিনি যে শুধু ধর্মের interpretation এর বা ব্যাখ্যার স্বাধীনতা বা ইজতিহাদ (Ijtihad) চাইছিলেন তাই নয়, স্বীয় জীবিতকালে 'জবরদস্ত মৌলবী' রূপে খ্যাত, ব্রহ্মধর্মমতের এই প্রতিষ্ঠাতা, শুধু একজন মুজতাহিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন, নতুন যুগের জিজ্ঞাসু সত্যতার অনুরাগী একজন আধুনিক মানুষ।

তিনি দাবী করেছিলেন,—অন্তত : প্রতিষ্ঠিত ধর্মের শাসনের সামনে দাঁড়িয়ে দাবী করেছিলেন বুদ্ধির মুক্তি। তাই তিনি তুহফাৎ এই জোর দিচ্ছিলেন বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারালব্ধ জ্ঞানের ওপর, যেটা তাঁর কাছে সদর্থক জ্ঞান বা positive knowledge বলেই প্রতিভাত হয়েছিল। (আর চিন্তার এই বিশেষ লক্ষণই বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা করে)

তুহফাতে তাকে বলতে দেখি :

"প্রাচীন ধর্ম সম্প্রদায়ের নেতাদের অতি-মানবীয় ক্ষমতা অনেকদিন আগের ব্যাপার বলে, বহিরিন্দ্রিয়ের জ্ঞান দিয়ে [তা] প্রমাণ করা অসম্ভব, এবং আমি মনে করি যে, বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এই বহিরিন্দ্রিয়ের [দ্বারালব্ধ] জ্ঞান-ই অনেকটা নিশ্চিত জ্ঞান।"[৪০]

এবং আরো স্পষ্টতঃ

"যে বস্তু যুক্তির বহুদূরে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রতিকূল এমন বস্তুর বর্তমানতায় [অস্তিত্বে] বিশ্বাস যে কোনো বুদ্ধিমান লোকের পক্ষেই অসম্ভব"।[৪১]

বস্তুত আমার প্রাগুক্ত আলোচনায় পূর্বেই উল্লেখ করি যে "রামমোহন ইসলামের একেশ্বরবাদ গ্রহণ করলেও মুসলমানত্ব তাঁর কাছে গ্রহণীয় হয়নি, কারণ তাঁর মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো একেশ্বর বাদে-ও কিম্বদন্তী[৪২] (তাওয়াতুর) অলৌকিকতা, ঈশ্বরের নামে অসমর্থনীয় কাজের নির্দেশ ইত্যাদি রয়ে গেছে। বস্তুত ইজমা ও লোকমত তাঁর কাছে একই কারণে মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিচার শক্তির বিরোধী বলে পরিত্যাজ্য বিবেচিত হয়"।[৪৩]

আমরা দেখেছি যে রামমোহন ধর্ম বিশ্বাসে সমসাময়িক হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলে-ও, স্বীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক দায়িত্ববোধবশত হিন্দু-সমাজ থেকে বিচ্যুত হতে চান নি। বস্তুত তাঁর ধর্ম সংস্কারের প্রেরণাও এসেছিল বহুলাংশে সমাজ-সংস্কারের প্রেরণা থেকে। তাঁর ধর্ম বিশ্বাস ইসলামের একেশ্বরবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত এমনকি গঠিত হয়েছিল। খৃষ্টীয় ত্রিত্ববাদ তিনি শুধু বিশ্বাস করেন নি তাই নয়, একেবারে সহ্য-ই করতে পারেন নি।

একেশ্বরবাদ তাঁর মনে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হবার পর এবং প্রধানত কোম্পানির কাগজ ও তেজারতির কারবারে বিত্ত সঞ্চয় করার পর এবং তার-ই ভিত্তিতে লাভজনক জমিদারী ক্রয় করে, তিনি ১৮১৪ থেকে কোলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন এবং ১৮৩০ -এর নভেম্বরে ইংলণ্ড যাত্রার পূর্ব পর্যন্ত এই শহরে থেকেই তাঁর সমাজ-সংস্কার, ধর্মসংস্কার এবং ভাষাপ্রকরণ রচনার কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। এক্ষেত্রে ধর্ম সংস্কার যে তাঁর সমাজ-সংস্কারের পরিপূরক হিসেবে, তৎকালীন দৃষ্টিতে অবশ্য ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে, তার বহু প্রমাণ বর্তমান।

প্রথমত দেখি যে, অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রে একেশ্বরবাদের বহু ঘোষণা ও প্রামাণ্য

উল্লেখ সত্ত্বে-ও এবং যীশুর জীবনী সম্পর্কিত অলৌকিক অংশবাদে তাঁর precepts বা নীতিতে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হওয়া সত্ত্বেও, তিনি বিশেষত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে বেদান্ত শাস্ত্র থেকে মহানির্বাণ তন্ত্র পর্যন্ত হিন্দু ধর্মশাস্ত্র থেকে একেশ্বরবাদের সমর্থক শ্লোক সংগ্রহ করে, উক্ত মতবাদ যে হিন্দু ধর্মসঙ্গত এই প্রমাণে আত্মনিয়োগ করেন। এই প্রেরণা সামাজিক। আমাদের উক্ত ধারণার আরো একটি বিশেষ কারণ এই যে, তিনি একেশ্বরবাদের ভিত্তিতে একদিকে যেমন সকল একেশ্বরবাদীকে মিলিত করতে চেয়েছিলেন, অন্যদিকে হিন্দুসমাজে যাতে একেশ্বরবাদের প্রভাব বিশেষত বিস্তৃত হয়, ক্রমে সেই দিকে-ই তাঁর উদ্যম বিশেষত নিয়োজিত হয়। ১৮২১ এর ইউনিটারিয়ান কমিটি—যাতে বিদেশীদের, বিশেষত পাদ্রীদের প্রভাব-ই ছিল প্রবল—তার থেকে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন (২০ আগস্ট ১৮২৮) করা হয়েছিল, বিশেষভাবে স্বদেশীয় ও স্ব-সমাজের ব্যক্তিদের মধ্যে একেশ্বরবাদের প্রভাব সঞ্চারের উদ্দেশে। এর প্রমাণ তাঁর জীবনীতে অবিসম্বাদিত রূপেই পাওয়া যায়।[৫৪] এদেশে বিদেশাগত খৃষ্টান পাদ্রীদের একাংশ যে এই হিন্দু ভারতীয় একেশ্বরবাদ গঠনের প্রয়াসকে খুশীমনে গ্রহণ করতে পারেন নি, তারও প্রমাণ তাঁর জীবনীতে-ই মেলে।

এই প্রসঙ্গে আরো একটি কথা বিশেষত আলোচ্য মনে করি। রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার দ্বারা হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের মতো আর একটি নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টি করতে চান নি। বরং একই ধর্ম-সামাজিক মতাবলম্বী একটি গোষ্ঠী বা আধুনিক ভাষায় দল গঠনই তাঁর লক্ষ্য ছিল মনে হয়। ব্রাহ্ম সমাজের উপাসনা রীতি সম্পর্কে স্বয়ং রামমোহনের দলিলের ভিত্তিতেই তাই ব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিম্নোক্ত উক্তি সত্য বলে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য।

"রামমোহনের "ব্রাহ্ম সমাজ" কোনোদিনই একটি বিশিষ্ট ধর্ম সম্প্রদায় ছিল না—ইহা বিশেষভাবে স্মরণীয়।"[৫৫]

কারণ তাঁর দলিল অনুযায়ী :

' তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, আদি অন্ত রহিত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয়, পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোনো সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে আসিবেন, তাহার ই জন্য জাতি, ধর্ম-সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে।"[৫৬]

এরপরেও রামমোহনের ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা (২০ আগস্ট ১৮২৮) সম্পর্কে কলেৎ যদি বলেন...Then the native theistic church of modern India was born [৫৭]...(তখনই আধুনিক ভারতে প্রথম দেশজ ঈশ্বরবাদী চার্চ-এর প্রতিষ্ঠা হোল) তখন আমরা সেই উক্তিকে ভুল বলে নির্দেশ করবো কিন্তু বিস্মিত হবো না। কারণ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দূর থেকে বহু গ্রন্থাদি পাঠ করে, কিন্তু ভারতীয় পরিবেশ ও পরিপ্রেক্ষিত সম্পর্কে অপরিচিত থেকে, ভারতীয় সভ্যতা এমনকি রাজনীতি সম্পর্কে ভুল বলার ঐতিহ্য কলেৎ এই শুরু বা শেষ নয়। রজনী পাম দত্তের India To day (বম্বে, ১৯৪৭) পর্যন্ত তা অব্যাহত আছে।[৫৮]

কিন্তু কলেতের উক্তি ভুল এবং চিন্তা শৈথিল্যের পরিচায়ক। কারণ Corpus Christi-র ধারণা ব্যতীত—অর্থাৎ সমগ্র খৃষ্টান-মণ্ডলীকে চার্চের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং চার্চকে খৃষ্টের-ই দেহ, এই ধারণা ব্যতীত—কোনদিন চার্চ গঠিত হয় নি এবং চার্চের ইতিহাস ও প্রকৃতি স্মরণে রাখলে, মনে হয় না যে, তা হতে পারে। যাই হোক কলেৎ তাঁর নিজ দেশ ও সামাজিক ইতিহাসের পটভূমিকায় দাঁড়িয়ে যে ভুলই করে থাকুন, তাতে বিস্মিত হবার কারণ নেই। বিস্মিত হবার কারণ ঘটে যখন দেখি যে, তাঁর গ্রন্থের সাম্প্রতিক স্বদেশীয় সংস্করণের সম্পাদক যুগল (বিশ্বাস ও গাঙ্গুলী) সেই ভুলকেই অবলম্বন করেন। যে ব্রাহ্ম সমাজ মূলত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং কিয়দংশে কেশবচন্দ্র সেনের সৃষ্টি সেই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বসাধারনের জন্যে উন্মুক্ত, যুক্তিবাদী একেশ্বরবাদীদের উপাসনার কেন্দ্র স্বরূপ ব্রাহ্ম সমাজকে তাঁরা একাকার করতে আগ্রহী কারণ রামমোহন ও, 'ব্রাহ্ম সমাজ' এই সমাসবদ্ধ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বিশেষত রামমোহন যে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এতেই তাঁরা উৎসাহিত বোধ করেন। তাঁদের বিশ্বাসের ভিত্তি এই যে, রামমোহনের যুগেও ব্রাহ্ম-সমাজ এই শব্দের মধ্যে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। হয়েছিল, তা ঠিক, কিন্তু কি অর্থে ?

এই প্রশ্নের বিচার দূরে থাক প্রশ্নটি তাঁরা উত্থাপন পর্যন্ত করেন নি। ব্রাহ্ম সমাজও ব্রাহ্ম সভা যে একই অর্থে সে যুগে ব্যবহৃত হয়, তা তাঁরাও মানেন। সে কথা বাদ দিয়ে ও আমরা বাংলা ভাষায়, মানব জাতি, গো-জাতি, স্ত্রী-জাতি কলাসী বা বাঙালী জাতি ইত্যাদি শব্দের মধ্যে নানা অর্থে জাতি শব্দটির ব্যবহার করি। এই বিভিন্ন অর্থের স্বাতন্ত্র্য বুঝতে হলে, Species, Sex, nation ও

nationality, ইত্যাদি বিভিন্ন ইংরেজী শব্দের আশ্রয় নিতে হয়। অনুরূপ, রামমোহন ব্রাহ্মসমাজ শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন বলে একথা মনে করার কারণ নেই, যে, তিনি পরবর্তী অর্থে ব্রাহ্মসমাজের ধারণাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি দেবেন্দ্রনাথের মতো এই সমাজের জন্যে কোনো সুনির্দিষ্ট ধর্মাচরণ বিধি ও অনুষ্ঠানপদ্ধতি প্রণয়ন করতে অগ্রসর হননি—অথচ তা করার মতো শাস্ত্রজ্ঞান তাঁর অবশ্যই ছিল। কেশবচন্দ্রের মতো স্বীয় সমাজের জন্য স্বতন্ত্র বিবাহ-বিধি প্রণয়ন করার চেষ্টাও তিনি করেন নি, অথবা তাঁর সমাজের অধিবেশনে কেবলমাত্র গৃহীত সদস্য ব্যতীত অন্যদের প্রবেশ পথও তিনি রুদ্ধ করেন নি। বস্তুত এক্ষেত্রে তাঁর দলিলের নির্দেশ যে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল তা আমরা দেখেছি।

এ বিষয়ে অধিক বাক্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। বস্তুত আমাদের আলোচনার তত্ত্ব ভিত্তি স্মরণে রাখলে এই কথাই মনে হয় যে, সপ্তদশ শতকের অনেক ইয়োরোপীয় মনীষী যে দোটানায় পড়ে ছিলেন রামমোহন ও তার মধ্যেই পড়েন। তিনি যুক্তিবাদী ও যুক্তিভিত্তিক একেশ্বরবাদী। তাঁর প্রতিপক্ষ পাদ্রীরা যে, তাঁকে Deist বলেছিলেন এবং তা যে অযথার্থ হয়নি; তা আমরা অচিরেই দেখব। তাই তিনি বেদান্তের অনুবাদক হলেও (বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫) বেদান্ত-দর্শনে শ্রদ্ধাশীল নন (লর্ড আমহার্স্টকে শিক্ষা-বিষয়ক পত্র ১১ ডিসেম্বর ১৮২৩); তান্ত্রিক না হয়ে ও মহানির্বাণতন্ত্র থেকে ব্রহ্মবাদ চয়নে দ্বিধাহীন মুসলমানদের মধ্যে 'জবরদস্ত মৌলভী' এবং যীশুখৃষ্টের নীতির অনুরাগী কিন্তু বাইবলে অবিশ্বাসী।

আমাদের বক্তব্য সংক্ষেপে উপস্থিত করি। সমাজ পরিবর্তনের প্রেরণাতেই রামমোহন মূলত ধর্ম-সংস্কারে ব্রতী হন। বস্তুত এই মত কেবলমাত্র বর্তমান লেখকের নয়, আচার্য শিবনাথশাস্ত্রী তাঁর ইংরেজিতেলিখিত 'ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাস' (*History of the Brahmo Samaj*, Calcutta 1919) গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ করেন।[৩৯] আমরা আরো উল্লেখ করেছি যে, প্রচলিত কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমত তিনি গ্রহণ করতে পারেন নি অথচ সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে হিন্দু সমাজের সঙ্গে সম্পর্কত্যাগও করেন নি; এবং নিজের বিশ্বাসের বিরুদ্ধে গেলেও কিছু কিছু বর্ণাচার অন্তত প্রকাশ্যে মেনে চলেছিলেন। এর জন্যে ইয়ং-বেঙ্গল গোষ্ঠির সমালোচনা ভাজনও হতে হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু আমরা দেখেছি যে, তিনি নতুন কোনো ধর্ম-সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি, বরং তার 'সমাজ'-এর দলিলে স্পষ্টত যে নির্দেশ দিতে চান তার তাৎপর্য এই দাঁড়ায় যে, তিনি সকল ধর্ম-সম্প্রদায়ের

মধ্যে থেকে শুদ্ধমাত্রএকেশ্বর বিষয়ক বিশ্বাসের বশবর্তী একটি দল গঠন করতে চেয়েছিলেন। কোনো অযোঘ ঈশ্বরাদেশ বা অভ্রান্ত শাস্ত্র তাঁর কাছে প্রামাণ্য ছিল না—প্রথমাবধি তাঁর কাছে যুক্তিই ছিল প্রামাণ্য। এ বিষয়ে তাঁর মত ছিল সপ্তদশশতকের ইংরেজ দার্শনিক John Locke-এর অত্যন্ত নিকটবর্তী। কারণ সুকঠিন খৃষ্টীয় ঐতিহ্যের মুখোমুখী হয়ে লক্ বলেছিলেন: "যা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক উদঘাটিত (revealed) তা অবশ্যই সত্য। সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ-ই করা যায় না। এই হলো ধর্ম-বিশ্বাসের প্রকৃত ক্ষেত্র। কিন্তু কোনো কিছু সত্যই সত্যই দৈবোদ্ভাসন (divine revelation) কি না, একমাত্র যুক্তিই তা বিচার করতে পারে।"[৫০] অথবা আরো স্পষ্টত: "কোনো প্রস্তাব (proposition) দৈবোদ্ভাসন হিসেবে গৃহীত হতে পারে না, অথবা, তদুপযুক্ত স্বীকৃতি পেতে পারে না যদি তা আমাদের সুস্পষ্ট অন্তরস্থিত সত্যোপলব্ধির বিরোধী হয়"।[৫১]

এই চিন্তার ফল দাঁড়ায় এই যে, অচিরে দৈবোদ্ভাসনের প্রয়োজনীয়তা-ই মূল্য হীন হয়ে পড়ে। কারণ যুক্তি এবং তার ভিত্তিতে গঠিত স্বীয় উপলব্ধি যদি দৈবোদ্ভাসনের বিচারক হয়ে বসে, তাহলে, ঈশ্বরবাক্য বলে প্রচারিত শাস্ত্রের মহিমাও লোপ পায়। যুক্তি দিয়েই যদি সকল সত্যের বিচার করতে হয় তাহলে দৈবোদ্ভাসনের প্রয়োজনীয়তাই বা থাকে কেন? কোথায় থাকে?

সপ্তদশশতকের ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক পটভূমিকায় প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক Basil Wiley-র নিম্নোক্ত মন্তব্য এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী।

"আমরা যা ইতিমধ্যেই জানি, তা [নতুন করে] বলার জন্যে দৈবোদ্ভাসনের প্রয়োজন নেই; আর সেটা (দৈবোদ্ভাসন) যখন আমাদের জ্ঞাত সত্যের বিরোধী হয়, তখন আমরা তা খারিজ করে দিতে বাধ্য হই।"[৫২]

আমরা দেখব যে, পরবর্তী কালে অক্ষয় দত্ত ও এই সমস্যার সম্মুখীন হন এবং ঈশ্বরবাদকে রক্ষা করতে সমর্থ হন নি।

সমাজ-পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা কি, এবিষয়ে রামমোহনের মতামত সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করার পূর্বে একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। খ্যাতনামা আদর্শ-বাদী সমাজতন্ত্রী (Utopian Socialist) ব্রিটেনের রবার্ট ওয়েন এর (Robert Owen-এর) পুত্র রবার্ট ডেল ওয়েন কে (Robert Dale Owen) ইংলণ্ডে থাকা-কালীন ১৮৩৩-এর ১৯ এপ্রিলে, রামমোহন যে চিঠি দেন, তাতেই দেখি যে, ধর্ম সংস্কার যে সমাজ-সংস্কারের জন্য অপরিহার্য এটাই তাঁর স্থিরমত এবং সমাজতন্ত্রী ওয়েন (Owen) যে, তা স্বীকার করেন না, এতে তিনি বিস্মিত। তাঁর বক্তব্য:

কই লক ও নিউটন তো এ-ভাবে ভাবেন নি। স্পষ্টতই এ চিঠি থেকে দেখতে পাই যে, বহু চেষ্টায় ইয়োরোপের সপ্তদশ শতকে উপনীত একজন মানুষ বৈজ্ঞানিক সভ্যতায় অগ্রগামী ও গতিশীল ইয়োরোপীয় উনিশ শতকের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে আছেন ও সমাজ-পরিবর্তনের প্রকরণ ও পদ্ধতি যে, সেই সমাজে ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, তা কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না। বুঝতেই পারছেন না, যে, ইতিমধ্যে ফরাসী-বিপ্লব ঘটে গেছে এবং ধর্ম-সংস্কার কেবলমাত্র নিম্ন-শ্রেণীকে সন্তুষ্ট রেখে, বিত্তবানদের সন্তুষ্টি ও সামাজিক নিরাপত্তাবিধানে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জি. এম. ট্রেভেলিয়ান (G. M. Trevoleyan) তাঁর ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কিত বহুখ্যাত গ্রন্থে যাঁদের 'উপভোক্তা শ্রেণীগোষ্টি' (enjoying classes) বলেছেন, অষ্টাদশ শতকের সামাজিক জীবনে তাঁদের ধর্মমত ও আচরণ মোটামুটি ভাবে শিথিল-ই ছিল, এই কথা উল্লেখ করে, অষ্টাদশ শতকের অন্তিম পর্যায় সম্বন্ধে জানান :

"কিন্তু ঐ সব শ্রেণীগুলি যখন দেখলেন যে, তাঁদের বিশেষ সুবিধা ও সম্পত্তি [ইংলিশ] চ্যানেলের ওপার থেকে আগত বিপ্লবী মতাদর্শের (Jacobin doctrines) দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে তখন ফরাসী 'নাস্তিকতা ও ঈশ্বরবাদ' [(deism)* এর বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরাগের প্রভাবে ভদ্রলোকদের মনোমানসে বৃহত্তর একটি গাম্ভীর্যবোধের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত হলো। ধর্ম সম্পর্কে ঔদাসীন্য এবং শৈথিল্য এখন দেশ-দ্রোহিতা এবং রাজদ্রোহিতা বলে প্রতিভাত হলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আচরণেও একটা পরিবর্তন ঘটল [উত্তরণ হলো] স্বেচ্ছাচারিতা এবং স্ফূর্তিবাজী থেকে ভণ্ডামি অথবা পুণ্যময়তায়। বণিক ও ব্যবসায়ীদের ঘর থেকে জমিদার বাড়ির খাসকামরা পর্যন্ত পারিবারিক প্রার্থনা ছড়িয়ে পড়ল। 'রবিবার পালন' পুনরুজ্জীবিত হলো। ১৭৯৮-এর Annual Register লিখ্‌ল যে, 'ইংলণ্ডের সর্বত্র গীর্জার সামনে সমস্ত রাস্তা জুড়িগাড়িতে ভরে যেতে দেখে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তাজ্জব বনে গেল। এই নতুন দৃশ্য দেখে সরল গ্রামবাসীরা প্রশ্ন করতে লাগল, ব্যাপারটা কি' ?"[৩]

এই যেখানে ধর্মাচরণের সাধারণ সামাজিক পটভূমিকা, নারী ও শিশুরা পর্যন্ত, শিল্প-বিপ্লবের প্রভাবে দিনে বারো ঘণ্টা খাটছে, খনির অভ্যন্তরে নারী-শ্রমিকরা প্রায় নগ্নদেহে পশুর মতো কয়লার গাড়ি টানছে, রাশি রাশি মানুষ গ্রাম থেকে

*deism বা বিচার মূলক ঈশ্বরবাদ নাস্তিকতার সমপর্যায়ভুক্ত হলো।

ভূমিচ্যুত হয়ে অকস্মাৎ শহরে এসে পড়ায় বাসস্থানের অভাবে ও অতিশ্রমের পীড়নে তাদের পারিবারিক জীবন ভেঙ্গে পড়ছে এবং তাদের শান্তি ও সান্ত্বনার জন্য Wesley-র প্রচারিত Methodism-এর উদ্ভাবনা ও ব্যবসায়ীদের সৃষ্ট বিরাট আলোকোজ্জ্বল শুঁড়িখানা বা gin palace ছাড়া আর কিছুই নেই (যা উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও দস্তয়েভ্স্কী ইংলণ্ড ভ্রমণকালে লক্ষ্য করেছিলেন) এবং শ্রমিক সংগঠন বিরোধী আইন বা Anti-Combination Law-এর প্রভাবে ১৮২৪-৫ পর্যন্ত সাধারণ ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন পর্যন্ত রাজদ্বারে ষড়যন্ত্র বলে শাস্তির স্বীকার হচ্ছে, সেই পরিস্থিতিতে যখন established church (বা সরকার সমর্থিত গীর্জা ব্যবস্থা) অভিজাত শ্রেণীর এবং তাদের আওতামুক্ত বিভিন্ন ধর্মসংঘ বা non-conformist denomination গুলি মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের বিবেকের ওপর বিবিধ আধ্যাত্মিক মলম লাগাতে ব্যস্ত, তখন, সেই পরিস্থিতিতে, সে-সম্পর্কে অনভিজ্ঞ দুরাগত রামমোহন, সমাজতন্ত্রী ওয়েনের পুত্রকে লিখলেন

"...আশা করি আপনি একমত হবেন যে,...ইংলণ্ড ও আমেরিকার অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক কল্যাণ বৃদ্ধির জন্যে (promotion) ধর্মের বিরোধিতা করার দরকার নেই, বিশেষত এমন এক ধর্মব্যবস্থার, যা সর্বাঙ্গীন প্রেম ও দয়ার ভিত্তিতে গঠিত! লক্ ও নিউটনের মতো লোক হিতৈষীরা কি ধর্মের বিরোধিতা করেছিলেন? না! বরং তাঁরা ধর্মের মধ্যে ক্রমে যে সব বিকৃতি প্রবেশ করে, সেগুলি দূর করার চেষ্টা করেছিলেন। উপস্থিত মতো যদি মেনেও নিই যে, স্বাধীনচিন্তার অনুগামীদের পক্ষে সন্তোষজনক ভাবে ধর্মের ঐশ্বরিকতাকে প্রমাণ করা যায় না, তবু, নিরপেক্ষ বিচারে আমার মনে হয় যে, এমন একটি ধর্ম-ব্যবস্থা (খৃষ্টধর্ম) যা প্রেম ও করুণায় গঠিত তা আমাদের সুখ বৃদ্ধি করতে পারে এবং আমাদের বিশ্রী সব সন্দেহ ও অনুভূতিগুলি সংযত করে পারস্পরিক আদান-প্রদান সহজতর করতে পারে। আমি দেখে দুঃখ পাই যে, আপনার একান্ত দয়াশীল পিতৃদেব ধর্মের বিরোধিতা করে নিজের সাফল্য ব্যাহত করেছিলেন। আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, তিনি উপরোক্ত অর্থে খৃষ্ট ধর্মেরই অনুরাগী ছিলেন, এমন কি সে-বিষয়ে অনবহিত থেকেও।"[৩৩]

এ বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। লক্-এর পর যে প্রায় দু-শতাব্দী অতিবাহিত হয়েছে, এবং নাপোলেয়োঁকে ঈশ্বর প্রসঙ্গে লাপ্লাজিয়ের যে বলেছিলেন যে, প্রকল্পটি নিষ্প্রয়োজন (the hypothesis is unnecessary), ষোড়শ শতকের থেকেই যে, দেখা গেছে যে প্রেম ও করুণার ঘনঘটা সত্ত্বেও সামাজিক দ্বন্দ্ব দুর্মর

খৃষ্ট ধর্মে দূর হয় না, বরং ক্রমে বা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তৌহিদ পন্থী রাম-মোহনের পক্ষে যে ত্রিত্ব বাদ খৃষ্টধর্মের বিকৃতিমাত্র, অধিকাংশ ধর্মবিশ্বাসী খৃষ্টানের কাছে তা যে তাঁদের ধর্মের অপরিহার্য অঙ্গ এবং রামমোহনের মতই ধর্মদ্রোহিতা বা heresy*, এ-সব আলোচনায় আমরা আপাতত প্রবেশ করা নিষ্প্রয়োজন জ্ঞান করি। আমরা শুধু উল্লেখ করতে চাই যে, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে আমরা এই চিঠিতে দেখছি যে, ইয়োরোপীয় আদি-মধ্য যুগ থেকে সপ্তদশ শতকের শেষভাগে দুঃসাধ্য সাধনায় উপনীত একজন মানুষ যত্ন বর্ধিত উনবিংশ শতকে উপস্থিত হয়েছেন, এবং তাকে বুঝতে না পেরে, বারবার মৃদুকণ্ঠে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, তাঁর প্রদত্ত প্রাচীন পথেই নতুন ও কিপ্ত প্রায় শতকের সকল সমস্যার সমাধান হবে। আমরা দেখব যে, রামমোহন যে সব সমস্যার মুখোমুখী হন নি, হতে পারেন নি, অক্ষয় দত্তকে সেই সব সমস্যার সরাসরি মোকাবিলা করতে হয় এবং তিনি এ ব্যাপারে পিছু হটেন নি।　　(ক্রমশ)

টীকা

২৪. **যুগগুরু রামমোহন** : কিতিমোহন সেন।
ব্রাহ্ম সাধনাশ্রমের বার্ষিক জয়ন্তী উপলক্ষে পুর্নমুদ্রিত। কলিকাতা ১৩৫২। প্রকাশকের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে 'এই লেখাটি বিশ্বভারতী পত্রিকায় গত আশ্বিন, ১৩৫৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।'

২৫. শিবনারায়ণী সম্প্রদায় সম্পর্কে অক্ষয়কুমার দত্তের প্রামাণিক রচনা 'সাহিত্য' বৈশাখ ১৩০১ সালে প্রকাশিত হয় এবং বর্তমানে বিনয় ঘোষ সম্পাদিত **'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'** (প্রথম পাঠভবন সংস্করণ কলিকাতা ১৩৭৬) 'সংযোজন' অংশে পৃঃ ৩৩৭-৩৪০-এ সঙ্কলিত হয়েছে।

নিরাকার একেশ্বরবাদী হওয়া সত্ত্বেও শিবনারায়ণী ও অন্যান্য মধ্যযুগীয় মতের সঙ্গে রামমোহনের চিন্তাজগতের ব্যবধান সম্পর্কে অনবহিত থাকলে আধুনিক যুগ ও মধ্যযুগের ব্যবধান সম্পর্কেও অনবহিত থাকতে হয়। শ্রদ্ধেয় শ্রী সেন এই পার্থক্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিন্তু রাজাকে ভারত-

---

*খৃষ্টধর্মের ইতিহাসে একেশ্বরবাদ Arian Heresy রূপে ধিক্কৃত ও পরিত্যক্ত হয়। প্রেমও করুণার অবতার বুদ্ধ অতি অমন্ত অত্যাচারের দ্বারা এই heresy দূর করেন।

বর্ত্তীয় সাধনার ধারক প্রমাণ করার আগ্রহে তাঁর ঝোঁক বিপরীতমুখী হয়।

২৬. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী : 'বাঙ্গালার সাহিত্য : বর্ত্তমান শতাব্দীর,' **বঙ্গদর্শন** শ্রাবণ ১২৮৮। **হরপ্রসাদ রচনাবলী** সম্পাদক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সহযোগী সম্পাদক শ্রীঅনিলকুমার কাঞ্জিলাল, ইস্টার্ণ ট্রেডিং কোং, কলিকাতা-১৩, ১৯৫৬, গ্রন্থে সংকলিত। উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য ঐ পৃ. ১৭৯।

২৭. অসিতকুমার ভট্টাচার্য : **বাংলার নবযুগ ও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা** গ্রন্থজগত কলিকাতা ১৯৬৪।

২৮. Sophia Dobson Collet : **The Life and Letters of Raja Rammohan Roy** ed. Dilip Kumar Biswas and Prabhat Ch. Ganguli, Sadharan Brahmo Samaj, Calcutta (3rd ed. 1962). পৃ. ২১০-১১।

অতঃপর গ্রন্থটি **কলেৎ** (১৯৬২) রূপে উল্লেখিত।

২৯. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২১০ : "Hinduism furnishes the antidote to its own inherent intolerance."

৩০. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২১১ পাদটীকা

৩১. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২১১

৩২. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২১২

৩৩. "যদি কহ সর্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদজ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক তাহার উত্তর এই যে, লোকযাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম চক্ষু কর্ণ হস্ত করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক যেহেতু এ সকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন।" **বেদান্তগ্রন্থ** (১৮১৫), ভূমিকা। দ্র: **রামমোহন-গ্রন্থাবলী**, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা (১৯৪৪), পৃ: ৬।

৩৪। পথ্যপ্রদান (১৮২৩)। দ্র: রামমোহন গ্রন্থাবলী বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ, কলিকাতা (১৯৪৪) পৃ. ১২৩

৩৫. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২১৩

৩৬. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২১৩

৩৭. ব্যতিক্রম, কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত **শাশ্বত বঙ্গ** গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'রামমোহন রায়' শীর্ষক প্রবন্ধ। বিশেষত তদন্তর্গত 'রামমোহন ও মুসলিম সাধনা' শীর্ষক অংশ।

দ্র: **শাশ্বত বঙ্গ** কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৫৮, পৃ: ২০৩-২২৩, বিশেষত, পৃ: ২০৪-২০৯।

৩৮. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: **মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত** গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'বাল্যশিক্ষা ও মত পরিবর্ত্তন' শীর্ষক অংশ। বর্তমান লেখকের নিজস্ব সংগ্রহে উপস্থিত উক্ত গ্রন্থের ২৩ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃতিটি অবস্থিত। দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রন্থের টাইটেল পেজ অনুপস্থিত।

৩৯. অমিতকুমার ভট্টাচার্য: 'রামমোহন ও নব্য বাংলার গোড়াপত্তন', **সাহিত্য পত্র** শারদীয় সংখ্যা ১৩৭০ পৃ: ৪৪।

তুহফাৎ থেকে উদ্ধৃতির জন্য দ্রষ্টব্য :

তুহফাৎ উল মুওয়াহিদিন: অনুবাদক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ, কলিকাতা ১৯৪৯, পৃ: ২৭। শ্রী দাসের অনুবাদটি মৌলবী ওবেদ উল্লাহ ইংরেজি অনুবাদ থেকে কৃত। মূল গ্রন্থ পার্শীতে রচিত— ভূমিকা আরবীতে।

৪০. তুহফাৎ　　ঐ পৃ: ১৬।

৪১. তুহফাৎ: ঐ। অমিতকুমার ভট্টাচার্য, **প্রাগুক্ত** পৃ: ৪৫-এ উদ্ধৃত।

৪২. এই কিম্বদন্তী সমূহ হাদিস এর প্রভাবে হিজরী তৃতীয় শতক থেকে প্রাধান্য পেতে থাকে। এ বিষয়ে A. Guillaume তাঁর Islam শীর্ষক সহানুভূতি ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থে (Pelican original, প্রথম সংস্করণ ১৯৫৪, ২য়, ১৯৫৬, ১৯৬৪-র পুনর্মুদ্রণ) ৯২ পৃষ্ঠায় বলেন :

Traditions were invented to show that every thing that a muslim was required to believe and do was founded on traditions purporting to prove that Muhammad, by example or precept had so ruled ! Thus Sunna was ancient custom, then Contemporary, immediate past practice, and finally the ideal behaviour of the prophet as enshrined in tradition.

আরো...Thus divine authority invests a canonical tradition.

সংক্ষেপে, Guillaume-এর মতে 'হাদিস এইভাবে উদ্ভাবন' করা হতে

থাকে যাতে মনে হয়, যে একজন মুসলিমের বিশ্বাস ও আচরণ বিধি হজরতের আমল থেকেই সুনির্দিষ্ট। এইভাবে সুন্না ছিল প্রথমে প্রাচীন প্রথা, তারপর সমসাময়িক [পরে] অনুরবর্তী অতীতের আচার এবং শেষ পর্যন্ত হজরতের আদর্শ আচরণ যা হাদিসে স্থান পেয়েছে।...এইভাবেই ঐশ্বরিক কর্তৃত্বের থেকে পুরোহিত তান্ত্রিক ঐতিহ্যের উদ্ভব হয়।

৪৩. অসিতকুমার ভট্টাচার্য সাহিত্য পত্র শারদীয় ১৩৭০ প্রাগুক্ত পৃ: ৪৪।

৪৪. **কলেৎ** (১৯৬২). পৃ: ২২০-২২ ; এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় **সাহিত্য সাধক চরিতমালা** প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত, 'রামমোহন রায়' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পরিবর্দ্ধিত ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা আষাঢ় ১৩৩৩ (জুন-জুলাই ১৯৪৬) ; পৃ: ৫৩।

৪৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাগুক্ত ; পৃ: ৫৬।

৪৬. ঐ প্রাগুক্ত পৃ: ৫৬-৭।

৪৭. **কলেৎ** (১৯৬২) পৃ: ২২৪।

৪৮. Rajani Palme Dutt : **India To-day** (১ম সংস্করণ Gollancz, London 1940 ; প্রথম ভারতীয় সংস্করণ বম্বে, ১৯৪৭। বর্তমান প্রবন্ধে ভারতীয় সংস্করণ ব্যবহৃত হয়েছে)। বইটির প্রভাবে লেনিনের সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশের বিরুদ্ধে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলা কালেই ধর্ম ভিত্তিক দ্বি জাতিতত্ত্ব মেনে নেয় ও তার ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের দাবী ও মেনে নেয়) লেনিনের নির্দেশ : 'The State Must not concern itself with religion'. (দ্র: Lenin : **On Religion** বর্মণ পাবলিশিং হাউস। কলিকাতা তারিখ নেই, পৃ: ১৩) অথচ ধর্ম ভিত্তিক দেশ-ভাগের দাবী সম্পর্কে র. পা. দত্ত বলেন :...it was to some extent reflecting in however confused a form genuine mass sentiments and aspirations (ঐ, পৃ: ৩৮৪)।

৪৯. Shivnath Shastri **History of the Brahmo Samaj.** Calcutta, 1919. পৃ: ৬৬-৮।

৫০. **"Whatever God hath revealed is certainly true ; no doubt can be made of it. This is the proper object of faith : but whether it be a divine revelation or not reason must justify."**

Lock Essays IV. 18. Sect. 4.

Basil Willey লিখিত **Seventeenth Century Background** Penegine Books (Penguins) 1962. পৃ: ২৩৩-তে উদ্ধৃত।

৫১. "No proposition can be received for divine revelation or obtain assent due to such, if it be contrary to our clear intuitive knowledge."

Lock **Essays. IV. 19. Sect. 4.**

Basil Willey. প্রাগুক্ত পৃ: ২৩৪-তে উদ্ধৃত।

৫২ "We do not need revelation to tell us what we already know, and when it contradicts what we know, we must reject it"

Basil Willey : প্রাগুক্ত : পৃ: ২৩৪।

৫৩. G. M. Troveleyan : **English Social History** ELBS & Longmans. London. 1962 ed., পৃ: ৪৯৩।

৫৪. কলেৎ (১৯৬২) পৃ: ৪৯৪-৫।

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(১)

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকবার সময় আমার জীবনে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা ঘটে ; একে একে তারই উল্লেখ করছি। প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুতর ঘটনা হল, এই সময়ে আমি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজে প্রবৃত্ত হই। এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে অনেক কাহিনী রচিত হয়েছে এবং আমার জীবনের এটি অন্যতম বৃহৎ ঘটনা। এর সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বলা আবশ্যক মনে করি।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের জন্য বাংলাদেশে যে প্রবল আন্দোলন হয় তার প্রায় সবটাই আমি প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গ উপলক্ষ্যে যখন এই আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন আমি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ভর্তি হই। বরিশালের প্রসিদ্ধ নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত তাঁর পিতা ব্রজমোহন দত্তের নামে এই কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন। যদিও তিনি এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন না তথাপি তিনি প্রতি সপ্তাহে ছাত্রদের এক অধিবেশনে উপস্থিত হয়ে তাদের সদুপদেশ দিতেন। বরিশালের জনসাধারণের কাছে তাঁর প্রতিপত্তি ছিল অসাধারণ। গ্রামের অনেক লোক তাঁকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করত ; গাছের নতুন সব্‌জী বা ফল তাঁকে উপহার না দিয়ে নিজেরা ভোগ করত না। এই কারণে অশ্বিনীবাবুর নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন বরিশালে যেরূপ ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হয় এবং সফলতা লাভ করে বাংলাদেশের অন্যত্র বোধহয় সেরকম হয়নি। পরবর্তীকালে আমি সরকারী কাগজপত্রে অশ্বিনীবাবু সম্বন্ধে স্থানীয় কর্মচারীদের বহু মন্তব্য পাঠ করেছি। তাঁরা অশ্বিনীবাবুকে নেতা হিসাবে ভীষণ ভয় করতেন এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অদ্ভুত প্রতিপত্তি সম্বন্ধে খুবই সচেতন ছিলেন। বরিশালে এই আন্দোলন যে খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল তার মূলে ছিল অশ্বিনীবাবুর নেতৃত্ব ও প্রতিপত্তি। আমার মনে আছে যেদিন বঙ্গভঙ্গের আদেশ সরকারী ভাবে জারী হল সেদিন কলেজের সমস্ত ছাত্র মিলে আমরা খালি পায়ে কালো পতাকা হাতে নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করি। এরপর বিদেশী দ্রব্য বর্জনের সময়েও বরিশালে অনেক ব্যাপার ঘটে।

অশ্বিনীবাবু এবং আমাদের কলেজের আর একজন অধ্যাপককে সরকার পরে deport অর্থাৎ অন্তরীণ করেছিলেন। বরিশালে এঁদের সংস্পর্শে এসে স্বদেশী আন্দোলন সম্বন্ধে একটা গভীর আগ্রহ ও উচ্চ ধারণা আমার মনে জাগে। তারপর যখন বরিশালে আমার ক্রমাগত অসুখ হতে থাকে তখন বরিশাল ত্যাগ করে কলকাতায় এলাম। এই সময় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার অবিসম্বাদিত নেতা। তিনি তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। কেবলমাত্র তাঁর কাছে পড়বার সুযোগ পাব এজন্যই কলকাতার অন্য-কোন কলেজে না গিয়ে রিপন কলেজে ভর্তি হলাম। সেই সময় গোলদিঘীতে প্রায়ই সভা হত। সেসব সভার উদ্দীপনাময় বক্তৃতার কথা এখনও মনে আছে। তারপর ছাত্রাবস্থায় বরাবরই আমি কলকাতায় ছিলাম। সুতরাং সমগ্র স্বদেশী আন্দোলনটি আমি ছাত্রাবস্থায় বিশেষভাবে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পেয়েছি। এর পরে প্রথমে কলকাতায় এবং পরে ঢাকায় এই আন্দোলনের বিভিন্ন দিক ও গতি আমি বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। যখন বাংলায় সন্ত্রাসবাদের সৃষ্টি হল তখন অনেক বিপ্লবীর সঙ্গেও আমার আলাপ পরিচয় হয়েছিল। ১৯৪৭ সনে স্বাধীনতা লাভের পর আমার মনে একটা বিশেষ ইচ্ছা হল যে এই স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি তথ্যমূলক পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখা হোক। অন্ততঃপক্ষে এই সংগ্রামে বাংলার যে বিশিষ্ট অবদান তা যাতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকে তারজন্য চেষ্টা করা খুবই প্রয়োজন বোধ করেছিলাম।

আমি তখন ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের সদস্য। ১৯৪৮ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে জয়পুরে কমিশনের অধিবেশনে আমি প্রস্তাব করি যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লেখার ব্যবস্থা করা হোক। এ সম্বন্ধে যে বিস্তৃত আলোচনা হয় এবং আমি যা যা বলি তার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম ঐ কমিশনের রিপোর্টে লিপিবদ্ধ আছে।

—"**Dr. R. C. Majumdar said that India has attained her independence but the history of the national struggle that culminated in independence has yet to be written. Unless the materials for such a history are now collected some of them are likely to be lost for ever. He did not like to put a chronological limit to the subject that might be done later but some of the prominent leaders of the independence movement, whether violent or non-violent, were still in the land of living and their correspondence and other relevant papers could yet be saved. This will demand organized effort on the**

part of the Indian scholars and the Government of the country. The foremost leader of the movement, Dr. Majumdar observed, was Mahatma Gandhi and it was essential that all his papers should be placed in the custody of the National Archives as has been done in the U. S. A. with respect to Lincoln and Roosevelt Papers...He was aware of the proposal to organise Memorial Museum. Other belongings of Mahatmaji might go to the Museum but his writings and other papers which form an important source of history of our national struggle must come to the National Archives....

A lively discussion on the subject followed and following resolutions were passed :—

Resolution X—This Committee recommends that an attempt be made to compile a list of important records, both published and unpublished, bearing upon the national struggle for freedom.

Resolution XI—That the Government of India be moved to make an initial grant of Rs. 25,000 to be distributed among the Regional Survey Committees for collection of materials relating to the proposed compilation of an authoritative history of Indian national struggle.

Resolution XII—That the Government of India and the Mahatma Gandhi Memorial Committee be requested to transfer all the original writings of Mahatma Gandhi and records relating to him to the custody of the National Archives of India for preservation."

জয়পুরের অধিবেশনের কিছুকাল পরে গভর্ণমেণ্টকে এ বিষয়ে সচেতন করার উদ্দেশ্যে আমি বোম্বাই থেকে প্রকাশিত New Democrat নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯৪৮ সনের ৭ই মে'র সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লিখি। এই প্রবন্ধে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলি যে এই কাজ একজন ব্যক্তির দ্বারা করা সম্ভব নয়; গভর্ণমেণ্টের পক্ষে এই ব্যবস্থা করা দরকার এবং এটি গভর্ণমেণ্টের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার পর আমি তার একটি কপি প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নিকট পাঠাই। তাঁর সেক্রেটারী আমাকে একটি চিঠি লিখে জানালেন যে আমি যেন এ বিষয়ে তথ্য ও বেতার বিভাগের (Ministry of Information and Broadcasting) মন্ত্রীর সঙ্গে পত্রালাপ করি। সেইমত ১৯৪৮ সনের ১৩ই জুন ঐ প্রবন্ধের একটি কপি উক্ত মন্ত্রীর নিকট পাঠাই। কিন্তু তার আর কোন উত্তর

পাইনি। তখন আর কোন উপায় না দেখে আমি রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে একটি চিঠি লিখি। তাঁর সঙ্গে পূর্বেই আমার সামান্য পরিচয় ছিল। চিঠি পাওয়া মাত্রই তিনি ১৯৪৮ সনের ২৫শে আগষ্ট তারিখে আমাকে একটি পত্রে জানালেন যে তিনি আমার এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং এ বিষয়ে যদি একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা তাঁর কাছে পাঠাই তাহলে তিনি সেটি কার্যে পরিণত করবার চেষ্টা করবেন।

এই সময় আমার কলকাতার বাড়ির পাশে এক বিবাহ বাড়িতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন দুইজন মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা হয়। তাঁদের কাছে আমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত করি। একজন (নিকুঞ্জ বিহারী মাইতি) এটি খুবই সমর্থন করলেন। তিনি এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত এবং সুপরিকল্পিত প্রস্তাব রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠানর জন্য অনুরোধ করেন। তাঁর কথামত একটি প্রস্তাব আমি ১৯৪৮ সনের ডিসেম্বর মাসে শিক্ষামন্ত্রী হরেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর নিকট পাঠাই। মাত্র ত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে এবং দু'বছরের মধ্যে এই ইতিহাস লেখা সম্ভব—এমন মত আমি এই প্রস্তাবে ব্যক্ত করেছিলাম। মন্ত্রী মহাশয় কিন্তু এই পত্রের প্রাপ্তি স্বীকারটুকুও আবশ্যক মনে করেননি।

জয়পুর অধিবেশনে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সে সম্বন্ধে রেকর্ডস কমিশনের পরবর্তী অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯৪৮,) কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী কমিশনকে জানালেন যে দশম ও একাদশ প্রস্তাব সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট এখনও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হননি এবং দ্বাদশ প্রস্তাব সম্বন্ধে গান্ধী মেমোরিয়াল কমিটির কাছে পত্র লেখা হয়েছে; এখনও কোন উত্তর আসেনি। অর্থাৎ স্বাধীনতার ইতিহাস সম্বন্ধে সরকার বা শিক্ষামন্ত্রী কিছুই করা আবশ্যক বোধ করেননি।

এইরূপে আমার সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন কোন ফল দেখা গেল না তখন অকস্মাৎ ১৯৪৯ সনের আগষ্ট মাসে দিল্লীর সরকারী দপ্তর থেকে আমি একটি চিঠি পাই। তাতে বলা হয়েছে যে ভারত সরকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহের জন্য একটি সমিতি গঠন করা প্রয়োজন মনে করেছেন এবং আমি তার সভ্য মনোনীত হয়েছি। এই চিঠি পেয়ে মনে হল যে খুব সম্ভবতঃ ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের চেষ্টায় ভারত সরকারের মতির পরিবর্তন হয়েছে। কিছুদিন পরেই আমার এই অনুমান যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ১৯৫০ সনের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল রেকর্ডস কমিশনের অধিবেশনে এই বিষয়ে নিম্নলিখিত বিবরণী উপস্থাপিত করা হয় :—

"Note on the Progress Made In the Compilation Of the History Of Freedom Movement in India.

Genesis.

The scheme for writing an authentic and comprehensive history of the different phases of the struggle which culminated in the freedom of India in 1947, was originally recommended by the Indian Historical Records Commission at its Jaipur Session in 1948 ; and when the Hon'ble Dr. Rajendra Prasad invited the attention of the Government of India to the urgency of this work, the Ministry of Education was entrusted with planning and execution of the project." (Proceedings, p. 95).

এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শিক্ষামন্ত্রী জনাব হুমায়ুন কবীরের কয়েকটি উক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন যে জয়পুর অধিবেশনে প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ামাত্রই মৌলনা আবুল কালাম আজাদ তদনুসারে গ্রন্থলেখার ব্যবস্থা করেন। ("The recommendation of the I. H. R. C. made at Jaipur Session in February 1948 found an immediate response from the late Moulana Abul Kalam Azad who directed that steps should forthwith be taken to give effect to it.") সুতরাং এর কৃতিত্ব সম্পূর্ণরূপে আবুল কালাম আজাদেরই প্রাপ্য। ডঃ তারাচাঁদও পরবর্তীকালে এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি করেছেন। এই গ্রন্থ রচনার ব্যবস্থার কৃতিত্ব ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের, না মৌলনা আবুল কালাম আজাদের—পূর্বোক্ত ঘটনাবিন্যাসের আলোচনা করলেই পাঠকবর্গ তা বুঝতে পারবেন। আমার নিজের কোন সন্দেহ নেই যে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করলে ভারত সরকার এই পরিকল্পনার কোন রূপ দেবারই প্রয়াস করতেন না।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার জন্য যে কমিটি গঠিত হয় তার প্রথম অধিবেশন হয়েছিল ১৯৫০ সনের ৩রা জানুয়ারী। এই কমিটিতে যে সকল প্রস্তাব গৃহীত হয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী তা অনুমোদন করেন নি। এর থেকেও বোঝা যায় যে মৌলনা আজাদ সম্বন্ধে হুমায়ুন কবীরের উক্তি কতদূর অসত্য। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ডঃ তারাচাঁদ। ১৯৫১ সনের ১৮ই সেপ্টেম্বর এই কমিটির এক অধিবেশনে ডঃ তারাচাঁদ প্রস্তাব করলেন যে এইরূপ ইতিহাস লেখার ভার ভারত সরকারের পরিবর্তে কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা ইণ্ডিয়ান হিস্ট্রি কংগ্রেসের উপর দেওয়া হোক। কমিটিতে সিদ্ধান্ত হল যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ই এই কাজের ভার নেওয়ার সবচেয়ে উপযুক্ত। কমিটির

এই অধিবেশনে কোন কারণবশতঃ আমি উপস্থিত থাকতে পারিনি। ঐতিহাসিক-দের মধ্যে কেবল ডঃ তারাচাঁদ ও ডঃ বিশ্বেশ্বর প্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। পরে আমি খবর নিয়ে জানলাম যে ডঃ তারাচাঁদের প্রস্তাবের গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল যে একাজের ভার আমাদের হাতে না দিয়ে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে রাখলে কেবলমাত্র তিনি এবং তাঁর পরিচিত কয়েকজন লোকই এ বিষয়ে কর্তৃত্ব করতে পারবেন। আমি এই কমিটির সভায় উপস্থিত না থাকলেও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলাম। পরে শুনেছি যে এই নিয়ে অনেক বাদানুবাদ হয় এবং ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক পত্র বিনিময়ও চলে। প্রায় এক বছর এইরূপ চলার পর হঠাৎ শোনা গেল যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এই কাজের ভার নিতে রাজী হয়নি এবং ভারত সরকারই এখন এই ইতিহাস লেখার ভার গ্রহণ করবেন। আমার বিশ্বাস যে এক্ষেত্রেও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আপত্তির জন্যই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ভার না দিয়ে ভারত সরকার নিজে তা নিয়েছিলেন। তবে এ বিষয়ে কোন বিশিষ্ট প্রমাণ অবশ্য আমি পাইনি।

এর পরেই অকস্মাৎ ভারত সরকারের তরফে খুব কর্ম তৎপরতা দেখা গেল। এক বছর দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কথাবার্তা চালাবার পর ১৯৫৭ সনের ৩০শে ডিসেম্বর ভারত সরকার এই ইতিহাস লেখার জন্য একটি সম্পাদক-সমিতি গঠন করলেন। এই সমিতির সভাপতি হলেন ডঃ সৈয়দ মামুদ বাকী আটজন সভ্য ছিলেন ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন, মহামহোপাধ্যায় দত্ত বাহমন পোদ্দার, এম. হাবিব, অধ্যাপক নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, বলবন্ত সিং মেটা, আচার্য নরেন্দ্র দেব, শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও আমি। শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এর সম্পাদক (Secretary) ছিলেন।

১৯৫৩ সনের ২৬শে এপ্রিল এই সম্পাদক-সমিতির এক অধিবেশনে স্থির হয় যে এই গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ, গবেষণা, অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপত্র এবং ইতিহাসের খসড়া (draft) লেখার জন্য একজন বেতনভোগী ডাইরেক্টর নিযুক্ত করা হবে এবং এই সমিতি আমাকেই এই পদে নিযুক্ত করলেন। এই পদ গ্রহণের পর নানা ভাবে আমি যে রকম বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছি সে কথা আমার *The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857* গ্রন্থের ভূমিকায় কিছু উল্লেখ করেছি।

প্রথমেই সম্পাদক সুরেন্দ্র মোহন ঘোষের প্রস্তাবে এই সম্পাদক-সমিতির যাবতীয় কার্যকরী ক্ষমতা একটি ক্ষুদ্র উপসমিতির হাতে ন্যস্ত করা হল। এর সদস্য ছিলেন সম্পাদক-সমিতির সভাপতি সৈয়দ মামুদ, সম্পাদক সুরেন্দ্র মোহন ঘোষ

এবং ভারত সরকারের একজন কর্মচারী। আমাকে বা অন্য কোন ঐতিহাসিককে এর সদস্য করা হল না; অর্থাৎ কার্য্যতঃ সমস্ত ক্ষমতাই এমন একটি উপসমিতির হাতে ন্যস্ত হল যার সভ্যদের ইতিহাস সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেল উপসমিতিকে উপলক্ষ্য করে সম্পাদকই সব ক্ষমতা পরিচালনা করছেন। ইতিহাস সম্বন্ধে এই সম্পাদকের কতকগুলি অদ্ভুত ধারণা ছিল; এর সবিস্তারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তবে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি উক্তি উল্লেখ করলেই এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার হবে।

১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে তিনি নিম্নলিখিত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন :—"In 1857 an organised attempt was made by the natural leaders of India to combine themselves into a single command with the sole object of driving out the British power from India in order that a single unified politically free and sovereign state may be established. That attempt was conscious and deliberate."

আমি তাঁকে বললাম যে এইভাবে পূর্বেই একটি সিদ্ধান্ত করে তার সমর্থনের জন্য উপকরণ সংগ্রহ করা, এটা একেবারে ইতিহাসের মূল সূত্রের বিরোধী। এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক বাদানুবাদ হয়। আমি প্রথমে তাঁর মতের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি আমার সাহায্যের জন্য যেসব রিসার্চ ফেলো নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের লিখিত নির্দেশ দিলেন যে তাঁর পূর্বোক্ত মত সমর্থন করা যায় কেবলমাত্র এমন সব উপকরণই সংগ্রহ করতে হবে; এর বিরোধী কোন প্রমাণ সংগ্রহ করা হবে না। কারণ তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য বিফল হবে (thoroughly upset our purpose)। আমি বোর্ড অফ এডিটারের ডিরেক্টর হিসাবে তাঁর এই আদেশ নাকচ করে নির্দেশ দিলাম যে সব রকম প্রমাণই সংগ্রহ করতে হবে—কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রমাণ-উপকরণ সংগ্রহ করা হবে না।

আর একটি কারণেও তাঁর সঙ্গে আমার গুরুতর মতভেদ হয়েছিল। আমার কাজে সাহায্যের জন্য যে কয়জন রিসার্চ ফেলো নির্দ্দিষ্ট ছিল তিনিই তাদের নিযুক্ত করতে আরম্ভ করলেন। অনেক সময় কোন মন্ত্রী বা লোকসভার বিশিষ্ট সদস্যদের অনুরোধে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হত। এরূপ একজন রিসার্চ ফেলোকে তিনি সিপাহী বিদ্রোহ নামক অধ্যায় লেখার ভার দিলেন। আমি এ বিষয়ে প্রথমে কিছু জানতাম না। কিন্তু পরে আপত্তি করায় তিনি দেখালেন যে এই বিশেষ কাজের জন্য তাকে নিযুক্ত করা হয়েছে; অন্ততঃ দু'বছর তাকে এ কাজে

রাখতে হবে। দু'বছর পরে সে যখন এই অধ্যায়টি লেখা শেষ করল তখন দেখলাম যে এ লেখার ঐতিহাসিক মূল্য বিশেষ কিছু নেই; সম্পাদক সুরেন বাবুর পূর্বোক্ত মত সমর্থন করার উদ্দেশ্যেই সমস্ত অধ্যায়টি লেখা হয়েছে। অবশেষে আমাকে এই অধ্যায়টি সম্পূর্ণ বাদ দিতে হল এবং আমি নিজে পাঁচ ছ'মাস সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে পড়াশোনা করে এই অধ্যায়টি লিখলাম। পরবর্তী-কালে এইটি অবলম্বন করে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমার গ্রন্থটি রচনা করি।

সম্পাদকের সঙ্গে মতানৈক্যের আরও একটি গুরুতর কারণ ঘটল। আমি তাঁকে বললাম যে এই বই লিখতে হলে কলকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে বছরে অন্তত: দু'তিন মাস পড়াশোনা করা বিশেষ দরকার। তিনি আপত্তি করে বললেন যে আমার নির্দ্দেশমত কোন রিসার্চ ফেলো লাইব্রেরীতে পড়ে নোট করে দিলেই হবে। আমি বললাম, এ অতি অদ্ভুত প্রস্তাব এবং এভাবে ইতিহাস লেখা সম্ভব নয়। এই বিষয়টি নিয়ে আমি শিক্ষামন্ত্রী আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং তিনি আমাকে বছরে দু'তিন মাস কলকাতায় থাকবার অনুমতি দেন। কিন্তু এতে আর এক বিপদ ঘটল। আমি যখন কলকাতায় থাকতাম তখন সম্পাদক মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে নানা রকম অদ্ভুত বিবৃতি দিতে আরম্ভ করলেন। একবার বললেন যে নানা সাহেবের সহচর আজিমুল্লার ডায়েরী পাওয়া গেছে; বোর্ড থেকে তা কেনা হয়েছে এবং এই ডায়েরীতে অনেক গুরুতর নূতন তথ্য পাওয়া গেছে। সংবাদপত্রে এই বিবৃতি পড়ে তাঁকে লিখলাম যে যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্বন্ধে ভালভাবে অনুসন্ধান করে এই সব উপকরণ খাঁটি কিনা তা প্রমাণ হচ্ছে ততক্ষণ তিনি যেন এ রকম কোন বিবৃতি না দেন। দিল্লীতে ফিরে সেই ডায়েরী নিয়ে আমি মৌলনা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে দেখা করে বলি, আপনি তো উর্দুতে পণ্ডিত এই ডায়েরীর ভাষা একশ বছরের পুরনো কি না বলুন। তিনি সেটি রেখে দিলেন। কয়েকদিন পরে জানালেন যে সেটি উনবিংশ শতাব্দীর চলিত ভাষা নয়, এটি আধুনিক কালের কোন লেখা।

আর একবার আমার অনুপস্থিত কালে সম্পাদক প্রচার করলেন যে পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের এক পাণ্ডার কাছে লেখা ঝাঁসীর রানীর একটি চিঠি পাওয়া গেছে; তাতে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। এই চিঠি ওড়িয়া ভাষার পণ্ডিতদের দেখান হল। তাঁরা একবাক্যে বললেন যে এটা জাল। এইরূপ তাঁতিয়া টোপির উইল পাওয়া গেল। নানা সাহেবের স্ত্রীর মৃত্যুর পর

নানা সাহেব ছদ্মবেশে তাঁর শ্রাদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তির স্বাক্ষরিত একটি চিঠিও সম্পাদক বার করলেন। আমি ভারত সরকারের সহায়তায় সেখানকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই চিঠির নকল পাঠিয়ে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ঐ সব নামের ব্যক্তি সেই গ্রামে ছিলেন কিনা তা ভালভাবে অনুসন্ধান করে আমাদের জানাতে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন যে একজন বিশিষ্ট সরকারী কর্মচারী নিজে ঐ গ্রামে গিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন যে সেখানকার অতিবৃদ্ধ অধিবাসীরা বলেছেন যে তাঁরা এই শ্রাদ্ধের কোন কথাই শোনেননি।

তাঁতিয়া টোপির উইলের খবর যারা দিয়েছিল তাদেরও কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। বলাবাহুল্য যে এই সব ব্যাপারে সরকারের বেশ কিছু ব্যয় হয়েছিল। এই রকম আরও বহু ব্যাপার আছে তা সবিস্তারে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন।

নানা ব্যাপারে সম্পাদক সুরেনবাবুর সঙ্গে আমার মতানৈক্য প্রায়ই হতে থাকে। সবচেয়ে গুরুতর মতভেদ হল, মহাত্মা গান্ধীর বিবরণী কাকে দিয়ে লেখান হবে এ নিয়ে। সম্পাদক প্রস্তাব করলেন যে টেণ্ডুলকরকে এই কাজের ভার দেওয়া হোক। আমি এটি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম। টেণ্ডুলকরের লেখা মহাত্মা গান্ধীর জীবন চরিতের ভূমিকায় একটি পৃষ্ঠাতেই তিন চারটি গুরুতর ভুল আছে; তা সম্পাদককে দেখালাম। সুতরাং টেণ্ডুলকরকে দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে অধ্যায় লেখার প্রস্তাবে আমি সম্মত হলাম না।

আর একদিন সম্পাদক-সমিতির অধিবেশনে সুরেনবাবু প্রস্তাব করলেন যে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের ফলে বাংলাদেশ যে দু'ভাগ করা হল, এই বাংলাভাগের প্রস্তাবের কেউ বিরোধিতা করেনি—এই কথা লিখতে হবে। আমি সেই সভায় বললাম যে অন্যের কথা দূরে থাকুক স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী যে এর বিরোধিতা করেছিলেন আমি তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারি। তিনি বললেন—প্রমাণ কি? বললাম যে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু ঐ সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নোয়াখালিতে ছিলেন। তিনি আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু। তাঁর কাছে মহাত্মার লেখা চিঠির নকল আছে। আমার কথা শুনে উপস্থিত দু'একজন সদস্যও বললেন যে তাঁরাও এ কথা জানেন।

এই সব বিপত্তি এবং গোলমাল সত্ত্বেও ১৯৫৪ সনের মধ্যেই আমি এই ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের খসড়া (draft) লেখা শেষ করেছিলাম। এই খসড়া সমিতির সকল সভ্যের কাছে পাঠান হল। সে সময় আহমেদাবাদে হিস্ট্রি

কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছিল। আমাদের সম্পাদক-সমিতির অধিবেশনও আহমেদাবাদে ১৯৫৪ সনের ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সনের ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। তিনদিনব্যাপী বাদানুবাদের পর আমার খসড়া ইতিহাস সাধারণভাবে গৃহীত হল। প্রস্তাবে বলা হয়—"The Board generally approves its lay out." আরও একটি গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে যদি কোন সদস্য ভিন্ন মত পোষণ করেন তবে তা খসড়ার পাশে পাশে পেন্সিলে লিখে আমার কাছে পাঠাবেন এবং আমি সেইমত সংশোধন করে প্রেস কপি তৈরী করব।

এর কিছুদিন পরে লোকসভার এক অধিবেশনে এ বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী জানালেন যে এই ইতিহাসের খসড়া অনুমোদিত হয়েছে এবং শীঘ্রই তা ছাপা হবে। কিন্তু এতেই এক বিপদ ঘটল। আহমেদাবাদে গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল যে প্রথম খণ্ডের খসড়া অনুমোদিত হলেও তা গোপন রাখা হবে। ছাপা হওয়ার পূর্বে যাতে সেটা বাইরে প্রকাশ না পায় তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে। অন্যথায় নানা বাদানুবাদের সৃষ্টি হবে। তা সত্ত্বেও লোকসভার অনেক সদস্যকে এই খসড়া ইতিহাস দেখান হয়। এর প্রথম আভাস পাই একদিন মৌলনা আবুল কালাম আজাদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময়। তিনি আমাকে বলেন যে খসড়া পড়ে তিনি খুব খুশী হয়েছেন এবং বইটি খুব ভাল হয়েছে বলেই তাঁর ধারণা। কয়েকজন এম. পি তাঁকে বলেছেন যে এই বইএ বাঙ্গালী জাতিরই প্রশংসা বেশী করা হয়েছে এবং স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদানকেই বড় করে দেখা হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম যে প্রথম খণ্ডে রামমোহন রায় থেকে ১৮৮৫ সন পর্যন্ত সময়ের জাতীয় চেতনার ইতিহাস লেখা হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বাংলার বাইরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অন্য প্রদেশের অবদান যে বেশী ছিল না তা আপনিও ভাল করে জানেন। তিনি বললেন, তাতো জানি। আমরা দু'জনেই বাংলাদেশের লোক। সুতরাং এরূপ বিরূপ সমালোচনা হতে থাকবে এবং তাতে খুবই অনিষ্ট হবে।

(১০)

কিছুদিন পরেই বুঝতে পারা গেল যে আমার বইএর খসড়া নিয়ে বেশ গোলমালের সূত্রপাত হয়েছে। ১৯৫৫ সনের ২৮শে মার্চ তারিখে সম্পাদক-সমিতির এক অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এই অধিবেশনের

আমন্ত্রণপত্রের সঙ্গে ডঃ তারাচাঁদের একটি লিখিত মন্তব্য সদস্যদের কাছে পাঠান হয়। টাইপকরা ফুলস্ক্যাপ কাগজের এগার পৃষ্ঠাব্যাপী এই মন্তব্যে তিনি এই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সূচীপত্রের বা বিষয়বস্তুর এক খসড়া পাঠিয়েছেন তাতে ভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে ইংরাজ রাজত্ব পর্যন্ত সব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। এর কয়েক বছর পরে ডঃ তারাচাঁদ কর্তৃক সঙ্কলিত স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাসের প্রথম খণ্ড ভারত সরকার প্রকাশ করেছেন তা থেকে এই পরিকল্পনার কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। যদিও ডঃ তারাচাঁদ বা হুমায়ুন কবীর কেউই এই সম্পাদনা-সমিতির সভ্য ছিলেন না তথাপি এঁদের দু'জনকে এই সভায় আমন্ত্রণ করা হয়। কারণ-স্বরূপ সম্পাদক বলেন যে হুমায়ুন কবীর কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রীর বর্তমান সেক্রেটারী এবং ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন ভূতপূর্ব সেক্রেটারী। ডাঃ তারাচাঁদ নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইতিহাস লেখার সমর্থন করে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দেন এবং তার মুখবন্ধে তিনি বলেন যে আমি প্রথম খণ্ডের যে খসড়া তৈরী করেছি তা মোটেই ইতিহাস পদবাচ্য নয়। এর উত্তরে আমি অনেক যুক্তির কথা বলেছিলাম। এই মিটিংএর যে সরকারী বিবরণ ছাপা হয় তা থেকে নিম্নলিখিত অংশ উদ্ধৃত করছি :—

"অতঃপর ডঃ তারাচাঁদ স্বাধীনতার ইতিহাসের যে পরিকল্পনা তৈরী করেছেন তার আলোচনা আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে ডিরেক্টর ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার নিম্নলিখিত মন্তব্য করেন। তিনি প্রথমে বলেন যে স্বাধীনতার ইতিহাসের অর্থ ইংরেজ জাতির পরাধীনতা হইতে মুক্তি এবং এ স্বাধীনতা কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতাই সূচিত করে। এই উক্তির সমর্থনে ডঃ মজুমদার দুইখানি চিঠি হইতে কিয়দংশ পাঠ করেন। একখানি ভারত সরকারের পত্র; আর একখানি এই সভার সম্পাদকের। ভারত সরকারের পত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই ইতিহাস প্রধানতঃ ১৮৭০ থেকে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট অর্থাৎ স্বাধীনতা প্রাপ্তির কাল পর্যন্ত যুগের ইতিহাস। সম্পাদক তাঁর পত্রে লিখেছেন যে এই ইতিহাস আরম্ভ হবে ১৮৫৭ সাল থেকে। সম্পাদকের এই পত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯৫৩ সনের জানুয়ারী মাসে সম্পাদক-সমিতির বৈঠকে প্রথম খণ্ডের যে খসড়ার সংক্ষিপ্তসার উপস্থিত করা হয় তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং তদনুসারে গ্রন্থের একটি বিস্তৃত বিবরণ এবং বিভিন্ন অধ্যায়ের শিরোনামা ১৯৫৪ সনে সকল সদস্যের নিকট পাঠান হয়।

তারপর ১৯৫৫ সনের জানুয়ারী মাসে আহমেদাবাদে সম্পাদক-সমিতির বৈঠকে পূর্বোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে যে খসড়া তৈরী হয় তা সাধারণভাবে গৃহীত হয়। (একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।) ডঃ মজুমদার বলেন যে ঐ খসড়াটি এখন একরকম স্বীকৃত বলে ধরে নেওয়া হবে এবং নতুন কোন খসড়া করা সমীচীন হবে না। তিনি আরও বলেন যে ডঃ তারাচাঁদ যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছেন সেটি একরকম ভারতবর্ষের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস; এবং প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ইতিহাস হিসাবে বিচার করতে হলে এর অধিকাংশই অপ্রাসঙ্গিক। যদিও ডঃ তারাচাঁদ স্বাধীনতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন কিন্তু তাঁর পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ডঃ মজুমদার এই কথাটির উপর বিশেষ জোর দেন যে প্রস্তাবিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলিকেই প্রাধান্য দেওয়া উচিত এবং অন্য যেসব ঘটনা এই সংগ্রামের সহিত কোন না কোন সূত্রে যুক্ত কেবলমাত্র তারই আলোচনা হবে; কিন্তু ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনায় এই প্রণালীর যথেষ্ট অভাব দেখা-যায়।"

এই বিষয়ে নানাবিধ আলোচনা হল। কোন কোন সভ্য বললেন যে ডঃ তারাচাঁদ যে পরিকল্পনা করেছেন তার সঙ্গে সম্পাদক-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত খসড়ার বিশেষ কোন প্রভেদ নেই এবং পরিশেষে এই সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে বলা হয় যে বোর্ড ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনাকে সাধারণভাবে অনুমোদন করেন।

বোর্ডের এই অধিবেশন (২৮শে মার্চ, ১৯৫৫ সন) সম্বন্ধে অনেক কিছুই গভীর রহস্যে আবৃত। আমার তৈরী খসড়া দু' দু'বার অনুমোদিত হল এবং সেই অনুসারে বিভিন্ন অধ্যায় ভাগ করা হল। তারপরেও কে কি কারণে ডঃ তারাচাঁদকে আবার নতুন পরিকল্পনা তৈরী করতে অনুরোধ করলেন এবং কেন আবার আলোচনার জন্য একটি পৃথক মিটিং ডাকা হল, এর কোন কারণ আমি আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি। আরও আশ্চর্য ব্যাপার আমার খসড়া ও ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও বোর্ডের কয়েকজন সদস্য বললেন যে এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই এবং বোর্ড সেটি অনুমোদন করলেন; অথচ বোর্ড আমার খসড়াটিও বাতিল করলেন না। এর পর ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আর কোন আলোচনা হয়েছে বলে আমি জানি না।

আরও একটি আশ্চর্য রহস্যের বিষয় এই যে প্রথম খণ্ড পুরোপুরি লেখা এবং বোর্ডের অনুমোদন লাভ করার পর এবং এই অনুমোদিত খসড়া যে শীঘ্রই ছাপা হবে—লোকসভায় শিক্ষামন্ত্রীর এই ঘোষণা সত্ত্বেও মিটিংএ নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়—

শিক্ষামন্ত্রীকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাবার জন্য অনুরোধ করা হোক—(১) সম্পাদক-সমিতি স্বাধীনতার ইতিহাস লেখা পুরোপুরি সম্পূর্ণ এবং মুদ্রণের উপযোগী করে সেটি শিক্ষামন্ত্রীর নিকট পাঠাবেন, কিম্বা সম্পাদক-সমিতি যেসব ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তার সাহায্যে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে এই ইতিহাস লেখার জন্য নিযুক্ত করবেন; (২) যদি ভারত সরকার এই সম্পাদক-সমিতিকেই মুদ্রণের উপযোগী করে এই ইতিহাসের কপি পাঠানর অনুকূলে মত প্রকাশ করেন তাহলে এই গ্রন্থের বিভিন্ন খণ্ডগুলি রচনা সম্পূর্ণ করার জন্য যে শেষ তারিখ পূর্বে নির্দিষ্ট করা হয়েছিল তা ঈষৎ পরিবর্তিত করে নিম্নলিখিত তারিখ গ্রহণ করা হোক—প্রথম খণ্ড ৩১ মার্চ, ১৯৫৬; দ্বিতীয় খণ্ড ৩১ মার্চ, ১৯৫৭ এবং তৃতীয় খণ্ড ৩১ মার্চ, ১৯৫৮; (৩) যদি সরকার মনে করেন যে এই সম্পাদক-সমিতি কেবল মাত্র উক্ত ইতিহাসের উপকরণ সংগ্রহ করবেন তাহলে এই সংগ্রহের কাজ ১৯৩৭ সনের ৩১শে মার্চের মধ্যে শেষ হবে।

এই প্রস্তাবগুলিও খুব রহস্যজনক। কয়েক বছরের চেষ্টায় খসড়া তৈরী হল, সদস্যদের নিকট মতামতের জন্য পাঠান হল এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে সেটি গৃহীতও হল। তারপর সরকারকে জিজ্ঞাসা করা হল আমরা ইতিহাস লিখব, না কেবল উপকরণ সংগ্রহ করব। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই মিটিংএর ছয়দিন পূর্বে, ১৯৫৫ সনের ২২শে মার্চ তারিখে দিল্লীতে লোকসভার অধিবেশনে শিক্ষা দপ্তরের পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী ডঃ কে এল শ্রীমালী একটি প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের প্রথম ভাগ অর্থাৎ ১৮৮৪ সন পর্য্যন্ত বিষয়ের খসড়া তৈরী হয়ে গেছে এবং এর পরবর্তী খণ্ড (১৮৮৫-১৯০৫) এখন তৈরী হচ্ছে। এর পর শ্রীগোপাল রেড্ডী নামে একজন সভ্য জিজ্ঞাসা করেন যে কতদিনে এই ইতিহাস রচনা সম্পূর্ণ হবে। তার উত্তরে ডঃ শ্রীমালী বলেন যে আশা করা যায় ১৯৫৬ সন শেষ হওয়ার পূর্বেই সমস্ত খণ্ড তৈরী হয়ে যাবে। ডঃ রঘুবীর সিং জানতে চান কবে প্রথম খণ্ডের মুদ্রণোপযোগী কপি প্রস্তুত করার কাজ শেষ হবে (when the first volume would be finalised for

publication)। এর উত্তরে ডঃ শ্রীমালী বলেন আমি পূর্বেই বলেছি এটি মোটামুটি তৈরী হয়েছে এবং কিছু কিছু সংশোধন বাকী আছে (This is practically ready and it is waiting for revision only)। আর একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমালী বলেন যে আমি সংশোধনের কথাই লিখেছি; পুনর্বার লেখার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এই সমুদয় আলোচনা করলে দেখা যায় যে ২৮শে মার্চ তারিখে সম্পাদক-সমিতিতে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তার সঙ্গে লোকসভায় সরকারের এই উক্তির কোন সঙ্গতি নেই। আশ্চর্যের বিষয় এই যে সম্পাদক-সমিতির প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানর পরেই দেখা গেল তাদের মতের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটেছে।

বিভিন্ন খণ্ড তৈরী করার শেষ তারিখ বাড়ানর জন্য সরকারকে যে অনুরোধ করা হয় সেটি তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেন। লোকসভায় পূর্বোক্ত প্রশ্নোত্তর থেকে যদিও স্পষ্ট দেখা যায় যে সরকার ১৯৬৬ সনের শেষ পর্যন্ত এই বোর্ড রাখা স্থির করেছিলেন তথাপি তাঁরা হঠাৎ সিদ্ধান্ত করলেন ১৯৫৩ সনের শেষেই এই বোর্ড তুলে দেওয়া হবে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে বোর্ডের কাছে আমি একটি প্রস্তাব পেশ করে বলেছিলাম যে সরকার যদি এই বোর্ড তুলে দিয়ে দু'তিন জনের হাতে এই বই লেখার ভার দেন তাহলে আমি এই তিনখণ্ড বই আর এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ করে দেব—এমন প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী আছি। বোর্ডের সম্পাদক এতে তো রাজী হলেনই না, বরং খুবই বিরক্ত হলেন। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার খুব তর্কবিতর্ক হয়। তিনি এমন কয়েকটি মন্তব্য লিপিবদ্ধ করলেন যাতে আমার পক্ষে বোর্ডের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক বজায় রাখা সঙ্গত মনে হল না।

বোর্ডের সভাপতির সঙ্গেও আলাপ করলাম; দেখলাম তিনিও সম্পাদকের সঙ্গেই একমত। এটা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল যে বোর্ডকে বাদ দিয়ে অথবা বোর্ডের সভ্য হিসেবে আমি এই বই লেখার ভার নেব—এই প্রস্তাবে ভারত সরকার, বোর্ডের সভাপতি বা সম্পাদক কারুরই মত নেই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে পূর্বলিখিত ১৯৫০ সনের ২৮শে মার্চ তারিখে সম্পাদক-সমিতির যে অধিবেশনে ডঃ তারাচাঁদের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং সেখানে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে বিষয়ে এই সমিতিতে যে কয়েকজন ঐতিহাসিক সভ্য ছিলেন তাঁরাও ডঃ তারাচাঁদের প্রস্তাব প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে মেনে নিলেন। অর্থাৎ কেউ প্রকাশ্যে

নেনে নিলেন ; এবং বাকী কয়েকজন আমার তৈরী খসড়ার সঙ্গে যে এর গুরুতর প্রভেদ, তা বুঝে এবং নেনে নিয়েও এ বিষয়ে কোন কথাই বললেন না। এই সব কারণে এবং আমার বিশ্বাস হল যে এই গ্রন্থ লেখার দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হয় আমি কোন কৃতিত্ব দেখাবার সুযোগ পাই—এতে তাঁদের মত নেই। সুতরাং ১৯৫৫ সনের অক্টোবর মাসেই সম্পাদকের কতকগুলি মন্তব্যের প্রতিবাদে আমি এই বোর্ডের সদস্যপদ ত্যাগ করতে বাধ্য হই। এ সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্র এখন আমার কাছে নেই ; নিশ্চয়ই তা সরকারী দপ্তরে রাখা আছে। আমি নিজে এ বিষয়ে আপাততঃ আর কিছু বলতে চাই না ; তবে কেবল আর দু'একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

গ্রন্থের তিনটি খণ্ড সমাপ্ত করার জন্যে বোর্ড থেকে সরকারের কাছে ১৯৫৮ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত সময় চাওয়া হয়। ভারত সরকার তাতে রাজী হননি। আমি বোর্ড তুলে দিয়ে এক বছরে বই শেষ করব, এই শর্তে আমার উপর এই বই লেখার ভার দেওয়ার প্রস্তাব করায় বোর্ড ও সরকার সকলেই আপত্তি করেন ; অথচ আমার পদত্যাগের পর বোর্ড তুলে দিয়ে সরকার ডঃ তারাচাঁদকে এই বই লেখার ভার দেন। এর পর ষোল বছর কেটে গেছে কিন্তু এখনও (১৯৭৩) ডঃ তারাচাঁদের গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয়নি। তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৯৬১ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড মাত্র কয়েক বছর আগে বেরিয়েছে ; তাতে ১৯০৫ সন পর্যন্ত ঘটনার বিবরণ আছে। কিন্তু যে তৃতীয় খণ্ডে ১৯০৫ সন থেকে ১৯৪৭ সন পর্যন্ত সময়কার বিবরণ অর্থাৎ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রকৃত বিবরণ থাকবে, সেই খণ্ড আজও প্রকাশিত হয়নি। অথচ শুনতে পাই ভারত সরকার এই গ্রন্থ রচনার জন্য প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা ব্যয় করছেন ; এ কতদূর সত্য জানি না।

দ্বিতীয়তঃ, ডঃ তারাচাঁদের ইতিহাসের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় জনাব হুমায়ুন কবীর বোর্ডের কার্যকলাপ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা যে কতদূর অসত্য তা পূর্বোক্ত বিবরণ পড়লেই বোঝা যাবে। শিক্ষা দপ্তরের সেক্রেটারীর মত একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি যে এভাবে সত্যের অপলাপ করতে পারেন এটা বাস্তবিকই আশ্চর্যের বিষয়। আজ তিনি পরলোকগত। কিন্তু তাঁর জীবিতকালেই ১৯৬২ সনে প্রকাশিত আমার *History of the Freedom Movement in India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষভাগে একটি পরিশিষ্টে আমি তাঁর এই অসত্যভাষণের কথা উল্লেখ করেছি এবং তার প্রমাণও দিয়েছি। এরপরও বহুদিন তিনি

জীবিত ছিলেন ; কিন্তু কোনদিন তিনি এর প্রতিবাদ করতে ভরসা পান নি।

তৃতীয়ত, ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমার মতামত পূর্বেই বলেছি। তাঁর গ্রন্থের প্রথম খণ্ড বাহির হবার কিছুদিন পরেই আমার *History of the Freedom Movement in India* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। *American Historical Review* পত্রিকায় এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা একই সঙ্গে করা হয়। ডঃ তারাচাঁদের বই সম্বন্ধে সমালোচক বলেছেন যে এই গ্রন্থ ভারতবর্ষের পক্ষে অগৌরবজনক এবং এই বই সম্বন্ধে অনেক বিরূপ সমালোচনা এদেশেও বেরিয়েছে। *Bengal Past and Present* পত্রিকায় ডঃ এন কে সিংহ লিখেছেন যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস যে Adam and Eve এর সময় থেকে আরম্ভ হয়নি এটা আমাদের সান্ত্বনার বিষয়। নিজের বই সম্বন্ধে নিজের মুখে কিছু বলা আমার শোভা পায় না। যেসব সমালোচনা আমি পড়েছি তাতে দেখেছি ডঃ তারাচাঁদের পরিকল্পনার চেয়ে আমার পরিকল্পনাকেই পণ্ডিতমণ্ডলী অধিকতর উপযোগী বলে মনে করেছেন। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।

আমার বইয়ের প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডও নিঃশেষিত প্রায় ; নূতন সংস্করণ প্রকাশের ব্যবস্থা হচ্ছে। ডঃ তারাচাঁদের বই কত কপি বাজারে বিক্রী হয়েছে আর কত কপি বিনামূল্যে বিতরিত হয়েছে—ভারত সরকার সে বিষয় অনুসন্ধান করে করদাতাদের মোট কতটাকা এই বইয়ের জন্য এ যাবৎ খরচ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে তা জানালে সে সম্বন্ধে জনসাধারণ একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারে।

(১১)

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা এই স্মৃতিকথায় লেখা আবশ্যক। যে সময় আমি এই বই লেখার ভার গ্রহণ করি তার পূর্ব পর্যন্ত আমার ইচ্ছা ছিল যে নানা কাজে বিব্রত থাকায় Indian Colonies in the Far East Series এর যে সব গ্রন্থ এতদিন প্রকাশ করতে পারিনি, তা এবার শেষ করব। চম্পা (Vietnam) ও যবদ্বীপে (Java) হিন্দু উপনিবেশের কথা তিন খণ্ডে আমি লিখেছিলাম। কম্বোজ সম্বন্ধে ছোট একখানি বই কয়েকটি বক্তৃতার সঙ্কলন হিসেবে প্রকাশ করেছিলাম। কিন্তু কম্বোজ, শ্যাম বা ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে বিস্তৃত ইতিহাস লেখার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করতে পারিনি। হিন্দু উপনিবেশের

ইতিহাস এবার সম্পূর্ণ করব ভেবেছিলাম ; স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা শুরু করার পর সে সঙ্কল্প আমায় ত্যাগ করতে হল। তার প্রধান কারণ সারা জীবন আমি কেবল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসই চর্চা করেছি ; আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চা বিশেষ করিনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে আরম্ভ করে ইংরেজ আমলের ইতিহাস ভাল করে পড়তে হয় ; বিশেষ করে সিপাহী যুদ্ধের কথা লিখতে গিয়ে আমায় অনেক দিন ধরে বহু বই ও দলিল পত্র ঘাঁটাঘাটি করতে হয়। ইচ্ছে ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখা শেষ হলেই আবার হিন্দু উপনিবেশ সম্পর্কে আমার সঙ্কল্প কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করব। কিন্তু ১৯৫৫ সালের শেষ ভাগে যখন এই কাজ থেকে ছুটি পেলাম তখন ছুটি কারণে তা আর হয়ে ওঠেনি। প্রথম কারণ এই যে, এই কাজ থেকে অবসর নেবার সঙ্গে সঙ্গে আমি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় বিদ্যাচর্চা বিভাগে (College of Indology) অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ নিযুক্ত হই। এর একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলা দরকার। আমি যখন দিল্লীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজে ব্যস্ত সেই সময় নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি নূতন বিভাগ খোলার প্রস্তাব করেন এবং ভারত সরকারের নিকট এ বিষয়ে আবেদন করেন। সম্ভবতঃ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছেই এই প্রস্তাব করা হয়। তাঁরা এই সাহায্য দেওয়া উচিত কিনা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আমাকে নাগপুরে গিয়ে সব দেখে একটি রিপোর্ট দেবার জন্য অনুরোধ করেন। তদনুসারে আমি নাগপুর যাই ; সেখানে কয়েকদিন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরী দেখি এবং ইতিহাসের অধ্যাপকদের সঙ্গে আলাপ করি। নাগপুরে এমন একটি বিভাগ খোলা আবশ্যক—এমন অভিমত আমার রিপোর্টে ব্যক্ত করি ; কারণ দক্ষিণ ভারতে আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে অধ্যাপনা বা গবেষণা হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন আমার রিপোর্ট অনুমোদন করেন এবং নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য দিতে রাজী হন।

এর কিছুদিন পরে নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্-চ্যান্সেলার আমাকে একটি চিঠিতে লেখেন যে নাগপুরের একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তাঁর নিজের বৃহৎ বাড়ি এবং কিছু টাকা College of Indology র জন্য দান করতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন ; তাঁর ইচ্ছা আমি এর প্রথম অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করে এই বিভাগটি চালু করি। তাঁর সেই বিশাল বাড়িতে কলেজ হবে এবং আমার থাকার ব্যবস্থাও

হবে। উত্তরে লিখলাম যে দিল্লীতে আমি স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস লিখবার ভার নিয়েছি, কাজেই এখন আর কোন নতুন কাজ নেওয়া সমীচীন হবে না।

এর কিছুকাল পরেই স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লেখার কাজ থেকে বিদায় নিতে হয়, তার কারণ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সংবাদ পেয়ে অথবা অন্য যেকোন কারণে হোক নাগপুরের ভাইস্-চ্যান্সেলার College of Indology-র অধ্যক্ষের পদ গ্রহণের জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করেন। অনেক দিক ভেবে এই কাজ আমি গ্রহণ করি। যে কারণে বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগ দিয়েছিলাম, এখানেও ঠিক সেই কারণে এই পদ গ্রহণ করলাম। মূল লক্ষ্য ছিল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চার কেন্দ্রটি গড়ে তোলা। বেনারসে আমারই তত্ত্বাবধানে Indology বিভাগ প্রথম খোলা হয় নাগপুরেও তাই।

তখনও হিন্দু উপনিবেশের বাকী ইতিহাস লেখার সঙ্কল্প একেবারে ত্যাগ করিনি। কিন্তু নাগপুরে গিয়ে আমার মত পরিবর্তিত হল। যে দু'বছর আমি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় ব্যস্ত ছিলাম সে-সময়ে আমাকে যে ইংরেজ যুগের ভারতের ইতিহাস অনেক পড়তে হয়েছিল, একথা পূর্বেই বলেছি। এই সব বই পড়বার সময় মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস যা লেখা হয়েছে তার চেয়ে ভাল বই লেখা দরকার। কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়াই এ বিষয়ে প্রচলিত প্রামাণিক গ্রন্থ। ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের যে খণ্ডে ইংরেজ যুগের কথা লিখিত হবে সেই খণ্ড লেখার সময় উপস্থিত হল। এর পূর্বে যে ছয় খণ্ড বই বেরিয়েছিল তার বিভিন্ন অধ্যায় লেখার জন্য বিভিন্ন লেখক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাতে অনেক দেরী এবং আরও অনেক অসুবিধা হয়েছিল। কতকটা এই কারণে এবং কতকটা ইংরেজ আমলের ইতিহাস পড়ে আমার এই ধারণা হয়েছিল যে এর সমগ্র ইতিহাস একজন না লিখলে এর পারম্পর্য বজায় থাকবে না এবং এ যুগের ইতিহাস সম্বন্ধে একটি যুক্তিপূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হবে না। সুতরাং মনে মনে স্থির করেছিলাম যে ব্রিটিশ যুগের ইতিহাস আমি একাই লিখব ; কেবল দু' একটি বিষয় যা আমার দ্বারা সম্ভব নয়—যেমন প্রাদেশিক সাহিত্য, শিল্প ও অর্থনীতি—তার জন্য অন্য লেখক নিযুক্ত করব।

নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখলাম সেখানকার লাইব্রেরীতে ব্রিটিশ যুগের প্রচুর বই আছে ; হিন্দু আমলের বই তেমন নেই। সুতরাং নাগপুরে গিয়ে ব্রিটিশ যুগের বই অধ্যয়ন ও লেখা আরম্ভ করি। তারপর প্রায় দশ বারো বছরে এই সিরিজের ব্রিটিশ যুগের যে তিন খণ্ড বই (নবম, দশম, একাদশ) প্রকাশিত

ঘর তার প্রায় সম্পূর্ণই আমার লেখা। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার সম্পাদক-সমিতির সঙ্গে পরিণামে আমার সম্বন্ধ যতই অপ্রীতিকর হোক, তাঁদের কাছে আমি একটি বিষয়ে বিশেষভাবে ঋণী। এই ইতিহাস রচনা উপলক্ষেই ইংরেজ যুগের ইতিহাসের তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং তারই ফলে আমি ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের তিনখণ্ড ইংরেজ যুগের ইতিহাস এবং পৃথকভাবে তিনখণ্ড স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস ও সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস লিখতে সমর্থ হই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায় যে দিল্লী ছাড়বার পরে ভারতীয় বিদ্যাভবন সিরিজের উক্ত তিন খণ্ড ছাড়াও ষষ্ঠ খণ্ড লেখার অনেকটা দায়িত্বও আমাকে নিতে হয়। ষষ্ঠ খণ্ডে মুসলমান যুগের কথা লেখা হয়। তখন পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল মুসলমান অধ্যাপকদের লেখা দেবার কথা ছিল তাঁরা লিখতে রাজী হলেন না। আমি তখন ডঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ এবং কালিকারঞ্জন কানুনগোকে ঐসব অধ্যায় লেখার জন্য অনুরোধ করি। কে এম মুন্সী তখন উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল। কোন কারণে এঁরা দু'জনেই তাঁর উপর অপ্রসন্ন ছিলেন এবং যেহেতু মুন্সীজী ভারতীয় বিদ্যাভবনের পরিচালক বা পৃষ্ঠপোষক সেজন্য তাঁরা লিখতে রাজী হলেন না। তখন অনন্যোপায় হয়ে আমি যতদূর সম্ভব মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠ করে এই খণ্ডের অনেকগুলি অধ্যায় লিখি। সুতরাং যদিও আমি জীবনের বেশীর ভাগ সময়ই প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় অতিবাহিত করেছি তথাপি কতকগুলি অভাবিত এবং অপ্রত্যাশিত কারণে আমাকে ভারতের মধ্যযুগের এবং বর্তমান যুগের ইতিহাসও গভীরভাবে চর্চা করতে হয়েছে। এইরূপে দিল্লী ছাড়বার পর প্রায় বারো বছর (১৯৫৬-১৯৬৮) আমি একাজে নিযুক্ত থাকায় প্রাচীন হিন্দু উপনিবেশ সিরিজ সম্পূর্ণ করতে পারিনি। তবে এর ফলে আমার ধারণা হয়েছে যে ভারতের ইতিহাসের তিনটি যুগের ইতিহাস জানা না থাকলে কোন যুগ সম্বন্ধেই একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মায় না। বিদ্যাভবন সিরিজে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের যে বই লিখেছি তার খুব প্রতিকূল কোন সমালোচনা আমি দেখিনি; বরং অনেক প্রশংসামূলক সমালোচনা বেরিয়েছে।

এর জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের সম্পাদক-সমিতির নিকট আমার ঋণের কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এই সমিতির যে সম্পাদকের সঙ্গে মনোমালিন্য-বশতঃ আমাকে বিদায় নিতে হয়, তিনিই বিশেষ আগ্রহে আমাকে এই কাজের

জন্য মনোনীত করেন এবং পণ্ডিত নেহরু এবং মৌলনা আজাদ সাহেবকে দিয়ে আমাকে আমন্ত্রণ করেন। তাঁর সম্বন্ধে পূর্বে অনেক বিরূপ মন্তব্য করেছি; উপসংহারে তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

মানুষের জীবনে এমন অনেক গুরুতর ঘটনা অথবা পরিবর্তন ঘটে যা দৈব বলেই মনে হয়। এম. এ পরীক্ষা পাশ করার পর প্রায় পঞ্চাশ বছর ভারতের প্রাচীন যুগের ইতিহাসই আমার ঐতিহাসিক গবেষণার একমাত্র বিষয়বস্তু ছিল। জীবনের অপরাহ্ণে প্রায় সত্তর বছর বয়সে যে আমি নূতন কোন বিষয়ের গবেষণায় আত্মনিয়োগ করব—এটা কখনও ভাবিনি; আমার কল্পনায়ও কখনও আসেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা উপলক্ষ্যে আমার ঐতিহাসিক গবেষণা সম্পূর্ণ ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত হল—এটা আমার কাছে দৈব ঘটনা বলেই মনে হয়। তবে এর ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তার বিচার করবার ভার আমার উপর নয়, শক্তিও আমার নেই। একদিকে যেমন হিন্দু উপনিবেশের ইতিহাস সম্পূর্ণ করতে পারিনি, অন্যদিকে তেমনি মধ্য ও আধুনিক যুগের সম্বন্ধেও অনেক বই ও প্রবন্ধ লিখেছি। এর ভাল-মন্দ লাভ-ক্ষতির হিসাব ভবিষ্যদ্বংশীয়দের হাতে ছেড়ে দিয়ে আমি এই প্রসঙ্গের উপসংহার করি।

(ক্রমশঃ)

বাংলার নবজাগরণ ঃ কয়েকটি প্রশ্ন

অমলেন্দু দে

সম্প্রতি রামমোহনের দ্বিশত জন্মবর্ষ উপলক্ষে নতুন করে রামমোহন ও বাংলার নবজাগরণ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। স্বভাবতই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদের মনে অনেক প্রশ্ন জন্ম হচ্ছে। আমার মনেও যে সব প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তাই এখানে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। এই আলোচনার প্রধানত: তিনটি অংশ আছে : (ক) রামমোহন, রাধাকান্ত ও ডেভিড হেয়ার এর ভূমিকা ; (খ) মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন ; (গ) জাতীয় চেতনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি রচনায় কৃষক আন্দোলনের ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিচালিত উদারনৈতিক-জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারার ভূমিকা।

(১) রামমোহন রায় (১৭৭২?—১৮৩৩ খ্রী):

রামমোহন প্রসঙ্গে কোন কোন লেখক এমনভাবে বিভিন্ন ঘটনাবলী পরিবেশন করছেন যার ফলে সমসাময়িক ভারত ইতিহাসের পটভূমিকায় রামমোহনের ভূমিকা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে না, আর ইংরেজ শাসনের প্রকৃত রূপটিও ধরা পড়ে না। স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে : রামমোহনের আগেও কি ধর্ম-সমাজ সংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায়? তার কি কোন প্রভাবই আমাদের জীবনে ছিল না? প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে উদার যুক্তিশীল মননের পরিচয় আমরা পাই। আর নানাভাবে তার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগেও আমাদের জীবনে উদারতা ও যুক্তিশীলতার একটি প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। অবশ্য বিভিন্ন যুগে এই ধারাটি নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়। ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকরূপে রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে হিন্দু সমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় গ্রুপ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের স্বপক্ষে, জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়। কয়েকটি গ্রুপের নাম এখানে উল্লেখ করা হল : কর্তাভজা, বলরামী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহনী, ন্যাড়া, সহজী, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সংযোগী, বহুপাতিয়া প্রভৃতি। হিন্দুসমাজের নীচু তলার অব্রাহ্মণ সংস্কারকেরাই কলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলে এইসব ধর্মীয় গ্রুপ গঠন করেন। অবশ্য কোন কোন গ্রুপের শাখা কলকাতাতেও ছিল।

মুসলমানেরাও কোন কোন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হতে পারতেন। এইসব গ্রুপের উপর সহজমত, নাথমত ও নিরঞ্জন মতের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাছাড়া তাদের উপর মুসলমান ভাব ও সাধনার প্রভাবও পড়ে। কবীর, দাদু প্রভৃতির প্রভাবও খানিকটা পাওয়া যায়। এরা "জাতি, পংক্তি, প্রতিমা ও শাস্ত্র মানেন না।" এদের মধ্যে হিন্দু মুসলিম বলেও "কোন বাদ-বিবাদ" নেই। কোন কোন গ্রুপে মুসলমান গুরুর নিকট ব্রাহ্মণ পর্যন্ত দীক্ষা গ্রহণ করতে পারত। কোন কোন গ্রুপের মুসলমান সভ্য সহ প্রায় কুড়ি হাজার সভ্য ছিল। কর্তাভজাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অক্ষয় কুমার দত্ত লেখেন যে, "লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে।" এদের যে গণভিত্তি ছিল তা এই সব তথ্য থেকে বোঝা যায়। এইসব ধর্মীয় গ্রুপ হিন্দু সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকে আঘাত করে এবং এক আলোড়নের সৃষ্টি করে। মনে রাখা দরকার, এই সব গ্রুপের সাধকেরা কেউ ইংরেজি শিক্ষিত ছিলেন না অথবা ইংরেজ কর্মচারীদের সংস্পর্শেও আসেন নি। এইসব গ্রুপের প্রভাব রামমোহনের উপর কতটা পড়েছে তা নিয়ে নিশ্চয়ই আলোচনার অবকাশ আছে। তবে এইসব গ্রুপের ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ভারতবর্ষের সবটাই মধ্যযুগীয় তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল না। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে রস আহরণ করে অনেক সাধক ও সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা গ্রাম বাংলায় আলো বিকিরণ করেছিলেন—এক উদার মানবতাবাদী ভাবধারা প্রচার করেছিলেন। আমরা কলকাতা শহরের প্রভাবশালী শিক্ষিত হিন্দু বাঙালীদের কথাই মনে রেখেছি। কারণ কর্মে ও চিন্তায় আমরা নিজেদের তাঁদেরই আত্মজ মনে করি। গোটা বাংলার প্রাণ প্রবাহের অংশীদাররূপে নিজেদের ভাবতে পারি না। তাই গ্রাম বাংলার সংস্কারকদের কথা আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি অথচ এইসব গ্রুপের গণভিত্তি রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মসভার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতেও এই ধরণের ধর্মীয় গ্রুপের পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধর্মীয় গ্রুপগুলির (অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর) ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে এদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।[১]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, বাংলা দেশের উত্তর অঞ্চলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বাউল ও ফিকির নামক মতবাদ প্রভাব বিস্তার করে। এদের ঠিক কোন জাতি বা কোন সম্প্রদায় বলে উল্লেখ করা যায় না। এরা না ছিল মুসলমান, না

ছিল হিন্দু। অবশ্য বাউলরা কতক পরিমানে মুসলমান ছিল। ইসলামের বিশুদ্ধতা রক্ষার নামে এদের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী করে এদের সংখ্যা কমানোর চেষ্টা হয়। রংপুর জেলায় ও উত্তরবঙ্গের কতগুলি স্থানে বাউল জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। ময়মনসিংহের পূর্বদিকে মেঘনা নদীর তীরে জিকির জাতির বাসস্থান। বাউল ও জিকিরদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমানের গোঁড়ামির কোনটাই ছিল না। এরা সঙ্গীতের মাধ্যমে সাধনা করে এবং উদারমত পোষণ করে। কিছুটা বৈষ্ণব, কিছুটা সুফী মতবাদ এদের অনুপ্রাণিত করে।২ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে করম শা নামক একজন ফকির সুসঙ্গ পরগণায় গারো ও হাজংদের সাম্যমূলক পাগলপন্থী বা বাউল ধর্মে দীক্ষিত করেন। পাগলপন্থী ধর্মের মূলনীতি সত্যনিষ্ঠা, সকল মানুষের মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সহজেই গারো ও হাজংদের আকৃষ্ট করে, আর জমিদারের নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের অনুপ্রাণিত করে। তাদের মধ্যে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়। কিন্তু ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

বাংলাদেশে রামমোহনের সমসাময়িক ছিলেন মরমী কবি লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০ খ্রী)। এই বৎসরের (১৩৭৯ বাংলা সন) ১ কার্ত্তিক লালন শাহর দ্বিশততম জন্মবার্ষিকী পূর্ণ হল। কিন্তু এই উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গে কোন প্রবন্ধ বা আলোচনা সভা চোখে পড়েনি। অথবা রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর সম্পর্কে কোন আলোচনাও কোথাও দেখেছি বলে মনে হয় না। তাঁর বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গের কুষ্টিয়ার ছেউরিয়া গ্রামে। এই সর্বত্যাগী বাউল কবি লালন ফকির নামেই খ্যাত ছিলেন। তিনি সারা জীবন ধরে অজস্র সঙ্গীতের মাধ্যমে নিজের ধর্ম ও দর্শনকে রূপ দিয়েছেন। লালনের পরে তাঁর শিষ্য দুদ্দু শাহ লালন-দর্শন প্রচার ও ব্যাখ্যা করেন। ত্রিশ বৎসর একটানা পরিশ্রম করে ছেউরিয়া গ্রামের পার্শ্ববর্তী হরিণাকরপুর গ্রামের অধিবাসী মকবুল আলি সাঁই লালন ফকির সহ বিভিন্ন বাউল সাধক ও মরমী কবি রচিত চার হাজার বাউল তথা মরমী গান সংগ্রহ করেছেন। এইসব গান নিয়ে আলোচনা করলে বাউল ধর্ম ও দর্শনের প্রভাব উপলব্ধি করা যায়।৩

রামমোহনের সমসাময়িক যে সব সংস্কারক অন্যত্র ছিলেন তাঁদের কথা মনে রাখলে সর্বভারতীয় ইতিহাসের পটভূমিকায় রামমোহনের ভূমিকা আমরা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ রামমোহনের সমসাময়িক দেবরাজ (জন্ম ১৭৭১ খ্রী) ও পলটু সাহব (১৭৫৭-১৮২৫ খ্রী) এর কথা বলা চলে। দেবরাজ নারনৌল জেলার ধারস্থ গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প

বয়সেই কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে তাঁকে আগ্রা যেতে হয়। সেখানে তিনি এক দেওয়ানের বাড়িতে কাজে ঢোকেন এবং হিন্দু-মুসলমান সাধকদের সংস্পর্শে আসেন। এইভাবে তিনি ধর্মজীবন লাভ করেন এবং ৩৩ বৎসর বয়সে "স্বাধীন ও উদারমত প্রচার করতে আরম্ভ করেন"। তিনি জাতিভেদ প্রথার সমালোচনা করেন এবং নিজে বৈশ্য সম্প্রদায়ের কন্যাকে বিবাহ করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আগ্রা থেকে দেশে ফিরে এসে তিনি পৌত্তলিকতার এবং জাতিভেদ ও পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করেন। তাঁর শাস্ত্র বিরুদ্ধ মতের জন্য নারনৌলের শাসক ঝাঝরের নবাব নজাবত আলি তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। বন্দী অবস্থায় বহুদিন তাঁকে দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে হয়। ঝাঝরের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য তিনি জেল থেকে মুক্ত হতে পারেন। তারপর তিনি খেতরী জেলার ছুরীনা গ্রামে তাঁর মত প্রচার করতে থাকেন। সেখানেই ৮১ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তারপরে তাঁর শিষ্যরা এই ধর্মমত প্রচার করেন। ঝাঝর, নারনৌল ও গুরগাঁওতে এই সম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল। গুরগাঁও জেলার ভীরানীতে তাঁদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই মতের সাধকেরা একেশ্বরবাদের সমর্থক। তাঁরা মনে করেন, সাধনায় স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার আছে। এই সম্প্রদায়ের মহিলারা পর্দা মানেন না। উপাসনা সঙ্গীত মেয়েরাই করে থাকেন। তাঁরা হিন্দু-মুসলমান উভয় সাধনার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল। তাঁরা রামায়ণ, মহাভারত থেকে নীতি উপদেশ নিলেও এইসব শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করেন না। আর চলতি ভাষাতেই তাঁদের বাণী প্রচার করা হয়। ভাবতে দুঃখ হয় যে, দেবরাজের মত একজন বলিষ্ঠ মানুষ আমাদের প্রায় অজ্ঞাতই রয়ে গেছেন।[৫]

এই যুগের আর একজন সাধক হলেন পলটু সাহব। কবীরের ভাবের সঙ্গে তাঁর ভাবের গভীর মিল থাকায় তাঁকে দ্বিতীয় কবীর বলা হয়। পলটু সাহব ফৈজাবাদ অযিরৌলার অধিবাসী গোবিন্দর শিষ্য ছিলেন। পলটু সাহব ফৈজাবাদ জেলার নগপুর-জলালপুর গ্রামে এক বানিয়া বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গৃহে থেকেই তাঁর মত প্রচার করেন। কিন্তু গ্রামের লোকেরা নানাভাবে তাঁকে গঞ্জনা দেয়। খুবই সুন্দর ভাষায় তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। তিনি যে মত প্রচার করেন তা তাঁর ভাষাতেই উল্লেখ করছি : "নীচ জাতিকে নষ্ট করিল উচ্চ জাতিরা, এবং নিজেরাও নষ্ট হইল। যে সত্যকে দেখিয়াছে তার আর দেশ বিদেশ নাই। প্রত্যক্ষ সত্য বড় সত্য নহে, অন্তরে দেখা সত্যই বড়। সাধকের সংযম ও বীর্য্য চাই। ভগবান্ কোন সম্প্রদায়-বিশেষের সম্পত্তি নহেন। জাতি-পংক্তির

ক্ষুদ্র পরিচয় ছাড়। নম্রতায় দোষ নাই। মধুর হও, সেবাব্রত হও। সহজ সত্যকে সহজ না হইলে পাওয়া যায় না। সত্য আছে অন্তরে—বাহিরে খোঁজা বৃথা। যে মানবের মধ্যে দেবতাকে না দেখিল সে মন্দির হইতে দেবতাকে নির্ব্বাসন দিল।" পলটু সাহবর মতাবলম্বীর সংখ্যা প্রচুর ছিল। "ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র এই সম্প্রদায়ের সাধক" ছিলেন।* এই ধরনের অনেক সাধক ভারতবর্ষে ছিলেন। অনেকদিন আগে অপরিসীম পরিশ্রম করে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ভারতের মধ্যযুগের উদার মানবতাবাদী সাধনার ধারা পুনরুদ্ধার করেন। বিভিন্ন সাধকদের মতবাদ ও কার্যাবলী আলোচনা করে তিনি মন্তব্য করেন: "রামমোহন রায়ের অল্প পূর্ব্বে বর্ত্তমান কালের শিক্ষা না পাইয়াও ইঁহারা অভ্রান্ত শাস্ত্র, জাতিভেদ, পৌত্তলিকতা না মানিয়া সকল ধর্ম্মের ভ্রাতৃত্ব স্বীকার করিয়া এক অপ্রতিম ঈশ্বরের উপাসনা ঘোষণা করিয়াছেন।"† ক্ষিতিমোহন সেনের আশা ছিল উৎসাহী গবেষকেরা যদি এই ধারাটিকে পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হন তাহলে আরও অনেক হিন্দু-মুসলিম সাধকের পরিচয় পাওয়া যাবে। তিনি নিজে প্রায় দুইশতজন সাধকের পরিচয় সংগ্রহ করেছেন। তাঁর আশঙ্কা ছিল যে, এখনই উদ্যোগী না হলে এইসব সাধকের কথা অবলুপ্তির গহ্বরে চলে যাবে। তিনি বলেন: "ক্ষেত্র বিরাট, কিন্তু কাজ করিবার লোক কৈ? এইসব দিকে কয়জন লোকের অনুরাগ আছে?" ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধর মুখার্জি লেক্‌চর' দেবার সময় তিনি এইসব মন্তব্য করেন। তারপরে অনেক বছর কেটে গেছে।‡ কিন্তু ক্ষিতিমোহন প্রদর্শিত পথে গবেষকেরা আর অগ্রসর হননি। এমনকি যে ধারাটি তিনি পুনরুদ্ধার করেছিলেন তার প্রতিও এক অবজ্ঞার ভাব বর্ত্তমানে কোন কোন লেখকের রচনায় পাওয়া যায়। কারণ তাঁদের ধারণা মধ্যযুগের সব কিছুই তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল। ইংরেজ শাসনে ও পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে মধ্যযুগের তমিস্রা কেটে যায়, এক আধুনিক যুগের সূত্রপাত হয়। তাঁরা মধ্যযুগের সাধনার ধারাটিকে কোন গুরুত্ব দিতে প্রস্তুত নন। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগে ভাবজগতের এই আলোড়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক জীবনেও যে কিছু কিছু নতুন উপকরণ, যা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার অঙ্গীভূত, প্রকাশিত হতে থাকে, তাও তাঁরা আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করেন না। ফলে আমাদের জীবনধারার নিজস্ব প্রবাহটি আমরা উপলব্ধি করতে পারি না।

ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে রামমোহনের মনোভাব নিয়ে যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন আলোচনায় দেখানোর চেষ্টা হয়: রামমোহন ভারতে ব্রিটিশ শাসন

সমর্থন করেন। ব্রিটিশ সরকারের ন্যায়পরায়ণতার উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল। তিনি ভারতে ব্রিটিশ কলোনাইজেশন সমর্থন করেন। এমন কি ব্রিটিশ নীলকরদেরও তিনি প্রশংসা করেন। কারণ তাঁর মতে নীলকরেরা দেশের উপকার সাধন করছে। তাছাড়া তিনি ভারতীয়দের সভ্য করার বিষয়ে ইংরেজের ভূমিকার প্রশংসা করেন। উপরন্তু তিনি ছিলেন জমিদারী প্রথার সমর্থক। মোটকথা, দেশাত্মবোধের বাস্তব প্রকাশ রামমোহনের মধ্যে পাওয়া যায় না।[৯] যেসব উক্তি এখানে উল্লেখ করা হল তার যথাযথ বিশ্লেষণের প্রয়োজনে সমগ্র রামমোহনকে সামনে রাখা দরকার এবং যুগের সীমার কথাও মনে রাখা উচিত। প্রধানত রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়েই এখানে আলোচনা করছি। একখানি পুস্তিকায় রামমোহন ভারতবর্ষের সীমানা ও ইতিহাস সম্পর্কে নিজের মতামত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। এখানে তিনি প্রাচীনকাল থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানীর শাসনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। তিনি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমানার বিবরণ দিয়ে ভারতবর্ষের ঐক্যবদ্ধ রূপ তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি ভিত্তি করে চিরকালই ভারতবর্ষের এক অখণ্ড ভাবমূর্তি ছিল। তিনি একথাও বলেন, ইউরোপের সংস্পর্শে এসে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের স্থাবরতা হ্রাস পাবে এবং এখানে একটি গতিশীল শক্তির সৃষ্টি হবে। তাই তিনি এই দেশের মঙ্গলের জন্যই ইংরেজ প্রভুত্ব কামনা করেন। সর্ব বিষয়ে উন্নতি সাধন করায় তিনি ইউরোপের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি একথাও মনে করেন যে, রাজতন্ত্রে মানুষের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন হয় না। তিনি নিয়মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকেই শ্রেষ্ঠ মনে করেন। ভারতবর্ষের সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতি তিনি বিরূপ ছিলেন। তাঁর মতে, কর্ণওয়ালিশের আমলেই ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় হয় এবং ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে শাসনতন্ত্রের প্রতিটি বিভাগে, বিশেষ করে ভূমি রাজস্ব ও বিচার বিভাগে, পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে রামমোহন মন্তব্য করেন : "These changes approximating to the institutions existing in England, are calculated to operate beneficially, if regularly reduced to practices." কি কারণে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল ? এই প্রশ্ন নিয়েও রাম-মোহন আলোচনা করেন। তাঁর মতে, দেশীয় শাসকেরা পরস্পর কলহে লিপ্ত থাকায় ও কাপুরুষ হওয়ায় এবং প্রাচ্যের অজ্ঞানতা, এই সব কারণেই এই বিপর্যয় হয়। আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতি এবং নৌবহর ও সামরিক শক্তির সাহায্যেই ইংরেজরা সাফল্য অর্জন করে।[১০]

উপরে বর্ণিত আলোচনা থেকে ও রামমোহনের অন্যান্য রচনাবলী থেকে আমরা জানতে পারি, রামমোহন ব্রিটিশ শাসনকে মধ্যযুগের শাসনব্যবস্থা থেকে উন্নততর মনে করেন এবং তাঁর ধারণা হয় যে, ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্ক নতুন জীবন গঠনে সহায়ক হবে। ইংলণ্ডের মতই নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি প্রচলিত হলে সাধারণ মানুষের উপর নিপীড়ন অনেকটা কমে যাবে। গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ব্যক্তির স্বাধীকারবোধের এমন বিকাশ ঘটাবে যার ফলে মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যাবে। রামমোহনের ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই। ইংলণ্ডে পার্লামেন্টারী শাসনে ওখানকার অধিবাসীরা যে সব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে সে সব অধিকার ভারতীয়দেরও প্রাপ্য। এই ছিল রামমোহনের ধারণা। এই কারণেই রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার জন্য এতটা উদ্যোগী হন। তাঁর ধারণা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা না থাকলে গণতান্ত্রিক প্রশাসন গড়ে তোলা সম্ভব নয়। প্রজাবর্গের অভাব অভিযোগ প্রকাশের ব্যবস্থা না থাকলে বিপ্লব ঘটতে পারে। কিন্তু স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্র তা নিবারণ করতে পারবে। তাতে ইংরেজ শাসনও শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হবে।

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রামমোহন বিশ্ববিধাতাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। কারণ তাঁর ধারণা ছিল, ইংরেজ জাতি কেবলমাত্র নিজেই Civil and political liberty ভোগ করে না, অন্যজাতিকেও সে সুযোগ-সুবিধা দেয়। প্রশ্ন হল: কতকাল ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন করবে? এই বিষয়ে রামমোহনের ধারণা কি? যিনি বিদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে উৎসাহ প্রদর্শন করেন, আর দাসপ্রথার অবসানে উল্লসিত হন, তাঁর পক্ষে চিরকাল ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই রামমোহন আশা পোষণ করেন যে, ভারতবর্ষ ইউরোপের বিজ্ঞান ও মানববিদ্যার সাহচর্য পেলে এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ধারণা লাভ করলে অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জানাবে। রামমোহন মনে করেন যে, ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্য চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর এই দেশে ব্রিটিশ শাসন থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও গণতন্ত্র ভারতবাসীর চিন্তায় আমূল পরিবর্তন আনলে আর বিদেশী শাসনের প্রয়োজন হবে না।[১১] একই উদ্দেশ্য নিয়ে রামমোহন ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দের বসবাস করার নীতি সমর্থন করেন। এই বিষয়ে তাঁর সমগ্র রচনাটি (On Settlement in India by Europeans) পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই তিনি এর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে সর্ব সচেতন ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন গণতান্ত্রিক আদর্শে আলোক

প্রাপ্ত এবং ব্যবসা, বাণিজ্য ও কৃষিতে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যদি বসবাস সুরু করেন তাহলে সবদিক থেকেই ভারতবর্ষের পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে। তাঁর মতামত নিঃসন্দেহে বিতর্কমূলক।[১১] কিন্তু এই প্রশ্ন আলোচনায় আমরা যদি ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংলণ্ডে কলোনাইজেশন নিয়ে যে বিতর্ক হয় তা লক্ষ্য করি তাহলে আরও ফলপ্রসূ আলোচনা করা সম্ভব হয়। নেপোলীয় যুদ্ধের পরেই ইংলণ্ডের অর্থনৈতিক সমস্যা প্রকট হয়ে ওঠে। বেকার সমস্যা, অল্প মজুরী ও পুওর রিলিফের জন্য যে অর্থনৈতিক বোঝা ইংলণ্ডের কাঁধে চাপে তার ফলেই ইমিগ্রেশন থিওরি নিয়ে আলোচনা সুরু হয়। কলোনাইজেশন মারফত উদ্বৃত্ত শ্রমের (surplus labour) ও উদ্বৃত্ত পুঁজির (surplus capital) সমস্যা সমাধানের কথা চিন্তা করা হয়। ১৮২৬-১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যে 'ইমিগ্রেশন কমিটি' নিয়োগ করে তার রিপোর্ট সমূহ পাঠ করলেই তৎকালীন অর্থনৈতিক সমস্যার ও ইমিগ্রেশন থিওরির বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায়। তাই এই রিপোর্ট সমূহ সামনে রেখে যদি আমরা রামমোহন কর্তৃক প্রচারিত ইউরোপীয়ান সেটলমেণ্টের সমস্যাটি আলোচনা করি তাহলে তাঁর মতামত আমাদের কাছে আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।[১২]

তখন অবাধ বাণিজ্য নীতির সঙ্গে একচেটিয়া বাণিজ্য নীতির দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। রামমোহন কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকারের বিরোধিতা করেন। মনে রাখা দরকার, ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪ খ্রী) ও রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩ খ্রী) রামমোহনের সমসাময়িক ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০ খ্রী) তাঁদের সকলের চেয়ে বয়সে বড় ছিলেন। অ্যাডাম স্মিথের Wealth of Nations প্রকাশিত হয় ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে। ম্যালথাসের Essay on Population প্রকাশিত হয় ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে। রিকার্ডোর Principles of Political Economy and Taxation প্রকাশিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে। মজুরী, খাজনা, অবাধ বাণিজ্য নীতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহন যে সব মতামত ব্যক্ত করেন তাতে এই তিনজনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য মন্টেস্কু, ব্লাকস্টোন ও বেন্থামের প্রভাবও তাঁর উপর ছিল।[১৩] অর্থ-নীতির ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার ফলে পণ্যের দাম বৃদ্ধি পাবে, কৃষি মজুর ভালো মজুরী পাবে ও গরীব কৃষকদের উপর অত্যাচার কম হবে—এই সব চিন্তা রামমোহন করেন। অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে মূলধনের মালিক এমন ইউরোপীয়েরা এদেশে এলেও পুঁজি লগ্নী করলে দেশের কল্যাণ হবে। কৃষি পণ্যের উন্নতি হবে। জমি-জমার মূল্য বৃদ্ধি পাবে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই কৃষিপণ্যের

চাহিদা বৃদ্ধি পায়। রামমোহন লক্ষ্য করেন ইউরোপীয়ান নীলকর কর্তৃক নীলচাষ প্রবর্তনে কৃষি ব্যাপারে জেলাগুলিতে উন্নতি সাধিত হয়েছে। অনেকে নীলের কারখানায় কাজ পেয়েছে। নীলকুঠি সংলগ্ন অঞ্চলে রাস্তাঘাটের উন্নতি ও স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়েছে। নীলকরেরা আশেপাশের লোকদের উন্নতি সাধন করেছে এবং জাতীয় ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছে। রামমোহন নীলকরদের দুর্ব্যবহার সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ছিলেন। তবে বেন্টিঙ্ক ও দ্বারকানাথের মত তাঁরও মনে হয়েছে নীলকরেরা যে উপকার করছে তার তুলনায় "তাদের কদাচিৎ দুর্ব্যবহার ধর্তব্যের মধ্যেই নয়"। তাঁরা মনে করেন, যেখানে যেখানে নীলের কারখানা বসেছে সেখানকার চাষীরা যেখানে নীলের চাষ নেই সেই সব এলাকার চাষীদের চেয়ে অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নত। নীল চাষের ফলে অনেক অনাবাদী জমিতে চাষ হয়েছে। নীলের চাষ ও ব্যবসায়ের ফলে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ উভয়েই লাভবান হচ্ছে। কিন্তু নীলচাষ যে প্রথম থেকেই নিপীড়নমূলক ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে তা রামমোহন বুঝতে পারেননি।[১৩]

লবণের ব্যবসা নিয়েও রামমোহন যে মতামত ব্যক্ত করেন তা নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। তখন ভারতবর্ষের তুলনায় ইংলণ্ডে লবণের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম ছিল। রামমোহন বলেন যে, ভারতবর্ষে ইংলণ্ড থেকে লবণ আমদানীর ব্যবস্থা করলে ভারতীয়রা খুশীই হবে। কারণ তারা অল্প মূল্যে লবণ কিনতে পারবে। অবশ্য রামমোহন উপলব্ধি করেন, এর ফলে মলাঙ্গীরা বেকার হবে। তাই তিনি তাদের জন্য কর্মসংস্থানের পরামর্শ দেন। তাঁর মতে, যদি লবণের ব্যবসায় সরকারের একচেটিয়া অধিকার থাকে তাহলে খালাসিতে তাদের কিছু কর্ম সংস্থান হতে পারে। তাছাড়া কৃষিতে এবং অন্যান্য কাজে তাদের নিয়োগ করা যেতে পারে, যথা—বাগানের মালী, বাড়ির চাকর ও দিনমজুর হিসেবে। রামমোহন মলাঙ্গীদের দুরবস্থার কথাও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আইন পাশ হলেও তাদের দুর্দশার কোন লাঘব হয়নি।[১৪]

ইংরেজ শাসন সম্পর্কে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের মনোভাব কি এই বিষয়ে রামমোহনের অভিমত হল এই : (ক) কৃষক ও গ্রামের লোকেরা পূর্বের ও বর্তমান সরকার সম্পর্কে অজ্ঞ এবং উদাসীন। তাদের ধারনা, তারা যে বিপদ হতে রক্ষা পাচ্ছে অথবা অত্যাচারিত হচ্ছে তা তাদের অঞ্চলের সরকারী কর্মচারীদের আচরণের ফলেই হচ্ছে। (খ) কিন্তু যাদের উচ্চাশা আছে এবং যে সমস্ত প্রাচীন পরিবারের লোকেরা বর্তমান শাসনব্যবস্থার ফলে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে,

তারা ইংরেজ সরকারের অধীনে সামান্য চাকুরি গ্রহণ করা অপমানজনক মনে করে এবং তারা এই শাসনব্যবস্থার প্রতি সুনিশ্চিতভাবে অসন্তুষ্ট। (গ) আর যারা ব্যবসা বাণিজ্য করে সম্পদশালী হয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারী অর্জন করেছে এবং যারা ব্রিটিশ শাসনের অধীনে ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছে, তারা শুধু এই ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেয়নি, তারা ব্রিটিশ শাসনকে দেশের পক্ষে আশীর্বাদস্বরূপ মনে করে। ভারতীয়দের এই তিনটি অংশে ভাগ করে রামমোহন মন্তব্য করেন যে, ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা বুদ্ধিমান তাঁরা মনে করেন যে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরির ব্যবস্থা থাকার উপরেই সরকারের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক নির্ভর করে। রামমোহন লেখেন : "But I have no hesitation in stating, with reference to the general feeling of the more intelligent part of the native Community, that the only course of policy which can ensure their attachment to any form of government would be, that of making them eligible to gradual promotion, according to their respective abilities and merits, to situations of trust and respectability in the state".[১৭] উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পক্ষ থেকে রামমোহন যে মনোভাব ব্যক্ত করেন তা কি নিছক ইংরেজ তোষনের পর্যায়ে পড়ে ?

কোম্পানীর শাসনের চেয়ে পার্লামেন্টারী শাসনপদ্ধতিই রামমোহনের নিকট ভালো মনে হয়েছে। তাঁর কাছে ব্রিটিশ গণতন্ত্রই ছিল সবচেয়ে উন্নত। তাঁর মতে, ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংলণ্ডের সম্পর্ক তখনই স্থায়ী হতে পারে যদি ভারতবর্ষকে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের তত্ত্বাবধানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুযায়ী শাসন করা হয়। রিফর্ম বিলের সময় ইংলণ্ডের পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে নবপর্যায়ের সূচনা দেখে তিনি উল্লসিত হন। তাঁর নিকট এই বিলের পক্ষ ও প্রতিপক্ষের লড়াই প্রকৃতপক্ষে ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের লড়াই ছিল। তখন যারা ইংলণ্ডে কায়েমী স্বার্থের সমর্থক ছিল তাদের সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। এই অংশই রিফর্ম বিলের বিরোধিতা করে। রামমোহন লেখেন যে, যারা জনসাধারণকে নিঃশেষ করে দিয়ে নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধি করছে সমগ্র জাতি তাদের শিকারে পরিণত হতে পারে না। তাদের দেখে রামমোহনের আশঙ্কা হয়েছিল হয়তো রিফর্ম বিল গৃহীত নাও হতে পারে। যদি তাই হয় তাহলে তিনি ইংলণ্ডের প্রতি শ্রদ্ধা হারাবেন এবং ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করবেন। এই মনোভাব থেকেই বোঝা যায় এই রিফর্ম বিল সম্পর্কে রামমোহনের কত গভীর প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু তাঁর আশাভঙ্গ হতেও দেরী হয়নি।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি লেখেন যে, পার্লামেন্ট ইংলণ্ডের জনসাধারণকে হতাশ করেছে। এই সময়ে রামমোহন সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। ১৮৩২ অথবা ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংলণ্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রবার্ট আওয়েনের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি রামমোহনকে সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করেন। আওয়েনের সমাজতান্ত্রিক প্রোগ্রামের প্রতি রামমোহন আকৃষ্ট হলেও আওয়েনের মত তিনি ধর্মকে সম্পূর্ণভাবে বর্জন করতে সম্মত হননি। তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যের প্রধান বিষয় ছিল ধর্ম। রামমোহন মনে করতেন মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের এক সাহায্যকারী ভূমিকা আছে। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আওয়েনের পুত্রকে লেখা রামমোহনের চিঠিতে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। যেসব সামান্য তথ্য পাওয়া গেছে তা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে ধর্মকে বাদ দিয়ে সমাজতন্ত্রকে গ্রহণ করা রামমোহনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর সুরু থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ধর্মনির্ভর যুক্তিবাদই ছিল রামমোহন চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য। আধ্যাত্মিকতা ও যুক্তিবাদের অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ তাঁর মধ্যে ঘটে।[১৮]

কোন কোন লেখক 'জমিদার রামমোহনকে' ইংরেজ সৃষ্ট মূল কৃষি কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য সমালোচনা করেন। তাঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ একথাও বলেন, "তথাকথিত স্বাধীনতার পূজারী রামমোহন" গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড কৃষক বিদ্রোহ চলাকালীন ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করতেই ব্যস্ত ছিলেন। রামমোহন জমিদারী প্রথাকেই আদর্শ ভূমি ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেন। এই সব উক্তি গভীর তাৎপর্য বহন করে। তাই কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষ সম্পর্কে রামমোহনের প্রকৃত মনোভাব কি ছিল তা ভালোভাবে আলোচনা করা প্রয়োজন। একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী এইসব উক্তি বিশ্লেষণে মোটেই সহায়ক হবে না। একথা ঠিক রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান দাবি করেন নি। তবে তিনি সুস্পষ্টভাবে কৃষকদের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে তার প্রতিকার দাবি করেন। চিরস্থায়ী ও রায়তওয়ারী উভয় ব্যবস্থায় কৃষকদের দুরবস্থা বৃদ্ধি পায় সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যাবে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে জমির মূল্য দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কুড়ি গুণবৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বত্র পতিত জমিতে চাষ সুরু হওয়ায় এবং কৃষকদের দেয় খাজনার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জমির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। রামমোহন এই দুটো কারণই গুরুত্ব দিয়ে উল্লেখ করেছেন। সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গে জমিজমার মূল্যবৃদ্ধির কোন সম্পর্ক আছে কিনা এই প্রশ্ন সহজেই মনে আসবে। রামমোহন unearned increment

of land value সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, যে সম্পদ বৃদ্ধি পেয়েছে তাতে কতিপয় সুবিধাভোগী ব্যক্তিরাই লাভবান হয়েছে, দেশের সাধারণ মানুষ নয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পতিত জমিতে চাষ বৃদ্ধি ও ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাণিজ্যের দুয়ার উন্মুক্ত হওয়ার ফলে কৃষি ও পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়, বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু তাতে জমিদার, পণ্য কারবারী ও সরকারই লাভবান হয়েছে। দেশের সাধারণ মানুষ ও কৃষকের কোনই লাভ হয়নি। তাই রামমোহন বলেন যে, শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকাবাদে দেশের সর্বত্র যে ব্যাপক দারিদ্র্য বিদ্যমান তা থেকে বলা চলে, সাধারণত সম্পদ বৃদ্ধির ফলেই জমিজমার মূল্য বৃদ্ধি পায়নি। যাদের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে তারা জানে যে, দেশের কোন একটি স্থানের চারিদিকে একশত মাইলের বৃত্তের মধ্যে জমিজমার মালিকেরা ছাড়া খুব অল্প সংখ্যক লোকেরই সম্পদ আছে অথবা তারা জীবনের সাধারণ সুযোগ-সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারে। রামমোহন একথাও বলেন যে, খুদ-কস্ত রায়তদের বঞ্চিত করে জমিদারেরা খাজনা বৃদ্ধি করে। তিনি সুস্পষ্ট ভাবেই বলেন, জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারেরাই লাভবান হয়েছে, রায়তেরা নয়। তিনি অনুভব করেন, রায়তদের সঙ্গেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা উচিত। তাদের দুরবস্থা দূরকরে তিনি কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করেন : রায়তের খাজনা কমাতে হবে। এই সঙ্গে জমিদারদেরও ভূমি রাজস্ব কমাতে হবে। সূর্যাস্ত আইনের ফলে জমিদারদের যে অসুবিধা হয়েছে সেকথাও তিনি বলেন। জমিদারেরা যাতে রায়তদের অত্যাচার না করতে পারে সেজন্য আইনগত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। ভারতের কৃষকদের অবস্থা পর্যালোচনা করে রামমোহন বলেন যে, তারা হল "agricultural labourer", ঠিক "peasant-proprietor" নয়।[১৯]

রামমোহন মনে করেন, সততা ও দক্ষতার ফলে ও চাষের জমির প্রসারতায় যদি জমির মালিকের আয় বৃদ্ধি পায় তাহলে কারও কিছু বলার নেই। কিন্তু যদি দেখা যায় যে, এমন এক নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে যার ফলে জমির মালিকেরা বাড়তি কর থেকে নিজেরা রেহাই পেলেও তারা অনায়াসে খুদ-কস্ত রায়তদের খাজনা বৃদ্ধি করতে পারছে, তাহলে এই ব্যবস্থার যথার্থতা নিয়ে আলোচনা করা দরকার। তিনি একথাও বলেন যে, ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ও তার পরবর্তীকালের রেগুলেশন অনুযায়ী কতিপয় জমির মালিকেরাই লাভবান হয়েছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কৃষকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা তাদের সর্বনাশ হয়েছে। এই

সব আইনে তো সরকারের কোন সুবিধা হয় নি। রামমোহনের কথাই উদ্ধৃত করছি : "The power of imposing new leases and rents, given to the proprietors by Reg.1 and VIII of 1793, and subsequent Regulations, has considerably enriched, comparatively, a few individuals, the proprietors of land, to the extreme disadvantage or rather ruin of millions of their tenants ; and it is productive of noadvantage to government". [২০]

রামমোহন বলেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ও জমিদারদেরই সুবিধা হয়েছে। যারা বলে যে, সরকারের কোন লাভ হয়নি, তাদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, চল্লিশ বৎসরের ফলাফল থেকেই প্রমাণ করা যায় এই মন্তব্য সঠিক নয়। রামমোহন বলেন : "In my paper on the Revenue System I expressed an opinion that the permanent settlement has been beneficial to both the contracting parties i.e. the government and the landholders. This position, which, as regards the former, was long much controverted, does not now rest upon theory; but can be proved by the results of about forty years' practice."[২১] রামমোহন বলেন যে, জমিদারী ব্যবস্থায় বাংলাদেশের রাজস্ব মাদ্রাজের রায়তওয়ারী ব্যবস্থা থেকে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। জমিদারী ব্যবস্থায় যে সমৃদ্ধি হয়েছে তা রাজস্বের অন্যান্য শাখাতেও ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু রায়তওয়ারী ব্যবস্থা রাজস্বের অন্যান্য উৎসগুলিকে চাঙ্গা করে তুলতে পারেনি। যে সব তথ্য রামমোহন সংগ্রহ করেছিলেন তা থেকেই তিনি বলেন : "By a comparative view of the Revenues of Bengal, Behar and Orissa, from the period of the Perpetual Settlement, it appears that, in the thirty five years, from 1792-3 to 1827-28, there was a total increase on the whole amount of the Revenue of above 100 per cent. (101.71), and that this increase has been steady and progressive upto the present time...By a comparative view of the revenue of the old British territory in Madras, it appears that during the same period of thirtyfive years (i. e , from 1793 to 1828), there was an increase of only about 40 per cent., (40.15) on the total amount of the whole revenue". [২২]

এইসব তথ্য থেকে বলা চলে 'জমিদার রামমোহন' গভীর দরদ দিয়েই কৃষকদের দুরবস্থার কথা ভেবেছেন, আর নিজে জমিদার হয়েও জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটি উল্লেখ করতে এতটুকু সঙ্কোচবোধ করেননি। তাছাড়া যদি আমরা চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে তাঁর মতামত পরবর্তীকালের রমেশ চন্দ্র দত্তের মতামতের সঙ্গে তুলনা করি তাহলে দেখতে পাবো উনবিংশ শতাব্দীর সুরুতে রামমোহনের চিন্তাধারা অনেক বেশী স্বচ্ছ ছিল।[১০] ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনার বিকাশে রমেশচন্দ্রের অর্থনৈতিক চিন্তার অবদান অনস্বীকার্য। তবে জমিদারী প্রথার পক্ষে তাঁর মতামত নিয়ে আরও আলোচনা করার অবকাশ আছে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে রমেশ চন্দ্র দত্ত প্রথমে যে মত ব্যক্ত করেন পরে তা পরিবর্তন করেন। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে **The Peasantry of Bengal** নামক যে গ্রন্থ রমেশ দত্ত লেখেন তাতে তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সমালোচনা করেন এবং কৃষকের দুরবস্থার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসর পরেই তিনি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকে সমর্থন করেন। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে **Famines in India** গ্রন্থে রমেশ দত্ত লেখেন, যদি চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য হয় একটি অনুগত জমিদার শ্রেণী ও একটি সমৃদ্ধশালী কৃষক শ্রেণী সৃষ্টি করা, তাহলে বলতে হয় এই উদ্দেশ্য আপাতভাবে সফল হয়েছে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে **Economic History of India Under Early British Rule** গ্রন্থেও রমেশ দত্ত লেখেন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলেই বাংলা দেশে এমন কোন দুর্ভিক্ষ হয় নি যার ফলে অনেক লোক মারা গেছে। তাঁর মতে, এই ব্যবস্থায় সমগ্র কৃষক সমাজ লাভবান হয়েছে। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে রমেশ দত্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা সম্পর্কে ভাইসরয়কে যে সব চিঠি লেখেন তা নিয়ে সরকারী মহলে দীর্ঘ আলোচনা চলে। অবশেষে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার ভূমি রাজস্ব নীতি নির্ধারণ করে। রামমোহন ও রমেশ চন্দ্র দত্ত উভয়েই অর্থ নৈতিক সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে ভেবেছেন। তাই তুলনামূলক আলোচনা মোটেই অপ্রাসঙ্গিক মনে হবে না।[১১]

রামমোহনের উপদেশ মত যদি জমিদার কর্তৃক প্রদত্ত ভূমি রাজস্ব কমানো হয় তাহলে সরকারের আয়ের ক্ষতি হবে। এই বিষয়ে রামমোহনের অভিমত ছিল : (ক) বিলাস দ্রব্যের ও অন্যান্য দ্রব্যের উপর কর বসিয়ে আয় বৃদ্ধি করা উচিত ("**taxes on luxuries and such articles of use and consumption as are not necessaries).**" (খ) সরকারের ব্যয় কমানোর জন্য শাসনতান্ত্রিক ও

বিচারবিভাগীয় পদে ইউরোপীয়দের পরিবর্তে ভারতীয়দের নিয়োগ করা উচিত।[২৩]

ভারতবর্ষ কেন দরিদ্রতম দেশে পরিণত হল, এই নিয়ে দাদাভাই নাওরোজী, রমেশ দত্ত প্রভৃতি বিখ্যাত ভারতীয় চিন্তাবিদেরা অনেক আলোচনা করেছেন। এই দেশ থেকে প্রভূত পরিমাণে অর্থ ও সম্পদ বাইরে চলে যাওয়ার ফলে ভারতবর্ষ ক্রমান্বয়ে দরিদ্র দেশে পরিণত হয়। এই তত্ত্বকে 'ড্রেন থিওরি' (Drain Theory) বলে। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকেই তার সূত্রপাত হয়। এই বিষয়ে প্রথম আলোক-পাত করেন বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ ও বাগ্মী বার্ক Ninth Report (১৭৮৩ খ্রী) নামক গ্রন্থে। পরে ব্রুকস অ্যাডামস এই মত প্রচার করেন। ভারতীয়দের মধ্যে রামমোহন সর্বপ্রথম এই বিষয়ে সচেতন হন। সমসাময়িক ইংরেজ লেখকদের রচনার মাধ্যমে রামমোহন 'ড্রেন তত্ত্ব' সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তাঁর মতে, প্রতি বৎসর দুই মিলিয়ন পাউণ্ড (£ 2 million) দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাঁর মনে হয় যে, যদি ইউরোপীয়রা তাদের পুঁজি ও পরিবারবর্গ সহ এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে তাহলে ভারতবর্ষের সম্পদ রক্ষা করা সম্ভব হবে। তিনি বলেন "As a sum of money is now annually drawn from India by Europeans retiring from it with the fortunes realised there, a system which would encourage Europeans of capital to become permanent settlers with their families, would necessarily greatly improve the resources of the country." এই বিষয়ে ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত রামমোহনের পুস্তিকায় অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তাছাড়া রামমোহন 'আইরিশ ইকনমিক ড্রেন' (Irish Economic Drain) সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। Mirat-ul-Akhbar নামক ফারসী সাপ্তাহিক কাগজে রামমোহন "Ireland, the Causes of its Distress and Discontent" প্রবন্ধে এই বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, absentee landlordism এর ফলে আইরিশ ইকনমিক ড্রেন হয়। আইরিশ ইকনমিক ড্রেন ও ইণ্ডিয়ান ড্রেন নিয়ে তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চয়ই ফুরিয়ে যায়নি। ভাবতে অবাক লাগে, পরবর্তীকালে দাদাভাই নাওরোজীর মত ব্যক্তিও আইরিশ ড্রেন সম্পর্কে রামমোহনের মত সচেতন ছিলেন না।[২৭]

রামমোহন কারিগর ও শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান সম্পর্কেও আলোচনা করেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচনা থেকে জানা যায়, কলকাতাতে একজন কুশলী কারিগর প্রতিমাসে ১০ থেকে ১২ টাকা রোজগার

করত, অকুশলী শ্রমিক ৩ থেকে ৬টাকা, রাজমিস্ত্রী ৫ থেকে ৭টাকা, সাধারণ শ্রমিক ৩।। থেকে ৪ টাকা। ছোট শহরে তাদের আয় আরও কম ছিল। গ্রামাঞ্চলে আরও কম ছিল। বাংলা দেশে এই শ্রেণীর লোকের আহার্য ছিল ভাত, কিছু শব্জী, লবণ ও মাছ। আর দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা লবণ-ভাত খেত। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই রামমোহন এই সব কথা লেখেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের শারীরিক গঠন সম্পর্কেও রামমোহন বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি লেখেন যে, দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতের লোকেদের দৈহিক বল উত্তর ও পশ্চিম ভারতের লোকেদের চেয়ে কম ছিল। তিনি বলেন, আমাদের দেশে জমি উর্বর, তাই অপেক্ষাকৃত কম পরিশ্রম করতে হয়। আর গরম আবহাওয়া ও ধর্মীয় কুসংস্কার থাকাতে সাধারণ খাদ্য দ্রব্য গ্রহণ করায় ভারতবর্ষের কৃষকেরা সুগঠিত দেহের অধিকারী নয়। তাই রামমোহন তাদের দৈহিক বল বৃদ্ধির ও দৈহিক গঠনের উন্নতির জন্য তাদের আহার্য তালিকায় কিয়ৎ পরিমানে মাংস অন্তর্ভুক্ত করতে বলেন। প্রসঙ্গত তিনি বলেন যে, আফ্রিকার অধিবাসীরা ও আরব দেশের কোন কোন অংশের অধিবাসীরা প্রচণ্ড উষ্ণ আবহাওয়াতে বসবাস করলেও জীবিকা নির্বাহের জন্য তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয় এবং মাংস খেতে হয়। তাই তারা উত্তর অঞ্চলের জাতির মতই দৈহিক শক্তির অধিকারী। সুতরাং রামমোহন ভারতীয়দের ধর্মীয় কুসংস্কার পরিহার করে মাংস খেতে বলেন। অর্থাৎ তিনি যে ভারতবর্ষের কথা চিন্তা করেন সেখানে শুধু উন্নত মনের অধিকারী হলেই চলবে না উন্নত দেহেরও অধিকারী হতে হবে।[২৮] অনেক দিন পরে বিবেকানন্দের কণ্ঠে যেন এই সব কথাই অনেক বলিষ্ঠতার সঙ্গে উচ্চারিত হয়।

তাছাড়া গ্রামের সাধারণ মানুষের ও শহরের শিক্ষিত বাবুদের নৈতিক মান নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা করেন রামমোহন। (ক) তিনি বলেন যে, কৃষক ও গ্রামের লোকেরা, যারা কোর্ট-কাছারি ও বড় শহর থেকে দূরে বাস করে, তারা সরল স্বভাবের ও নীতিবোধ পরায়ণ। আরও উত্তরে ও পশ্চিমে গেলে তাদের আরও সৎ, সরল ও স্বাধীন চরিত্রের অধিকারী মনে হবে। রামমোহনের কথাই এখানে উদ্ধৃত করছি : "The peasants or villagers, who reside at a distance from large towns and head stations and courts of law are as innocent, temperate and moral in their conduct as the people of any country whatsoever ; and the farther I proceed toward the North and West, the greater the honesty, simplicity and independence of character I met with." রামমোহন মনে করেন, এই সব গুণ হল 'আদিম

সরলতার' (primitive simplicity) বৈশিষ্ট্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত। তাদের ধারণা ইহলোকে ও পরলোকে ভালো-মন্দ কর্ম অনুযায়ীই তারা পুরস্কৃত হবে অথবা শাস্তি পাবে। (খ) অন্যদিকে নতুন শহরে শ্রেণীর (new urban class) আচরণ সম্পর্কে রামমোহন বলেন যে, এরা কোর্ট-কাছারি, জমিদারী অফিস ও ইউরোপীয়দের সংস্পর্শে এসে বিদেশীদের আচরণ অনুকরণ করছে। রামমোহনের মতে, তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই চারিত্রিক দিক থেকে কৃষকদের থেকে হীনতর। যদি ব্যবসায় ও সরকারী চাকুরিতে এই নতুন শহরে শ্রেণীর জন্য সুযোগ-সুবিধা খুলে দেওয়া যায় তাহলে তাদের চরিত্রের উন্নতি হতে পারে। রামমোহনের ভাষায় :"...The inhabitants of the cities, towns or stations, who have much intercourse with persons employed about the courts of law, by zemindars, &c., and with foreigners and others in a different state of civilization, generally imbibe their habits and opinions ; hence their religious opinions are shaken without any other principles being implanted to supply their place ; consequently a great proportion of these are far inferior in point of character to the former class, and are very often even made tools of in the nefarious work of perjury and forgery." (গ) যারা জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করত, অথবা যারা তাদের জীবিকার জন্য আইন-আদালতের উপর নির্ভরশীল ছিল, যথা এটর্ণির কেরানী প্রভৃতি, তাদের যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যে ঢুকবার মত সামর্থ ছিল না, সেজন্য তাদের চাতুর্যের উপর নির্ভর করে চলতে হত। উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অর্থাৎ নতুন শহরে শ্রেণী থেকে এরা খারাপ ছিল। অবশ্য রামমোহন একথাও স্বীকার করেন যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যেও কিছু ভালো লোক ছিল। তারা যদি দেখত যে তাদের যোগ্যতা সমাদৃত হচ্ছে এবং সৎভাবে চলার জন্য তারা পুরস্কৃত হচ্ছে, তাহলে হয়তো তারা জনসাধারণের আস্থাভাজন হবার জন্য সচেষ্ট হত।[২৯]

ভারতবর্ষের শ্রমজীবি মানুষ সম্পর্কে রামমোহন যে মনে মনে গর্ব অনুভব করতেন তা তাঁর রচনা থেকে জানা যায়। তিনি বলেন : "They have the same capability of improvement as any other civilized people." তাছাড়া হিন্দু ও মুসলমান শ্রমজীবি মানুষ সম্পর্কে রামমোহন বলেন : "The Mahomedans are more active and capable of exertion than the Hindus, but the latter are also generally patient of labour and diligent in their employments, and those of the Upper Provinces are not inferior to

the Mahomedans themselves in industry".[৩৮] রামমোহন Upper Provinces-এর দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ অর্থনৈতিক অবস্থার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন যে, এর জন্য Mitakeara Law of inheritance অনেকটা দায়ী ছিল। এই আইনের disincentive effects-এর কথা তিনি উল্লেখ করেন।[৩৯] অর্থনৈতিক ইতিহাসের গবেষকেরা এই বিষয় নিয়ে ভাবতে পারেন।

রামমোহনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা নিয়ে আরও অনেক আলোচনার অবকাশ আছে। এখানে তাঁর চিন্তাধারার প্রধান প্রধান বিষয়গুলি উল্লেখ করা হল। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, রামমোহন ইংরেজের সহযোগিতায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারাকে বিকশিত করতে চেয়েছিলেন। এই আশা পোষণ করার কারণ ছিল এই যে, রামমোহনের কালে উপনিবেশ বিরোধী আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। তখনও এ সত্য ধরা পড়েনি যে, উপনিবেশ আসলে হল ধনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণেরই পরিণতি ও কৌশল। ধনতন্ত্রবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশবাদ প্রভৃতি যে পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত তখনও তা ততটা স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। স্বভাবতই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্দীপিত রামমোহনের পক্ষে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির তাৎপর্য বুঝে ওঠা সম্ভব হয়নি। ব্রিটিশ শাসনের ভাবাত্মক দিকগুলি আলোচনা করলে রামমোহনের ভূমিকা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। কার্ল মার্কস এই ভাবাত্মক দিকগুলি যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। ব্রিটিশ শাসনেই ভারতবর্ষে প্রথম সার্থক রাষ্ট্রনৈতিক ঐক্য সম্পাদিত হয় এবং তার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যের বোধ জাগতে সুরু করে। টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা সেই ঐক্যবোধকে শক্তিশালী ও স্থায়ীরূপ দেবার পক্ষে সহায়ক হয়। নিজের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসকেরা মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে, আর সাময়িক পত্র প্রকাশের পথ সহজ করে দেয়। ফ্রি প্রেসকে ব্রিটিশ শাসনের এক অভিনব দান বলা যায়। ভারতবর্ষের জাতীয় চেতনা বিকাশে এর মূল্য অপরিসীম। নতুন বাষ্পীয়যান আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের বাজারের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগ নিবিড় হয় এবং ধনতান্ত্রিক শোষণ ব্যবস্থার চাপে ভারতবাসীর জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। তাহলেও এই যোগাযোগের ফলে পণ্য আসা-যাওয়া করতে থাকে এবং বৃহৎ বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতও ভারতবাসীর নিকট খুলে যায়। রেলপথ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ভারতবর্ষে আধুনিক শিল্পের উদ্ভব হয়। যে শ্রমবিভাগ বর্ণভেদ ও জাতিভেদ ভিত্তি করে প্রাচীন কাল থেকে গড়ে উঠেছিল তার অপরিহার্যতা লোপ

পায় এবং এক আমূল পরিবর্তন ঘটে। যেসব প্রতিবন্ধকতার ফলে ভারতীয় সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয় তা দূর করবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। আর এক স্বচ্ছল ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী একদিকে যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত ছিল তেমনি নতুন চেতনায় উদ্দীপিত হয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করে। একদিকে যেমন প্রাচীন মূল্যবোধের সঙ্গে তাদের সংঘাত বাধে, তেমনি অন্যদিকে আনুগত্যের মধ্যেও মাত্রাভেদে বিরোধের উপকরণ দেখা দেয়। মোট কথা, ব্রিটিশ শাসন এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। কার্ল মার্কস এই আলোড়ন প্রত্যক্ষ করেই বলেন "Only Social Revolution ever heard of in Asia".[৩] সমগ্র রামমোহনকে যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাবো তিনিও এই Social Revolution বা সামাজিক রূপান্তরকে বড় করে দেখেন এবং ইংরেজের সহযোগিতায় এক নতুন ভারতবর্ষ গড়ার স্বপ্ন দেখেন।

[ক্রমশঃ]

সূত্র নির্দেশ

১. অক্ষয় কুমার দত্ত, ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, ১ম ভাগ, কলিকাতা, শকাব্দ ১৭৯২, পৃষ্ঠা : ১০৬, ১৫১-১৮৬ ; ক্ষিতিমোহন সেন, ভারতীয় মধ্যযুগে সাধনার ধারা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩০, পৃষ্ঠা : ৮৮-৮৯ Amitabha Mukherjee, Reform and Regeneration in Bengal, Calcutta, 1968, Chapter III. এই উপাসক সম্প্রদায় সম্পর্কে কি ভাবে তথ্য সংগৃহীত হল সে বিষয়ে অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর গ্রন্থের প্রথম ভাগে (শকাব্দ ১৭৯২) উপক্রমনিকাতে এক বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য আমি এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ থেকে কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি : "কাশীর রাজার মুন্সী শীতল সিংহ ও তত্রত্য কালেজের পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ মথুরানাথ ইহাঁরা প্রত্যেকে পারসীক ভাষায় এ বিষয়ের এক একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। ঐ দুই পুস্তকে বিবিধ সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন ও আচরণাদি সংক্রান্ত বহুতর বৃত্তান্ত বিনিবেশিত হয়। আর নাভাজি ও নারায়ণ দাসের বিরচিত হিন্দী ভক্তমালে, প্রিয়দাস কর্ত্তৃক ব্রজভাষায় লিখিত তদীয় টীকায়, বাঙ্গলা ভাষায় কৃষ্ণদাসের কৃত সেই টীকার

সবিস্তার বিবরণে এবং ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন ভাষায় বিরচিত অপরাপর বহুতর সাম্প্রদায়িক গ্রন্থে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সমূহের প্রবর্ত্তক ও অন্য অন্য ভক্তগণ সম্বন্ধীয় অনেকানেক উপাখ্যান এবং নানা সম্প্রদায়ের কর্ত্তব্যাদি বিবিধ বিষয় সন্নিবেশিত আছে। সুবিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুত হ, হ, উইলসন ঐ দুই পারসীক পুস্তক এবং হিন্দী ও সংস্কৃতাদি ভাষায় রচিত ভক্তমাল প্রভৃতি অন্য অন্য সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ দর্শন করিয়া ইংরেজী ভাষায় হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী উপাসক সম্প্রদায় সমুদায়ের ইতিহাস বিষয়ের দুইটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এসিয়াটিক রিসর্চ নামক পুস্তকাবলীর ষোড়শ ও সপ্তদশ খণ্ডে তাহা প্রথম প্রকাশিত হয়। আমি তাঁহার সেই দুই প্রবন্ধকেই অধিক অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় পশ্চাৎ-প্রস্তাবিত সম্প্রদায় সমূহের অনেকাংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করিয়াছি। স্থানে স্থানে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংযোজন করা হইয়াছে একথা বলা বাহুল্য। তদ্ভিন্ন এই প্রথম ভাগে রামসনেহী, বিষ্ণু-ভক্ত, কর্ত্তাভজা, বাউল, ন্যাড়া, সাঁই, দরবেশ, বলরামী প্রভৃতি আর ২২ বাইশটি সম্প্রদায়ের বিবরণ অন্যরূপে সংগৃহীত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটির বৃত্তান্ত পুস্তকান্তর হইতে নীত, অবশিষ্ট ২০ কুড়িটির বিষয় সুতন সঙ্কলিত। ন্যূনাধিক ২২ বাইশ বৎসর অতীত হইল, এই পুস্তকের অনেকাংশ প্রথমে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকটিত হয়।"... (পৃষ্ঠা : ১০৫-১০৬)।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনগণনা থেকে জানা যায় ঐ সময়ে ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও তার সর্বমোট সংখ্যা ছিল ৫,৫০৩ (vide E. A. Gait, Census of India, 1911, vol. I-Part I, Report, Calcutta, 1913, p. 123).

২. ক্ষিতিমোহন, ভারতীয় মধ্যযুগে, পৃষ্ঠা: ২৬

৩. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, প্রথম খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা: ২২২-২২৩

৪. স. ম. লুৎফর রহমান, নবমী কবি লালন শাহ (প্রবন্ধ), দৈনিক বাংলা, ঢাকা, বুধবার, ১ কার্তিক, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ৩ ; দৈনিক বাংলা, ঢাকা, রোববার, ৫ কার্তিক, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ১২ ; রাজিয়া বেগম জিয়া, নবমী কবি লালন শাহ (প্রবন্ধ), দৈনিক বাংলা, ঢাকা, মঙ্গলবার ; ৭ কার্তিক, ১৩৭৯, পৃষ্ঠা : ৬

৫. ক্ষিতিমোহন, ভারতীয় মধ্যযুগে, পৃষ্ঠা : ১১৮-১১৯

৬. ঐ, পৃষ্ঠা: ৯৫-৯৭

৭. ঐ, পৃষ্ঠা ১১৯-১২০

৮. ঐ, ভূমিকা দ্রষ্টব্য। আগ্রা থেকে গুজরাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যারা বহু পুরুষ ধরে অর্ধ-হিন্দু ও অর্ধ-মুসলমান ভাবে জীবনযাপন করত তাদের বিষয়ে অনেক তথ্য ভারতবর্ষের সেন্সস রিপোর্টে পাওয়া যায়। তখন তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় পঁয়ত্রিশ হাজার। (Vide Census of India, 1911, pp 117-118.) সিন্ধু দেশের ভক্ত কবি শাহ আবদুল লতিফের (১৬৮৯-১৭৫২খ্রী) ভূমিকা আলোচনা করলেও অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। (প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৪ পৃষ্ঠা : ৪৭৮-৪৭৩।

৯. সুপ্রকাশ রায়, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ, পৃষ্ঠা : ১৯১-১৯৪, ২০৪-২০৭ ; Ramesh Chandra Majumdar, On Rammohan Roy, Calcutta, 1972, pp. 47-49.

১০. Susobhan Chandra Sarkar (ed), Rammohun Roy On Indian Economy, Calcutta, 1965, pp. VII-XIV, Preliminary Remarks.

১১. Hem Chandra Sarkar (ed), Life and Letters of Raja Rammohun Roy, By Sophia Dobson Collet, Calcutta, 1913 ; D. K. Biswas and P. C. Ganguli (ed), The Life and Letters of Raja Rammohun Roy, Calcutta, 1962. সব তথ্যই এই দুটো গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১২. S. C. Sarkar (ed), On Indian Economy, pp. 84-89.

১৩. B. N. Ganguli, Rammohun Roy On India's Contemporary. Economic Problems, vide Economic and Social Development Essays in Honour of Dr. C. D. Deshmukh, Bombay, 1972, pp. 302-304.

১৪. Robert Lekachman, A History of Economic Ideas, New York, 1959, Chapters 4-7.

১৫. H.C. Sarkar (ed), Life and Letters, p.149 ; S.C. Sarkar (ed) On Indian Economy, p.22 ; সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতের শিল্প-বিপ্লব ও রামমোহন, চতুরঙ্গ, বৈশাখ, কার্তিক, ১৩৬৬

১৬. S.C. Sarkar (ed), On Indian Economy, pp. 80-83.

১৭. Ibid, pp. 67-68.

১৮. H. C. Sarkar (ed) Life and Letters ; D. K. Biswas and P. C. Ganguli (ed) Life and Letters ; B.B. Majumdar, History of Indian Social and Political Ideas, Calcutta, 1967, Chapter II.

সব তথ্যই এই সব গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

১৯. S. C. Sarkar (ed.) On Indian Economy, pp. 13-14, 21-24.
২০. Ibid, p. 23
২১. Ibid, p.70
২২. Ibid, pp. 70-71
২৩. Bhabatosh Datta, The Evolution of Economic Thinking in India, Calcutta, 1962, p4. এই পুস্তিকায় ভবতোষ দত্ত লেখেন : "It is striking that Ram Mohun Roy had a better understanding of the effects of the Permanent Settlement in 1931 than Romesh Dutta had nearly seventy years later" (vide Ibid.)
২৪. এখানে উল্লিখিত রমেশ চন্দ্র দত্ত রচিত গ্রন্থসমূহ ; Land Revenue Policy of the Indian Government, Calcutta, 1920, pp.1-265. এই গ্রন্থে রমেশ চন্দ্র দত্ত লিখিত পত্র (১২মে, ১৯০০ খ্রী) ও ১৬ জানুয়ারী, ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাব সন্নিবিষ্ট রয়েছে।
২৫. Bhabatosh Datta, Evolution of Economic Thinking, p 5.
২৬. S. C. Sarkar (ed), On Indian Economy, pp.74-79.
২৭. B. N. Ganguli, Rammohun Roy On India's Contemporary Economic Problems, p.301
২৮. S.C. Sarkar (ed.), On Indian Economy, pp. 62-65
২৯. Ibid, pp. 63-64
৩০. Ibid, p. 66.
৩১. B. N. Ganguli, Rammohun Roy, p. 299.
৩২. Karl Marx, The British Rule in India, The Future Results of the British Rule in India, (Articles), vide Marx-Engels, On Britain, Moscow, 1953, pp. 377-392.

[সম্প্রতি কেরী লাইব্রেরীর (শ্রীরামপুর) লাইব্রেরীয়ান শ্রীসুনীল কুমার চট্টোপাধ্যায় Raja Rammohan Roy And His Contemporaries এই শিরোনামায় ঐ লাইব্রেরীতে রক্ষিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেছেন। এই সঙ্কলন গবেষকদের কাজে লাগবে।]

The box office is just a tenth part of our activities

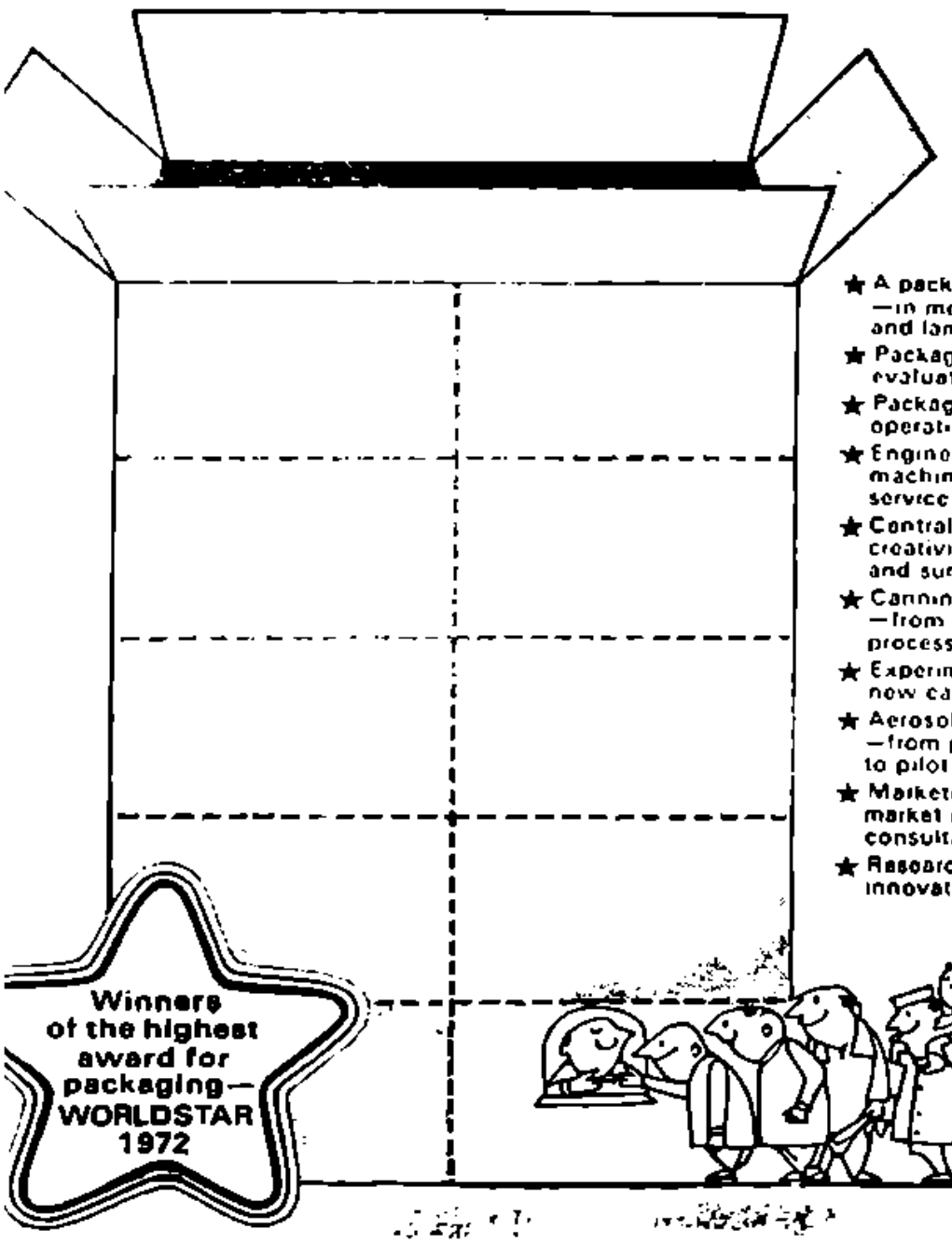

- ★ A package for every need —in metals, paper, plastics and laminates.
- ★ Package selection, development evaluation and testing.
- ★ Packaging machinery for operational efficiency.
- ★ Engineering services — from machinery adaptations to service engineering
- ★ Central Design Service for creativity in packaging shapes and surface designs
- ★ Canning Advisory Service —from cannery layouts to process control.
- ★ Experimental Kitchen for new canning concepts.
- ★ Aerosol Advisory Service —from product formulations to pilot facilities
- ★ Marketing Services — from market intelligence to consultancy
- ★ Research & Development for innovations in packaging.

Winners of the highest award for packaging— WORLDSTAR 1972

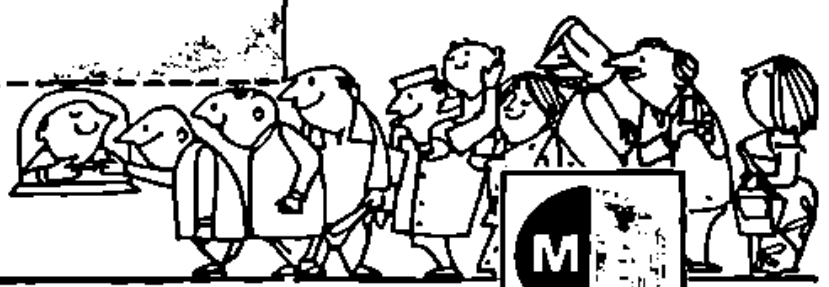

things are happening at Metal Box

–much more than metal boxes

CENTRAL LIBRARY UNIVERSITY

ইতিহাস

৭ম খণ্ড | মাঘ-চৈত্র ১৩৭৯ | ৪র্থ সংখ্যা

স্মৃতিকথা

রমেশচন্দ্র মজুমদার

(১২)

১৯৫০ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে আমি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করি ১৯৫২ সন পর্যন্ত সেখানে ছিলাম। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫—এই দু' বছর আমি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনার জন্য ভারত সরকার যে সমিতি নিযুক্ত করেছিলেন তার ডাইরেক্টর ছিলাম। সেই কাজ ছেড়ে দিয়ে ১৯৫৫ সনে আমি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিই। এই পাঁচ বছরে (১৯৫০-১৯৫৫) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা সমিতির বিস্তারিত বিবরণ পূর্বেই লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এই পাঁচ বছরে এ ছাড়াও আমার জীবনে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল, নাগপুরের কথা লেখার পূর্বে সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করছি।

প্রথমত, ১৯৫০ সনে UNESCOর (United Nations Scientific and Cultural Organisation) এক অধিবেশনে স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ভারত সরকার একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেছিলেন ; আমি এই দলের অন্যতম সভ্য ছিলাম। আরও কয়েক জন সভ্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব ডঃ তারাচাঁদ, বৈজ্ঞানিক কৃষ্ণাণ, এফ. আর. এস. এবং খুশবন্ত সিং-এর নাম আমার মনে আছে। ১৯৫০ সনের ১৯শে মে থেকে ১৭ই জুন পর্যন্ত ফ্লোরেন্স শহরে এই অধিবেশন হয়। সকাল বিকাল দু'বেলাই অধিবেশন

হত। স্যার রাধাকৃষ্ণণ সব সভায় উপস্থিত থাকতে পারতেন না ; পালা করে আমরা দু' তিনজন সভ্য প্রত্যেক সভায় যোগ দিতাম।

একদিন সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র দু'জন—খুশবন্ত সিং ও আমি উপস্থিত আছি, এমন সময় অকস্মাৎ এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হল যে চীন দেশের কমিউনিস্ট সরকারকে এই সভার অন্যতম সদস্যরূপে গ্রহণ করা হোক। এ নিয়ে প্রথমে কিছু তর্ক-বিতর্কের পর বিষয়টি ভোটে নির্দ্ধারণের প্রস্তাব হল। এখানে ভোট দেবার নিয়ম হল—প্রত্যেক দেশের একটি করে ভোট ; উপস্থিত সদস্যদের একজনের ভোটই সেই দেশের ভোট বলে গণ্য করা হবে। আমরা স্থির করলাম চীনের পক্ষেই ভোট দেব ; কারণ আমরা ভালভাবেই জানতাম ভারত সরকারের মত কমিউনিস্ট চীনকে গ্রহণের অনুকূলে। তর্ক-বিতর্কের পর যখন ভোট নেবার সময় এল তখন সেই প্রকাণ্ড হলের একধার থেকে সভাপতি মহাশয় ফরাসী ভাষায় কি বললেন আমি ঠিকমত বুঝতে পারলাম না। আমার ভোট দেবার পর আর একদল যখন হাত তুলল তখন আমার খেয়াল হল পূর্বের ভোট বোধ হয় চীনের বিরুদ্ধে ভোট। পাশের এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও তাই বললেন। তখন আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে সভাপতি মহাশয়কে বললাম যে ভোট দেবার সময় ব্যাপারটি আমি ঠিক বুঝতে পারিনি ; তবে ভারতবর্ষের ভোট হচ্ছে চীনকে সভ্যরূপে গ্রহণ করার পক্ষে।

পরদিন সংবাদপত্রে এই মর্মে খবর বেরল যে ভারতবর্ষের প্রতিনিধি প্রথমে চীনের বিপক্ষে ভোট দেবার পর নানারকম চিন্তা করে চীনের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। এর একটা কারণ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য কয়েকটি দেশ তখন চীনের বিরুদ্ধে ; সুতরাং আমার এই ভোট দেওয়ার ব্যাপারটা একটু ঘোলাও করেই বেরিয়েছিল। ডঃ তারাচাঁদ যে আমার প্রতি বিরূপ ছিলেন সেকথা পূর্বেও বলেছি। শুনেছি তিনিও এই ব্যাপারটি ভারত সরকারের কাছে অতিরঞ্জিত করে বলেছিলেন। অথচ যে সংবাদপত্রে এই খবরটি বেরিয়েছিল তাতে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল যে আমার ভোট চীনের পক্ষেই রেকর্ড করা হয়েছে।

আর একদিনও এই রকম একটা ব্যাপার ঘটল। সেদিন প্রস্তাব হল প্রাচীন সভ্যজাতির যে-সব প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আছে (classical works) সেগুলি নানা ভাষায় অনুবাদ করা হোক—যাতে জগতের সব দেশের লোকেই তাদের পরিচয় পেতে পারে। প্রস্তাবটিতে গ্রীক, রোমান, আরবী, চীনা ভাষা ছাড়াও আরও দু'একটি

ভাষায় লেখা গ্রন্থের নাম ছিল ; সংস্কৃত ভাষায় কোন গ্রন্থের নাম কিন্তু ছিল না। সেদিনও স্যার রাধাকৃষ্ণণ উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু ডঃ তারাচাঁদ ছিলেন। আমি তাঁকে বললাম যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা বই যাতে অনুবাদ করা হয় সেটাও এই প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হোক—একথা আমাদের বলা উচিত। ডঃ তারাচাঁদ বললেন আমাদের প্রতিনিধি দলের নেতা স্যার রাধাকৃষ্ণণকে না জানিয়ে কোন সংশোধনী প্রস্তাব আনা সঙ্গত নয়। আমি বললাম যে এই প্রস্তাব একবার গৃহীত হলে আর কিছু করার থাকবে না। সুতরাং আমি দাঁড়িয়ে উঠে বললাম যে সংস্কৃত ভাষায় লেখা ঋগ্বেদই জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ। এ ছাড়া ভারতে আরও এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা রোমান বা আরবী ভাষায় লেখা গ্রন্থের চেয়ে পুরনো ; সেগুলির অনুবাদ হওয়া বিশেষ ভাবে দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপনিষদ, কালিদাসের কাব্য ও নাটক প্রভৃতির উল্লেখ করেছিলাম। দু'একজন আমাকে সমর্থন করলেন, কয়েকজন আপত্তিও তুললেন। আপত্তির কারণ ছিল এই যে UNESCOর এক কমিটি অনেক চিন্তার পর এই প্রস্তাব এনেছেন ; সুতরাং এই সাধারণ সভায় তার অদল বদল করা উচিত হবে না। সভাপতি মহাশয় বললেন যে প্রস্তাবটি যেমন আছে তেমনি থাকুক একটি ব্যবস্থা করা যেতে পারে, পরবর্তীকালে যে সকল ভাষা থেকে অনুবাদ করা হবে সংস্কৃত ভাষা তাদের অন্যতম বলে গ্রহণ করা হবে। সভাপতির এই নির্দেশ গৃহীত হল। তার ফলে সংস্কৃত ভাষার নাম এই তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। সভার পরে স্যার রাধাকৃষ্ণণকে আমি সব কথা বললাম, তিনি আমার প্রস্তাব সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন।

এই সভায় আরও দু'একবার নানা বিষয়ে আলোচনা করেছি ; সেসব আর এখন আমার মনে নেই।

ফ্লোরেন্সে প্রায় এক মাস ছিলাম। এই সময় এর অনেক জায়গা ঘুরে প্রাচীন ইটালীর অনেক শিল্প নিদর্শন দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে যীশু খ্রীষ্টের লাস্ট সাপার নামে বিখ্যাত ছবিটি এখানেই আছে। সেটি দেখতে গিয়েছিলাম। এখন ছবিটির রং অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। (ছবিটি ফ্লোরেন্স না অন্য কোন সহরে আছে ঠিক স্মরণ হচ্ছে না। তবে ছবিটি আমি দেখেছি।) ফ্লোরেন্সে অনেক গীর্জা ও মিউজিয়ামে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বহু ছবি আছে, সেগুলি দেখেছিলাম। মেডিচিদের রাজপ্রাসাদও দেখেছিলাম। ফ্লোরেন্স মধ্যযুগের ইটালীর একটি অতি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। এই ঐতিহাসিক নগরীর স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

(১৩)

UNESCO-র অধিবেশন যখন হয় তখন কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি। মিটিং শেষ হবার পর সরাসরি দেশে না ফিরে আমি ইয়োরোপের বিভিন্ন জায়গায় ১২/১৩ দিন ঘুরে বেড়াই। এই দেশ ভ্রমণের কথা কিছু অন্যত্র লিখেছি; এখানে আর তা উল্লেখ করব না। ৩০শে জুন বোম্বাই বিমান বন্দরে নেমে দেখি ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস-এর সহকারী সম্পাদক ডঃ এ. ভি. পুসলকর দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখেই তিনি বললেন যে আপনার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সবাই ভাল আছেন। আমি একথার কোন অর্থ বুঝতে না পেরে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। এবার আমার বিদেশ যাবার সময় স্থির ছিল যে আমার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা দার্জিলিং যাবেন, সেখানে আমার একটি বাড়ি ছিল। গ্রীষ্মের ছুটিতে সাধারণতঃ আমরা সকলে দার্জিলিংএ থাকতাম। এবার আমি না থাকলেও বাড়ির অন্য সকলের দার্জিলিং যাওয়ার কথা ছিল। আমি পুসলকরকে বললাম আপনার কথার তো কোন অর্থ বুঝতে পারছি না; তাঁদের কি কোন অসুখ হয়েছিল? পুসলকর বললেন যে আপনি শোনেননি দার্জিলিংএ ধ্বস নেমে (land slide) বহু বাড়ি ভেঙ্গে গেছে, অনেক লোক মারা গেছে। আপনার স্ত্রী মুন্সিজীকে জানিয়েছেন যে এই দুর্ঘটনার খবর বিদেশী কাগজেও বেরিয়েছে, হয়তো আপনার চোখে পড়েছে। আপনি উদ্বিগ্ন হয়ে হয়তো বোম্বাই থেকে সোজা দার্জিলিং চলে যাবেন—সেজন্যে মুন্সিজী আপনাকে সঠিক খবর দেবার জন্যে আমাকে বিমান বন্দরে পাঠিয়েছেন।

কলকাতায় এসে দেখলাম স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা সবাই ফিরে এসেছেন। তাঁদের কাছে যে ভয়াবহ বর্ণনা শুনলাম তাতে তাঁদের যে প্রাণ রক্ষা হয়েছে—এটা ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহই বলতে হবে। আমার বাড়ির কিছু উপরে এক ভদ্রলোক ইটের একটি প্রকাণ্ড বাড়ি তৈরি করেছিলেন। শুনলাম সেই বাড়িটি ধ্বসে পাহাড়ের গা দিয়ে নেমে শুধু ধ্বংস নয় একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। এর পরের বার দার্জিলিং গিয়ে দেখি সেই বাড়িটির চিহ্নমাত্র নেই। আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম সারাদিন বৃষ্টি হবার পর সন্ধ্যাতেও যখন তা থামল না—এত বৃষ্টি যে পাহাড়ের উপর খাড়া রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল—আমাদের দু'জন প্রতিবেশী সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে একটি হোটেলে আশ্রয় নেন। অনেক বাড়ি ভেঙ্গে পড়ায় বহু পাহাড়ী লোক এসে আমাদের বাড়িতে হাজির হয়, আমার স্ত্রী তাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। একে এই দুর্যোগ, তার উপর খাওয়ার কষ্ট। কি ভীষণ বিপদেই না ক'দিন কাটাতে হয়েছিল।

বৃষ্টি বন্ধ হতে শোনা গেল রাস্তা এমন খারাপ যে বাগডোগরা যাওয়া প্রায় অসম্ভব। বাগডোগরা থেকে প্লেন ছাড়ে। আমার বাড়ির লোকেরা খানিকটা হেঁটে খানিকটা ট্যাক্সিতে—এই ভাবে রাস্তা পার হয়ে বাগডোগরা পৌঁছে প্লেন ধরে কলকাতায় আসতে সমর্থ হয়।

এমন প্রাকৃতিক বিপর্যয় এর পূর্বে দার্জিলিং-এ কখনও ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে একটি কথা এখনও আমার মনে আছে। শুনলাম যে যখন ঝড়বৃষ্টি থামল ধ্বস নেমে রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ায় খাদ্যদ্রব্য কিছুই শহরে আসার উপায় ছিল না। এই সুযোগে দোকানীরা জিনিসপত্রের দাম অসম্ভব বাড়িয়ে দেয়। আমাদের বাড়িতে যেসব পাহাড়ী লোকেরা আশ্রয় নিয়েছিল খাদ্যসঙ্কটের সময় আমার স্ত্রী তাদের বললেন যে তিনি টাকা দিতে রাজী আছেন; কিন্তু জিনিসপত্র তো সহজে মিলছে না, কাজেই খাবার ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই করতে হবে। এই কথা শুনে তারা দোকানীদের কাছে গিয়ে বলল—তোমরা এই মাল তো অনেক আগে কিনেছ। এখন সাবেক দামে যদি না দাও তো আমরা মালপত্র লুট করে নিয়ে যাব। আরও কিছু পাহাড়ী লোকেরা নাকি অন্য দোকানীদেরও এই ভাবে শাসিয়েছিল। তাতেই অবশ্য কাজ হল।

(১৪)

১৯৫১ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কনস্ট্যান্টিনোপলে International Congress of Orientalists এর অধিবেশন হয়। আমি নিমন্ত্রিত এবং ভারত সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে এই অধিবেশনে যোগদান করেছিলাম। আমি ছাড়া আরও কয়েকজন ভারতীয় সরকারী প্রতিনিধিরূপে এই অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে দু'জনের নাম মনে আছে; তাঁরা হলেন মহামহোপাধ্যায় পি. ভি. কাণে এবং ডঃ ভি. আর. দণ্ডেকার। ১২ই সেপ্টেম্বর আমরা একসঙ্গে কনস্ট্যান্টিনোপলে পৌঁছলাম।

কনস্ট্যান্টিনোপলের কথা ইতিহাসে বহু পড়েছি, মধ্যযুগের ইতিহাসে এই শহরটির বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। যে গ্রীকো-রোমান সভ্যতা বিশাল রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরেও বহুকাল পাশ্চাত্যের সভ্যতার ধারক ছিল, তার আদু-কেন্দ্র হল কনস্ট্যান্টিনোপল। এই স্থানটি প্রকৃতির দ্বারা এমনভাবে সুরক্ষিত যে তুর্কীরা এশিয়া মাইনর পর্যন্ত জয় করেও সংকীর্ণ জলাশয়ের অপরপারের এই শহরটি বহুদিন পর্যন্ত অনেক চেষ্টা করেও দখল করতে পারেনি। অবশেষে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীরা এই শহর জয় করতে সমর্থ হয়।

এই তুর্কী বিজয়ের ফলেই গ্রীক সাহিত্যে সুপণ্ডিত বহু গুণী ব্যক্তি কনস্ট্যান্টি-নোপল ছেড়ে পশ্চিম ইয়োরোপে চলে আসেন ; ফলে ইউরোপে এক নূতন যুগ—Renaissanceএর সূচনা হয়। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতন ইয়োরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের সূত্রপাত বলে ধরা হয়।

তুর্কীদের দখলে আসার পর কনস্ট্যান্টিনোপলের নূতন নামকরণ হয় ইস্তাম্বুল। তুর্কীর সুলতান মুসলমানদের খলিফা হওয়ার ফলে ইস্তাম্বুল শহর মুসলমান সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ইস্তাম্বুলের অনেক মসজিদ প্রাচীন ও নবীনের সংযোগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সবচেয়ে বড় রোমান ক্যাথলিক গীর্জাটির কিছু পরিবর্তন করে মসজিদ করা হয়েছে ; সেটি এখনও অনেকটা অক্ষতভাবেই আছে। সেটি দেখলে এখনও মধ্যযুগের স্থপতি-শিল্পের কতকটা ধারণা করা যায়। কনস্ট্যান্টিনোপলে এই রকম অনেক পুরনো স্মৃতি আছে।

International Congress of Orientalists একটি বহুকালের পুরনো প্রতিষ্ঠান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় পণ্ডিত শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এই সভায় একবার যোগ দিয়েছিলেন। পৃথিবীর নানা জায়গায় এর অধিবেশন হয়। এবারের অধিবেশনে ইয়োরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রতিনিধি এসেছিলেন। প্রথম দিনের অধিবেশনের পরেই ব্যবস্থা হল যে অনেকগুলি শাখা-অধিবেশন হবে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে যে শাখা-অধিবেশন হয় আমি তার সভাপতি ও মূল কংগ্রেসের কার্যকরী সমিতির সভ্য নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমাদের দেশের Oriental Conference-এর মতনই এখানে সাধারণতঃ লিখিত প্রবন্ধ পড়া হল এবং সে বিষয়ে কিছু আলোচনাও হল। এই অধিবেশনের কার্য বিবরণী পরে ছাপা হয়েছে ; সুতরাং এখানে সবিস্তার তা উল্লেখ করার দরকার নেই। এবারেও ঐ কংগ্রেস শেষ হলে সোজাসুজি ভারতে ফিরে না এসে আমি ইয়োরোপের অনেক জায়গা ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।

ঐ কংগ্রেসে যোগদানের ফলে আমি Bureau of the International Council for Philosophy and Humanistic Studies-এর সভ্য নির্বাচিত হই এবং পর বৎসর প্যারিস শহরে এই Council-এর দ্বিতীয় সাধারণ অধিবেশনে যোগদান করি (২২শে থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

(১৫)

১৯৫৫ সনে আমি যখন দিল্লীতে ছিলাম তখন কলকাতায় আমার দৌহিত্রীর

বিবাহ স্থির হয়। এই বিবাহে যোগ দেবার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী মোটরে কলকাতায় আসব স্থির করলাম। এই মোটর ভ্রমণে আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল। উত্তর ভারতের প্রায় হাজার মাইল পথ মোটরে আসার সময় ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে যে একটি স্পষ্ট ধারণা করবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, রেল ভ্রমণে তা হওয়ার সম্ভাবনা নেই !

দিল্লী থেকে বিকেলে যাত্রা করে আলিগড়ে রাত্রিযাপন ; এক ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা আগে থাকতেই করা ছিল। সেখান থেকে কনৌজ দেখতে যাই ; জায়গাটি বড় রাস্তা থেকে বেশী দূরে নয়। প্রাচীন কান্যকুব্জ ভারতের ইতিহাসে বিশেষ একটি গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছে। সেখানে অনেকগুলি বড় বড় ঢিবি দেখলাম ; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ থেকে সেগুলি খননের কোন ব্যবস্থা নেই ; এমন কি তাদের পরিচয়-লিপিও কোথাও লেখা নেই। কত প্রাচীন গৌরব-কীর্তি এই ধ্বংসাবশেষগুলি মাটির নীচে গোপন করে রেখেছে।

কনৌজ থেকে কানপুর ; এখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রমে আমার থাকার ইচ্ছা ছিল। মিশনের কর্তৃপক্ষকে চিঠিও লিখেছিলাম। তাঁরা আমার পরিচিত। গিয়ে শুনলাম আশ্রমের নিয়ম অনুসারে কোন স্ত্রীলোক সেখানে রাত্রে থাকতে পারবেন না। সেজন্যে আশ্রমের অধ্যক্ষ আশ্রমের ঠিক পাশেই এক ভক্ত গৃহস্থের বাড়িতে আমাদের থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন। বলাবাহুল্য সেখানে আমাদের আদর অভ্যর্থনার কোন ত্রুটি হয়নি।

কানপুর থেকে রওনা হয়ে সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে বিখ্যাত হুইলার বিল্ডিংটি দেখলাম। আরও দু' একটি জায়গা দেখে এলাহাবাদে এসে পৌঁছলাম দুপুরবেলা। সেখানে এক বাঙালী জজ, আমার বিশেষ বন্ধুর জামাতা, পূর্বেই আমন্ত্রণ করেছিলেন। এলাহাবাদ শহর পূর্বেই আমার দেখা ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে কাশীতে রাত্রিযাপন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় আমি যে বাড়িতে ছিলাম সেখানে তখন আমার পুরাতন ছাত্র অর্থনীতির অধ্যাপক অমিয় দাশগুপ্ত থাকত। আমরা সেই বাড়িতেই উঠলাম। পুরনো অনেক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হল।

এরপর ডেহরি-অন-শোণ এ এসে শোণ নদ পার হতে হয়। সব সময় মোটর পারাপার হয় না। সরকারী কর্মচারীদের অনুমতি দরকার, টাকা জমা দিতে হয়। আমি অফিসে গিয়ে দেখা করলাম। ছোট অফিস, একজন বেহারী ভদ্রলোক বসেছিলেন। তিনি আমাকে একটি কাগজে সই করতে বললেন।

আমার বই দেখে তিনি বললেন—আপনি কি Brief History of India বই লিখেছেন ? আমি ঐ বই পড়ে এনট্রান্স পরীক্ষা পাশ করেছি। আমি হাঁ বলাতে তিনি আমার গাড়ী পার করার ব্যবস্থা করে দিলেন।

আমার স্ত্রী বললেন বড় বই লিখে যা কাজ না হয় স্কুলের বই লিখে দেখছি তার চেয়ে বেশী উপকার হয়।

শোণ নদ পার হয়ে একটি সরকারী ডাকবাংলোয় থাকার ব্যবস্থা ছিল। ক্যানালের ধারে অতি চমৎকার বাড়ি। সেই ডাকবাংলোর কথা আজও আমার মনে আছে।

পরের দিন রাত্রে যে জায়গায় এক ডাকবাংলোয় আশ্রয় নিলাম তার নাম বারি। এখান থেকে নাইথন ও তিলাইয়া—দামোদর পরিকল্পনার এই দুটি বাঁধ দেখতে গেলাম। পথে আরও এক জায়গায় খেমেছিলাম—তোপচাঁচি লেক। এটি একটি নাতি বৃহৎ হ্রদ, চারধারে রাস্তা ; মোটরে ঘুরে দেখলাম।

সেখান থেকে চিত্তরঞ্জন। এখানে তখন আমার কন্যা জামাতা ছিল। একদিন বিশ্রাম করে কলকাতায় এসে পৌঁছলাম দিল্লী ছাড়ার ঠিক ছয় দিন পরে।

(১৬)

এই সময়কার আর একটি ঘটনার কথা এবার বলছি। ভারত সরকার হঠাৎ আমাকে ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্য নিযুক্ত করলেন। এর কিছুদিন পরেই আমাকে নাগপুরে চাকরি নিয়ে চলে যেতে হয়। তবে গ্রীষ্ম ও পুজোর ছুটিতে যে কয়মাস কলকাতায় থাকতাম তখন ফিল্ম শো থাকলে নিয়মিত তা দেখতে যেতাম।

ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্যদের কাজ হল নতুন তৈরি কোন ফিল্ম জনসাধারণের কাছে দেখান যেতে পারে কিনা সে বিষয়ে মতামত দেওয়া। ফিল্ম তৈরী হলেই আগে সেটি সেন্সর বোর্ডের সভ্যদের কাছে দেখান হয়। সভ্যরা কোন আপত্তি করলে ফিল্মের প্রযোজক সেটি সংশোধন করবেন—এই নিয়ম। এই সংশোধিত ফিল্মটি আবার সভ্যদের দেখাতে হবে ; তাঁদের কাছ থেকে ছাড়পত্র পাবার পরে সেটি সাধারণের কাছে দেখান যাবে। নতুন তোলা ছবি দেখতে গিয়ে দেখলাম সভ্যদের বিভিন্ন মত। প্রধানতঃ শ্লীলতা অশ্লীলতার প্রশ্ন, এ ছাড়া পোষাক ও নানা আনুষঙ্গিক ছোটখাট বিষয়ে মতভেদ। একজন বললেন

বেশী আপত্তি করলে প্রযোজকরা ছবি বোম্বাই সেন্সর বোর্ড থেকে পাশ করিয়ে আনবে। তখন নিয়ম ছিল ভারতের যে কোন ফিল্ম সেন্সর বোর্ড পাশ করলেই সে ছবি দেশের সর্বত্র দেখান যেত। আমাদের আপত্তিতে বাম্বে থেকে বরং বাঙালী প্রযোজকদের টাকা কিছু বেশী খরচ হবে। এ সত্ত্বেও আমরা প্রয়োজন হলে আপত্তি জানিয়েছি। দু'একবার এ নিয়ে বেশ হাঙ্গামা বাধে, আমার বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখিও হয়।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে একটি ছবিতে দেখান হয় এক যুবতী রমণী মহাপ্রভুর সামনে নৃত্য করছেন, শ্রীচৈতন্য তা উপভোগ করছেন। আমি এতে আপত্তি করলাম, বললাম এটি ইতিহাসের বিরুদ্ধে। কারণ শ্রীচৈতন্য পরস্ত্রীর মুখ পর্যন্ত কখনও দর্শন করেননি; তিনি ঐ ভাবে নর্তকীর নৃত্য দেখবেন এটা অচিন্তনীয় ব্যাপার। ইতিহাসে কোথাও এর সমর্থন নেই। এ দৃশ্য ছবিতে থাকলে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের মনে ভীষণ আঘাত লাগবে; আমি কিছুতেই এ ছবি দেখানর অনুমতি দিতে পারি না।

আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন সভ্য ঐ অংশটি বাদ দিতে হবে বলে আপত্তি জানালেন। এই ছবির প্রযোজক ছিলেন কলকাতার একজন মস্ত ধনী ও বিখ্যাত ব্যক্তি। নৃত্য অংশ বাদ দেওয়াতে তাঁর ঘোরতর আপত্তি। আমার নাম করে তিনি বোর্ডের কর্তৃপক্ষের কাছে লিখলেন আমার কথার প্রমাণ কি? উত্তরে আমি জানালাম যে চৈতন্য ভাগবতে আছে যে শ্রীচৈতন্যের নির্দেশ ছিল তিনি বা তাঁর ভক্ত কেউ স্ত্রীমুখ দেখবেন না। তাঁর প্রিয় ভক্ত হরিদাসকে মহাপ্রভু এই অপরাধে শাস্তিও দিয়েছিলেন। ঘটনাটি এই—একদিন খেতে বসে শ্রীচৈতন্য দেখলেন খুব ভাল চালের অন্ন পরিবেশন করা হয়েছে। তিনি বললেন—আজকের চাল কি উৎকৃষ্ট। কোথা থেকে পাওয়া গেল? হরিদাস বললেন—আমার এক ভক্ত নারী আছে। তিনি এই চাল দিয়েছেন। মহাপ্রভু বললেন—কে দিয়েছে তুমি জানলে কি করে? তুমি তাকে দেখেছ? হরিদাস বললেন—হাঁ। মহাপ্রভু বললেন তবে তো তোমাকে আর আমার সঙ্গে রাখতে পারি না।

"হরিদাস কৈল প্রকৃতি সম্ভাষণ
হেরিতে না পারি মুই তাহার বদন।"

এর পর থেকে সত্যিই তিনি আর হরিদাসের মুখ দেখতেন না। মনের দুঃখে ভক্ত হরিদাস গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেন।

আমার এই আপত্তির বিস্তারিত কারণ বোর্ড ছবির প্রযোজকের কাছে

পাঠিয়েছিলেন। প্রযোজক উত্তরে বললেন যে ভাগবতে আছে শ্রীচৈতন্য নারীর স্কন্ধে চেপে জগন্নাথদেব দর্শন করেছিলেন, কাজেই শ্রীচৈতন্য নারীর মুখ দেখেননি—একথা ঠিক নয়।

চৈতন্য ভাগবতের সংশ্লিষ্ট অংশটির প্রতি আমি আবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে শ্রীধাম পুরীতে শ্রীচৈতন্য এসে পৌঁচেছেন তিনি তখন খুবই শ্রান্ত। পৌঁছেই তিনি জগন্নাথদেব দর্শন করবেন বলে অস্থির হয়ে উঠলেন। তখনই তাঁকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হল। মন্দিরে তখন খুব ভীড়। তাঁরা এসে সবার পিছনে দাঁড়ালেন। ভালভাবে দেবদর্শনের জন্য মহাপ্রভু সামনে যিনি ছিলেন (একজন রমণী) তাঁর কাঁধে হাত দিয়ে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাগবতকার ঘটনাটি বর্ণনা করেই লিখেছেন যে মহাপ্রভু তখন দেবদর্শনের জন্য ব্যাকুল। সামনে পুরুষ কি স্ত্রী কে দাঁড়িয়ে আছে, এ জ্ঞান তাঁর ছিল না। ভাগবতকারের ব্যাখ্যা যে আমার আপত্তির অনুকূলেই তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমার এই আপত্তির কথা বাইরে কি ভাবে প্রকাশ পায়। বহু বৈষ্ণবের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র সরকারের কাছে এসে পৌঁছয়। তাতে লেখা ছিল, এ ছবি দেখান হলে বৈষ্ণব ধর্মে আঘাত দেওয়া হবে; এটা বৈষ্ণবেরা সহ্য করবেন না। দরকার হলে তাঁরা বলপ্রয়োগ করে এ ছবি দেখান বন্ধ করবেন।

এই রকম ইতিহাস-বিরোধী ঘটনা দেখানর জন্যে আরও কয়েকবার আমি আপত্তি তুলেছিলাম। সেই সব অংশ পরিবর্তন করা হয়েছিল। তিন বছর আমি এই ফিল্ম সেন্সর বোর্ডের সভ্য ছিলাম। মেয়াদ শেষ হলে যখন চলে আসি বোর্ডের অধিকর্তা বললেন, এখন বুঝতে পারছি সেন্সর বোর্ডে একজন ঐতিহাসিক সভ্য থাকা কি রকম দরকার।

(ক্রমশঃ)

অষ্টাদশ শতকে মুঘল শাসন পদ্ধতির স্বরূপ

শ্রীজগদীশ নারায়ণ সরকার

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত সমসাময়িক ঐতিহাসিক গোলাম হুসেন লিখিয়াছিলেন, "সিংহ সকলেই যেন দৃষ্টিশক্তিহীন, চিরন্তন অন্ধকার পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল"। প্রশ্ন ওঠে, কেন তিনি এই কথা লিখিয়াছেন? ইহা বুঝিতে হইলে তৎকালীন শাসন ও সামরিক পদ্ধতির আলোচনা আবশ্যক হইয়া পড়ে। বিষয়বস্তুটি বিশাল ও ব্যাপক। বিষয় শুধু একটি নয়, দুইটী। প্রশাসন ও রণপদ্ধতি। শুধু সংগঠন নয়, স্বরূপও। সুতরাং ব্যবহারিক দিকের প্রতিও লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দী বলিতে আমরা ১৭০৭ খ্রী: হইতে ১৮০৩ খ্রী: পর্যন্ত বুঝি। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হইতে লর্ড লেকের দিল্লী অধিকার পর্যন্ত। তবে মুঘল প্রশাসনের কথা বলিতে গেলে মহম্মদ শাহ, অহমদ শাহ ও দ্বিতীয় শাহ আলমের সময় অর্থাৎ ১৭৬৫ খৃ: পর্যন্ত বড় জোর আমরা এর ঘের টানিতে পারি।

অষ্টাদশ শতাব্দী অবনতির যুগ

সাধারণ ভাবে বলা যাইতে পারে যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দী অবনতির যুগ। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুতে মহান মুঘলদের যুগের অবসান হয়। এর পর শুরু হয় পরবর্তী বা হীন মুঘলদের যুগ। শার্লেমেনের মৃত্যুর পর ক্যারোলিঞ্জিয়ান সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সমসাময়িক ঐতিহাসিক যাহা লিখিয়াছেন তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল সাম্রাজ্য সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। "পূর্বে সম্রাটগণ রাজত্ব করিতেন, এখন শুধু ছোট রাজারাই (kinglets) আছেন।" রাজাকে বলা হয় ক্যাসনা কারণম্। সুতরাং রাজতন্ত্রের অবনতির ফলে যুগের অধঃপতনও অবশ্যম্ভাবী।

মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই শতাব্দীতে যে চরম অরাজকতা বিরাজ করে তাহা ভূতের তাণ্ডব নৃত্যের সহিত তুলনীয়। সার্বজনীন গৃহ যুদ্ধে, বিশ্বাসঘাতী ষড়যন্ত্রে, নৃশংস হত্যায়, নানাবিধ অকথ্য বর্বর অত্যাচারে, বিদেশী আক্রমণে, রাষ্ট্র ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সম্রাটগণের দুর্বল ও দোলায়মান চরিত্র এবং তাঁহাদের বিচারবুদ্ধির অভাব বহুলাংশে এই অবস্থার জন্য দায়ী। মানবচরিত্র

[বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পঠিত প্রবন্ধের প্রথম অংশ প্রকাশিত হল]

উপলব্ধি করার রাজোচিত ক্ষমতা তাঁহাদের না থাকায়, তাঁহারা অযোগ্য কর্মচারীর উপর নির্ভর করিতেন। স্বার্থপর, কলুষিত চরিত্রের অনুগামী কিম্বা খোজাদের চাপে বা ক্রীতদাস সুলভ মোসাহেবদের পরামর্শেই তাঁহারা নিজেদের মতামত ও কার্য্য প্রক্রিয়া নির্দ্ধারণ ও পরিবর্ত্তন করিতেন। ইহার ফলে মুঘল রাষ্ট্র কাণ্ডারীবিহীন নৌকার মত দিগ্‌ভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। এই অবস্থায় প্রশাসনীয় সংগঠনে ভাঙ্গন ও অবনতি এবং রণপদ্ধতি ও পরিচালনায় ত্রুটি, বিশৃঙ্খলা ও শ্লথভাব যে অবশ্যম্ভাবী তাহা স্বতঃসিদ্ধ। আচার্য্য যদুনাথের ভাষায় "ইন্দো-মুঘল সভ্যতা এখন যেন একটা নির্ব্বাপিত টোটার অনুরূপ; ইহাতে আর কোন জীবনীশক্তি নিহিত ছিল না বা কল্যাণকর কোন শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না"।

শেরশাহ ও আকবর যে প্রশাসনিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরই যে এই ভাঙ্গনের ধারা শুরু হয় তাহা নহে। তাহার পূর্বেই অস্পষ্টভাবে কিছু কিছু লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছিল। এমন কি জাহাঙ্গীরের সময় হইতেই এই ত্রুটির সূচনা পাওয়া যায়। শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের দৃঢ় ব্যক্তিত্বের প্রভাবে ফাটল সত্ত্বেও ইহার বাহ্যিক কাঠামো বজায় ছিল। কিন্তু ১৭০৭ খ্রীঃ এর পর ভাঙ্গনের দ্রুত নিম্নগতি প্রতিহত করিবার কেহই ছিলেন না। বৈদ্যুতিক চুল্লীতে দাহের শেষেও ভস্মীভূত শবের বাহ্যিক গঠন যেমন অবিকল থাকে সেই রকম অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল প্রশাসনিক কাঠামোও বজায় ছিল, কিন্তু তাহাতে প্রাণশক্তির কোন চিহ্নই অবশিষ্ট ছিল না।

(ক) কেন্দ্রীয় প্রশাসন : (১) সম্রাটের পদ ও ক্ষমতার রূপ পরিবর্ত্তন

তত্ত্বগত ভাবে মুঘল সম্রাটের পদমর্যাদা পূর্বের মতই ছিল। তিনি ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান, ঈশ্বরের ছায়া, এক সার্ব্বভৌম শাসক। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাস্তবক্ষেত্রে মুঘল রাজতন্ত্রে এক বিরাট পরিবর্ত্তনের ফলে পূর্ব্বযুগের সম্রাটদের অবাধ সার্বভৌম স্বৈরতন্ত্র চিরতরে লুপ্ত হইয়া গেল। তাঁহারা কখনও উজীরের বা সাম্রাজ্ঞীর, কখনও বা ওমরাহ বা প্রিয় পাত্রপাত্রীগণের ক্রীড়নক অথবা বন্দী হইতেন। একজন সম্রাটকে পদচ্যুত করিয়া অন্য কাহাকেও সিংহাসনে বসান হইত। কেহ হইতেন অন্ধ, কেহ বা নিহত। ইহা ব্যতীত ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য ছিল প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের একক বিশালতম সাম্রাজ্য। কিন্তু এই শতকে রহিল শুধু তাহার ভগ্নাংশটুকু মাত্র। নামে পৃথিবীর অধিপতি (শাহ আলম) হইলেও বাস্তবে তিনি 'আজ্ দিল্লী তা

পালম্' অর্থাৎ দিল্লী হইতে পালম্ পর্যন্ত ক্ষুদ্র এক অংশের নৃপতি হইয়াই রহিলেন। ১৫২৬-১৭০৭ খৃঃ পর্যন্ত মহান মুঘলদের গড়পড়তা শাসনকাল ছিল ৩০ বৎসর। কিন্তু পরবর্তী মুঘলদের সময়ে তাহা হ্রাস পাইয়া মাত্র ১০ বৎসরে দাঁড়াইয়াছিল। আবার মাত্র এক বৎসরের বা কয়েক মাসের রাজত্ব ভোগের দৃষ্টান্তও বিরল নয়। রাজত্ব কালের এই পার্থক্য হইতে আমরা রাজতন্ত্রের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি।

বৈরতন্ত্রে শাসকের চরিত্রের উপরই মূলতঃ সমস্ত কিছু নির্ভর করে। চরিত্রে ও প্রকৃতিতে পরবর্তী হীন মুঘল সম্রাটগণ মোটেই শাসন কার্য্য পরিচালনার উপযুক্ত ছিলেন না। ৬২ বৎসরের বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) শান্তপ্রকৃতি ও বদান্য হইলেও রাজকার্যে অমনোযোগী ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে শাহ ই বে খবর বলা হইত। জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৩) ছিলেন পরিশ্রম-বিমুখ, অমিতব্যয়ী, ব্যসন প্রিয় ও নর্ত্তকী লাল কুঁওর দ্বারা মোহগ্রস্ত। ফারুক সিয়ার (১৭১৩-১৯) নিষ্ঠেজ, পরিবর্ত্তনশীল, মিথ্যাবাদী, ভীরু ও ঘৃণ্য প্রকৃতির বলিয়া ভালমন্দ কোন কিছুই করিবার শক্তি তাঁহার ছিল না। ঐতিহাসিক গোলাম হুসেনের ভাষায় তিনি ছিলেন অস্তিত্বহীন জড়বুদ্ধি মাত্র। ক্ষয়রোগগ্রস্ত রফি উদ্ দরজৎ ও রফি উদ্দৌলা (১৭১৮-১৯) উভয়েই মাত্র কয়েক মাস রাজত্ব করেন। মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮) সম্বন্ধে গোলাম হুসেন লিখিয়াছেন যে তিনি ছিলেন বাবরের বংশের শেষ নৃপতি যাঁহার পর রাজতন্ত্রের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। কিন্তু রাজকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদনে ইনিও ছিলেন সম্পূর্ণ অপদার্থ। ইঁহার উপ নাম ছিল 'রঙ্গিলা'। এই ভীরু ও নির্ব্বোধ সম্রাট প্রিয় পাত্রপাত্রী দ্বারা এত অভিভূত ছিলেন যে স্বীয় বুদ্ধি বিবেচনায় কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। অহমদ শাহ (১৭৪৮-৫৪) শাসন ও রণ কৌশল সম্বন্ধে ছিলেন সম্পূর্ণ অজ্ঞ। মদ, ভাঙ্গ ও চরসে ডুবিয়া তিনি মাতার উপপতি এক খোজাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজ্য, সৈন্যবর্গ ও রাজকোষ—সাম্রাজ্যের এই তিনটি ভিত্তি সম্বন্ধে তিনি কখনই কোন খোঁজ খবর করিতেন না। বিশ্বাসঘাতক উজীর ইমাদ্ উল্ মুল্কের দ্বারা পদচ্যুত বাদশাহ শাহানশাহ অহমদশাহ তৃষ্ণার্ত্ত ও ক্লিষ্ট হইয়া পরম সুখে ভগ্ন ভুলণ্ঠিত মৃৎপাত্রে প্রদত্ত জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করেন। বাহাদুর শাহের পৌত্র দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯)-কে উজীর ইমাদের ক্রীড়নক হিসাবে এক ছায়াময় অলীক নৃপতি ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৬১-১৮০৬)

বুদ্ধিমান হইয়াও ছিলেন অতীব দুর্বল, পরিবর্তনশীল ও অস্থিরমতি। তাঁহার মধ্যে কর্মশক্তির অভাব ও ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ অসাড়তা দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক আক্রমণের সময় কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ঘটনা তৎকালীন মুঘল রাজতন্ত্রের স্বরূপের উপর কৌতূহলোদ্দীপক আলোকপাত করে। নাদির শাহ মহম্মদ শাহকে বন্দী করিয়া নিজেই দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়া দুই মাস রাজত্ব করেন ও স্বীয় মুদ্রা প্রচলিত করেন। কিন্তু প্রত্যাবর্তনের সময় আবার মহম্মদ শাহকেই সিংহাসনে বসাইয়া যান। অহমদ শাহ আবদালীর দ্বিতীয় আক্রমণের সময় (১৭৪৯-৫০) তিনি পাঞ্জাবের সুবাদার মুইন্ উল্ মুল্কের নিকট চার মহলের রাজস্ব (গুজরাট, ঔরঙ্গাবাদ, পসরুর ও শিয়ালকোট) দাবী করেন। মুইনের আর্ত্ত আবেদনে কর্ণপাত না করিয়া সম্রাট অহমদ শাহ আবদালীকেই রাজস্ব অর্পন করেন, যদিও শাসনযন্ত্র মুঘলদের অধীনেই ছিল। আবদালী ভারতের নিজস্ব ভূমির এক টুকরার মালিক হইলেন। তাঁহার পঞ্চম আক্রমণের (১৭৫৯-৬১) পূর্ব্বে দ্বিতীয় আলমগীর তাঁহার অত্যাচারী উজীর ইমাদ-উল মুল্কের শৃঙ্খল হইতে নিজেকে উদ্ধার করিবার জন্য আবেদন করেন। ইমাদ সম্রাট ও ইস্তিজাম্ উদ্ দৌলা উভয়কেই হত্যা করাইয়া দ্বিতীয় শাহজাহানকে সিংহাসনে বসাইলেন (নভেম্বর, ১৭৫৯)।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম বক্সারের যুদ্ধের পর সিংহাসন হারাইয়া ক্ষমতাচ্যুত হইয়া এলাহাবাদে যাযাবরের জীবনযাপন করেন ও ইংরাজদের পেন্সন ভোগ করেন। ক্লাইভ অবশ্য সম্রাটের এই অবাস্তব কর্তৃত্বকেও মানিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেষ্টিংস সম্রাটকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া মোটেই যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই বরং তাঁহাকে জোড়াতালি পোষাক পরিহিত চরম দুর্দশাগ্রস্ত নৃপতি বলিয়া অবজ্ঞা করেন।

১৭৭২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে শাহ আলম মারাঠাদের তত্ত্বাবধানে দিল্লীতে পুনঃ স্থাপিত হইলেন। কিন্তু তাহার পর তিনি আর সৈন্য পরিচালনা করেন নাই বা নিজে কোন কার্য সম্পাদনাও করেন নাই। তাঁহার কোন উজীর, সেনাপতি বা প্রতিনিধি কিছুই ছিল না। মনে হইল যেন এক অভিশিক্ত অথচ অলীক ছায়ার অধীনে ব্যাপক অরাজকতায় মুঘল (আকবর ও শাহজাহানের) উত্তরাধিকার সম্পূর্ণ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। তিনি মাহাদজী সিন্ধিয়াকে বক্সী ও বকীল ই মুৎলক্ নিযুক্ত করেন (১৭৮৮)। কিন্তু নামে মাত্র দাস হইয়া বাস্তবে সিন্ধিয়াই শাহআলমের কঠোর প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন। তিন বৎসর পর আবার

শাহ আলমই সুবিধা হইবে বলিয়া গোলাম কাদের রোহিলাকে মীর বক্সী ও বকীল ই মুৎলক্ নিযুক্ত করেন (সেপ্টেম্বর, ১৭৮৭)। গোলাম কাদের দিল্লী অধিকার করিয়া শাহ আলমকে পদচ্যুত ও অন্ধ করিলেন ও বিদর বক্তকে অভিষিক্ত করিলেন (জুলাই, ১৭৮৮)। গোলাম কাদের কয়েক মাস পর মাহাদজীর নিকট পরাজিত, অন্ধ ও নিহত হন।

(১) অভিজাত সম্প্রদায়ের অবক্ষয়

সেকালে অভিজাতগণকে সাধারণতঃ "রাষ্ট্রের স্তম্ভ" (আরকান্ ই দৌলত) বলা হইত। একদা ইঁহারা পরম বিশ্বস্ত ভাবে, আনুগত্য সহকারে সাম্রাজ্যের সেবা করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যবৃদ্ধিতে, সংগঠনে, প্রশাসনে ইঁহাদের যথেষ্ট অবদান ছিল। কিন্তু এখন তাঁহারাই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গনের অন্যতম প্রধান উপাদান হইলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অভিজাতবর্গের অবক্ষয় রাজতন্ত্রের অবনতির চরম স্বাভাবিক পরিণতি। Irvine বলেন, "সম্রাট স্বভাবতঃ আলসা পরায়ণ, নির্ব্বোধ ও চঞ্চলমতি হইলে তিনি আর অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রভু ও পথ প্রদর্শক হইতে পারেন না।" তাঁহারা এখন অবাধে স্বার্থপরতার নগ্ন মূর্ত্তিতে বিচরণ করিতে আরম্ভ করেন ও মুঘল দরবারে অথবা প্রদেশগুলিতে স্বীয় কর্তৃত্ব সম্পন্ন অধিকার হস্তগত করিবার চেষ্টা করেন।

(৩) দলীয় বা গোষ্ঠিগত রাজনীতি

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাসের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল দলীয় বা গোষ্ঠিগত রাজনীতি। রাজতন্ত্রের অবক্ষয়ে নিয়ন্ত্রণ ও ঐক্যসাধনের যন্ত্র বিকল হওয়ায় দলীয় বা গোষ্ঠিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহজেই গড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইল। শুদ্ধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পার্টি গবর্ণমেণ্টের সহিত এই দলীয় রাজনীতির তুলনা করা চলে না। সেখানে থাকে নীতিগত ভাবে দেশের ও দশের সেবা। এখানে ছিল বংশমর্য্যাদাপুষ্ট ও ধর্ম্মগত, স্বার্থান্ধ গোষ্ঠি যাহার লক্ষ্য দেশের হিত নহে, নিজেদের লাভ ও উন্নতি। সুতরাং আমীরগণের মধ্যে এইরূপ কয়েকটী দলের উদ্ভব প্রশাসনিক কাঠামো, রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাসের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। আত্মরক্ষার সহজাত প্রবৃত্তিই আমীরদের এইরূপ গোষ্ঠি সৃষ্টি করিয়া, প্রশাসন যন্ত্র নিজেদের অধীনে রাখিয়া, প্রাদেশিক গবর্ণর, রণনেতা ও

অনুগত সামন্তচক্র ও পাত্রমিত্র লইয়া নিজ নিজ পক্ষ শক্তিশালী করিতে প্রণোদিত করিত।

সাধারণ ভাবে ইরাণী (বা পারস্যদেশীয় শিয়া) ও তুরানী (বা মধ্য এসিয়া দেশীয় সুন্নী) আমীরগণ ছিলেন বিদেশীয় বা মুঘলিয়া আমীর। ইহা ব্যতীত যে সমস্ত আমীর ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বা যাঁহাদের পূর্বপুরুষগণ বহুকাল পূর্ব্ব হইতে এদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে হিন্দুস্তানী দল বলা হইত। তবে এই বিভাজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল না, কেননা প্রত্যেক দলের মধ্যে কিছু কিছু অন্য দলের লোকও ছিল। সুতরাং এই বিভাজন ধর্ম ও জাতি গত পার্থক্যের উপর আধারিত ছিল না। বাহাদুর শাহ ও জাহান্দার শাহের সময় ইরানী দল শক্তিশালী ছিল,—অসদখান নকীল ও তাঁহার পুত্র জুলফিকার প্রথমে মীরবক্সী ও পরে উজীর হ'ন। ফারুখসিয়ারের সময় হিন্দুস্তানী দল বারহা সৈয়দদের নেতৃত্বে প্রথমে প্রভাবশালী হইলেও ইরাণী ও তুরাণী দলের সম্মিলিত প্রতিরোধের ফলে উচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

শুধু মুঘল দরবারেই এই দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ফল সীমিত ছিলনা। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক ও সামাজিক জীবন সম্পূর্ণভাবে দুষিত, বিশৃঙ্খল ও অকেজো হইয়া পড়ে। (১) একজন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী বা এমন কি রাজার বিরুদ্ধেও ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করেন। একক কোন দলই অন্য দলের উপর কতৃত্ব করিতে পারে নাই। সাম্রাজ্যের নীতিতে ও গোষ্ঠিগত বিবাদের ফলে দ্বিধাভাব আসিল। মুনিম খাঁ ও জুলফিকার খাঁ এর রাজপুত নীতিতে আকাশ পাতাল পার্থক্য ছিল। (২) দীর্ঘকালস্থায়ী ও ব্যাপক প্রশাসনিক সংস্কারের নীতিগ্রহণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিজামের অধীনে তুরাণীদল সৈন্যদলগণের বিদ্রোহ-নিবারক নীতিকে ইসলাম-বিরোধী বলিয়া নিন্দা করে। খান ই দৌরান নিজামের স্বতন্ত্র, বর্জ্জনকারী নীতির বিরোধিতা করেন। এই পরিস্থিতিতে কোন সমস্যার সমাধান হইত না, শুধু সমস্যা মুলতুবী রাখা হইত। আবার কোন উজীরই কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে সংস্কারের দৃঢ় নীতিগ্রহণ করিয়া অধিকাংশ অভিজাতগণের শত্রুতা ক্রয় করিতে সাহসী হ'ন নাই। বাহাদুর শাহ দ্বারা উচ্চ পদের নিযুক্ত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন অনুসন্ধান মুনিম খাঁ করেন নাই। জায়গীরের অযাচ বিতরণ প্রতিরোধ করিতে গিয়া সকলের বিরাগভাজন হন। দলীয় কলহ জায়গীর ব্যবস্থায় উদ্ভূত সঙ্কটের উপরও প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। নতুন জায়ী

দল নিজ অনুচরদের মধ্যে জায়গীর পুনর্বিনিয়োগ করার ফলে জমির ব্যাটতি জটিলতর হইয়া পড়িল। (৩) কামরুদ্দিনের স্বার্থলিপ্সু দল ও খান ই দৌরাণের শান্তি-প্রয়াসী দলের কলহের ফলে প্রথম বাজীরাও এর অধীন মারাঠাদের বিরুদ্ধে কোন দৃঢ় ও দুঃসাহসিক নীতি গ্রহণ করা সম্ভবপর হয় নাই। কর্ণালের যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে নিজামের অধীন তুরাণী গোষ্ঠীর নিষ্ক্রিয়তা সামরিক ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাবের একটি জলন্ত নিদর্শন। মহম্মদ শাহ আবদালীর তৃতীয় আক্রমণের (১৭৫২) সময়েও এই দলীয় কলহের জন্য লাহোরের প্রতিরক্ষা অবহেলিত হয়। সম্রাট আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও সফদর জঙ্গ কিছুই করেন নাই।

১৭০৭ খ্রী: হইতে পরবর্তী মুঘলদের ইতিহাস কেবলমাত্র ইরানী ও তুরাণী দলের সংঘর্ষের ইতিহাস। ১৭৩৯ খৃঃ ইরাণী দলভুক্ত আমীর খাঁ ও ইশাক খাঁ তুরাণী নেতা উজীর কমরুদ্দিন ও বক্সী নিজাম উল্ মুল্ককে ক্ষমতাচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করেন। কিন্তু ইহা ফাঁস হইয়া যায়। মহম্মদ শাহের চরিত্রের দুর্ব্বলতা উৎঘাটিত হইয়া গেল। হয়ু-উজীর আমীর খাঁ আর উজীর হইতে পারিলেন না। ইরাণী ষড়যন্ত্রকারীরা দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইল (১৭৪০)। পুনরায় ১৭৪৪ খ্রী: হইতে তুরাণীদের প্রভাব হ্রাস পাইল। আমীর খাঁ ও সফদর জঙ্গ (অযোধ্যার নবাব) শক্তিশালী হওয়ায় দরবারে পারস্য প্রভাব বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ১৭৪৫ সালে ইরাণীদের বিশিষ্ট নেতা অসদ ইয়ার খাঁর মৃত্যু হয়। ১৭৪৬ খ্রী: আমীর খাঁও নিহত হ'ন। সৈন্যদের বেতন ১৪ মাস বাকী পড়ায় তাঁহার মৃতদেহ চারদিন সৎকার করা সম্ভব হয় নাই।

এই গোষ্ঠীগত কলহই উজীর সফদর জঙ্গের পতনের এক মুখ্য কারণ। অযোধ্যার নবাব সফদর ছিলেন ইরাণী দলভুক্ত শিয়া। তাঁহার বিরুদ্ধে ভূতপূর্ব উজীর কমরুদ্দিনের পুত্র ইন্তিজাম্ উল্‌দৌলা (আজমীরের সুবাদার) ভগ্নিপতি নিজামের দুইপুত্র গাজী উদ্‌দীন ও নাসিরজঙ্গ নিজাম উদ্ দৌলার সহিত যোগদান করিয়া এক তুরাণী সুন্নী শক্তিশালী গোষ্ঠী তৈয়ার করেন। সফদরের সহায়ক মীর বক্সী সলাবৎ জঙ্গ পদচ্যুত হইলে গাজী উদ্‌দীন প্রথমে এই পদ পান। পরে নাসির জঙ্গের হত্যার পর তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হ'ন। সফদর জঙ্গ সম্পূর্ণ রূপে নির্বান্ধব হইয়া পড়েন। ১৭৩৫ খৃঃ পর অযোধ্যার নবাব ইংরাজদের তাঁবেদার হইয়া যান। নিজামও ছিলেন দক্ষিণ ভারতে। কিন্তু মুঘল দরবারে এই দলীয় কলহ পূর্বের মতই চলিতে লাগিল। তবে ক্ষমতার লড়াই-এ যোগদান করিবার জন্য এগিয়ে এল আফগানগণ ও অন্যান্য জাতির বিশিষ্ট দুঃসাহসিক ব্যক্তিগণ।

(৪) উজীরের পদ ও ইহার সমস্যা

মুঘল সাম্রাজ্যে বকীল ও উজীর দুইটি বিশিষ্ট পদ ছিল। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসাবে বকীলই পদমর্যাদায় উচ্চতর ছিলেন। কিন্তু উজীরের কর্তৃত্বাধিকার ও পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষমতা অধিক ছিল। ইহা ব্যতীত উজীরের পদেই স্বকীয় লাভের প্রচুর সুবিধা থাকায় ইহাই অধিক কাম্য ছিল। বস্তুতঃ উজীরই মধ্যযুগে মধ্যপ্রাচ্যে ও ভারতে শাসনপ্রণালীর কেন্দ্রস্থল ছিলেন। কিন্তু উজীর অধিক শক্তিশালী হইয়া পড়িলে বাদশাহের বিপদ হইতে পারে। সেজন্য উজীরের ক্ষমতা কয়েকজন দেওয়ানের মধ্যে বণ্টন করিয়া আকবর এই সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহার পর প্রধান ওমরাহ হিসাবে উজীরের স্থান ধীরে ধীরে পুনঃস্থাপিত হইতে থাকে,—যেমন জাহাঙ্গীরের সময় আসফ খাঁ, শাহজাহানের সময় সাদুল্লা খাঁ ও মীর জুমলা ও ঔরঙ্গজেবের সময় অসদ খাঁ। কিন্তু সম্রাটগণ দৃঢ় ও সতর্ক থাকিয়া প্রশাসনের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। উজীরগণও সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতেন।

১৭০৭ খ্রীঃ পর এই সমস্যা সঙ্কটজনক আকার ধারণ করিল। কেননা তখন রাজপদাধিকারীদের মধ্যে কলহ প্রশমিত করার শক্তি কোন সম্রাটেরই ছিল না। এইরূপ রাষ্ট্রকে বাঁচাইতে বিসমার্ক সদৃশ দক্ষ ও শক্তিশালী এক উজীরের প্রয়োজন ছিল। অথচ উজীরের পদ লইয়া যথেষ্ট রেষারেষি শুরু হইল। নৈপথ্যচারী মুঘল সম্রাটগণের অলীক অস্তিত্বের দরুণ উজীরের চরিত্র ও প্রতিভাই প্রশাসনের স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিত। জনসাধারণের ভবিষ্যৎ তাঁহারই উপর নির্ভর করিত। কিন্তু অপদার্থ সম্রাটগণ উজীরদের এই গুরু দায়িত্ব পালনে কোনই সুবিধা সুযোগ দেন নাই। বরং নিজেদের পাত্র মিত্র লইয়া উজীরদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেও তাঁহাদের বাধে নাই,—যেমন ফারুখসিয়ার ও মহম্মদ শাহের সময়ে। এইরূপ অবিশ্বাসী সম্রাটের অধীনে থাকিয়া সৎ ও দক্ষ উজীরও বুঝিতে পারিতেন যে প্রশাসনের উন্নতিকল্পে কল্যাণকর পন্থা বা নীতি গ্রহণ করিলে নিজের মৃত্যু নিজেই ডাকিয়া আনা হইবে। সৈয়দদের নিয়তি এড়াইতে হইলে উজীরকে সকল মহান আদর্শমূলক প্রশাসকীয় সংস্কার ও লোকহিতকর রাজনীতি বিসর্জন দিয়া তাঁহাকেও স্রোতে গা ভাসাইতে হইবে। সেই সময়ে রাষ্ট্রে কোন দুর্ঘটনা না ঘটিলেই তিনি মনে করিতেন যে তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট কর্তব্যপালন করা হইয়াছে।

ঔরঙ্গজেবের উজীর বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ অসদ খাঁ বাহাদুর শাহেরও উজীর

থাকিবেন এই আশা পোষণ করিতেন। কিন্তু বাহাদুর শাহ পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মুনিম খাঁকে উজীর করিলেন ও অসদ খাঁকে বকীল ই মুৎলকের পদাভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু এই আপোষ মীমাংসায় এ সমস্যার সমাধান হয় নাই। আহাম্মার অবশ্য ইরাণী দলভুক্ত অসদ খাঁর পুত্র জুলফিকার খাঁকে একই সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার ও উজীর নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু জুলফিকারের প্রশাসন সংস্কার নীতি কার্যতঃ ফলপ্রসূ হয় নাই। সম্রাট অবশ্য প্রকাশ্যে উজীরের বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হ'ন নাই কিন্তু তাঁহার অনুগৃহীত ব্যক্তিগণ (অর্থাৎ কোকলতাশ্ গোষ্ঠি) উজীরের সব আদেশ এড়াইয়া যাবার চেষ্টা করিতেন।

ফারুখসিয়ারের সময় হিন্দুস্থানী দলভুক্ত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষমতাসীন হইলে আবদুল্লা উজীর ও হুসেন আলি মীর বক্সী হইলেন। কিন্তু সম্রাটের 'বন্ধুগণ' প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাটের নিকট অধিকার পাইয়া মীর জুমলা উজীরকে এড়াইয়া কাগজপত্রে নিজেই স্বাক্ষর করিতে লাগিলেন। আবার আবদুল্লার মুরব্বির দেওয়ান, বেনে রতনচাঁদ "নিষ্প্রভ মন্ত্রীর উপর স্বীয় প্রভাবের অপব্যবহার করেন" এবং মীর জুমলার দেওয়া সমস্ত নিযুক্তির প্রস্তাব নাকচ করিবার জন্য আবদুল্লাকে প্ররোচিত করিতেন। এইরূপে প্রথমতঃ সম্রাট ও উজীরের পারস্পরিক বিরোধিতায়, দ্বিতীয়তঃ দলীয় সংঘাতে প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হইল। নিজাম উজীরের পদের মোহ পরিত্যাগ করিয়া দূরে যাইয়া নিজের রাজ্য স্থাপন করিতে আগ্রহী হইলেন।

মহম্মদ শাহ ও তাঁহার উজীর কমর্ উদ্ দীন (ইতিমাদ উদ্ দৌলা প্রথম ১৭২৪-৪৮) উভয়েই রাজকার্যে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন। ঐতিহাসিক ওয়ারিদ বলেন যে মারাঠাদের আক্রমণের সংবাদ পাইলেই ক্ষিপ্ত সম্রাট মনস্তুষ্টির জন্য বাগানে বা শিকারে যাইতেন এবং উজীর মহাশয় পদ্মাসনের শোভা দেখিতেন কিম্বা নদীতে মৎস্য বা প্রান্তরে হরিণ শিকার করিতেন। দিনের পর দিন বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও কোনো শাসক রাজ্যের সুপরিচালনা ও সুরক্ষা ও প্রজাদের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যত্নবান হওয়া দূরে থাকুক, কোন চিন্তাও করেন নাই।

কমর উদ্ দীনের মৃত্যুর পর অধমদ শাহ সফদর জঙ্গকে উজীর নিযুক্ত করেন (জুন, ১৭৪৮-৫৩)। কিন্তু তৎকালীন দিল্লী সাম্রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য উজীরের যে বিচক্ষণতা, উদ্দীপনা ও মননশীলতার প্রয়োজন ছিল তা তাঁহার

কিছুই ছিল না। যথেষ্ট সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হইয়াও তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেন। তিনি চমৎকার সৈন্যবলের ও কয়েকটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশের প্রভু ছিলেন। উজীর হইলেও তাঁহার অবস্থা দুর্বল ও বিপন্ন ছিল। সম্রাটের নায়েব শক্তিশালী জাবিদখানের শত্রুতা ও গোষ্ঠিগত দ্বন্দ্ব ব্যতীতও সফদরের নিজের চরিত্রই তাঁহার ব্যর্থতার জন্য দায়ী ছিল। স্বার্থান্বেষণ ব্যতীত অন্য কোন নীতি তাঁহার ছিল না। তিনি না ছিলেন শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, না ছিলেন জনসাধারণের যোগ্য নেতা। জাবিদের হত্যার (১৭৫২) পরও তিনি প্রশাসনের উন্নতি বা রাষ্ট্রের সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অদূরদর্শী নীতিতে, অর্থগৃধ্নুতায়, পদলিপ্সাপ্রিয়তায় ও অসীম অহঙ্কারে সম্রাট শঙ্কিত, আমীরগণ রুষ্ট ও জনসাধারণ বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কোথায় উজীর রক্ষক হইবেন না তিনিই ভক্ষক হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি নিজেই উর্বর ও শস্য, গণ্ডগোলশূন্য জায়গীর ও বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি আত্মসাৎ করিলেন এবং নিজের সৈন্যদল বৃদ্ধি করিলেন। আমীরগণ অনাহারক্লিষ্ট ও বেকার হইয়া পড়িলেন। রাষ্ট্রের অন্যান্য পদাধিকারীদের সৈন্য ও সম্রাটের প্রাসাদরক্ষী ও গোলন্দাজবাহিনীর সৈন্যগণ বেতন না পাইয়া বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা শুরু করিল। তিনি রাজধানীকেও মারাঠাদের লুঠপাট হইতে রক্ষা করিতে পারেন নাই। দিল্লীর আশেপাশে,—দূর প্রদেশের কথা বাদ দিলেও—রাজপথে রাহাজানী অপ্রতিহত ছিল। উজীর স্বীয় কার্যে প্রায়ই দিল্লীর বাহিরে থাকিতেন। কেন্দ্রীয় শাসন নোঙরবিহীন নৌকার মত ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সাম্রাজ্যের সৈন্য সংগঠন পুনর্গঠিত করা তাঁহার কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইহার জন্য অর্থের প্রয়োজন। উজীর সফদর নিজের ভাণ্ডারই ভর্তি করিতে ব্যস্ত ছিলেন। সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জন্য সৈন্যসংস্কারের অবকাশ তাঁহার কোথায়?

সফদরের পর উজীর হইলেন ইন্তিজাম্ উদ্ দৌলা (১৭৫৩-৫৪) ও তাঁহার পর ইমাদ্ উল্ মুল্ক।

(৫) রাজস্ববিভাগ ও আর্থিক সঙ্কট

প্রশাসনিক অবনতির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় রাজস্ব বিভাগে। আকবরের সময় জব্‌তী প্রথা চালু হয়। ইহার প্রধান ভিত্তি ও বৈশিষ্ট্য ছিল জমির পরিমাপন। জাহাঙ্গীরের সময় হইতেই ইহার উপযোগিতা হ্রাস পায়। শাহজাহানের সময়েও ভাঙ্গনের গতি অব্যাহত ছিল। ঔরঙ্গজেবের রাজত্বের

প্রথম দিকে জমির পরিমাপন এক প্রকার শাস্তিমূলক প্রথা হিসাবে গণ্য করা হইত। রাজস্ব ব্যাপারে অত্যাচার ক্রত বাড়িতেছিল। কৃষকরা জমি পরিত্যাগ করিয়া ফেরার হইত, জমি অকর্ষিতই পড়িয়া থাকিত। সুতরাং রাজস্ব হ্রাস পাইত। রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য অনেক অন্যায় দাবী করা হইত। এইরূপে একটা পাপচক্র সৃষ্ট হয়। ঔরঙ্গজেব তাঁহার রাজত্বের প্রথম একাদশ বৎসরের মধ্যে ইহার সংস্কার করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৬৮১ খ্রী: হইতে তাঁহার দাক্ষিণাত্যে বহুকালব্যাপী অনুপস্থিতির জন্য উত্তর ভারতের প্রশাসন সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়ে। সেখানে ২৬ বৎসর ধরিয়া যুদ্ধের ফলে মুঘল সরকার দেউলিয়া হইয়া যান। বাঙ্গলা দেশ হইতে মুর্শিদ কুলী খান যে রাজস্ব পাঠাইতেন তাহাতেই প্রশাসন চালু থাকিত।

১৭০৭ খ্রী: পর পরবর্তী মুঘল সম্রাটগণের প্রশাসনে আগ্রহ বা যোগ্যতা কিছুই ছিল না। বাহাদুর শাহের গাফিলতীর কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার উজীর মুনিম খাঁ ছিলেন কর্ত্তব্যপালনে দক্ষ ও দেওয়ান ইতন্ ও খালসা হিদায়েতুল্লা (সাদুল্লা) খাঁ ছিলেন কর্ম্মনৈপুণ্যে ও কঠিন শ্রম-শক্তিতে অতুলনীয়। কিন্তু সম্রাটই যেখানে দোষী সেখানে কর্ম্মচারীরা কি করিবে? সকলকে বেপরোয়া জায়গীর বিতরণ, পদোন্নতি ও পুরস্কার দ্বারা বাহাদুর শাহ সাম্রাজ্যের আর্থিক সঙ্কটকে গুরুতর করিয়া ফেলিলেন। কেরাণীরাও মনসবদার পদে উন্নীত হইল। যোগ্য, সাধু আরজ্-ই-মুকর্ররর্ ইখলাস খাঁ এই পদ্ধতির অবিবেচনা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে "সম্রাটের প্রিয় অনুচরদের জায়গীর দিলে সারা পৃথিবীও অপর্য্যাপ্ত হইয়া পড়িবে"। আনুকূল্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা যাচাই অত্যন্ত অপ্রীতিকর বলিয়া ইখলাস খাঁ ও মুনিম খাঁ উভয়েই ইহা এড়াইয়া গেলেন। দায়িত্ব লইলেন ঐতিহাসিক সাকি মুস্তয়েদ খান। জমির জন্য আবেদন-পত্র পরীক্ষা করিয়া তিনি সত্যাসত্য যাচাই করিতেন। তাহার পর আরজ্-ই মুকর্ররর্ ও উজীর ইহা সম্রাটের নিকট পেশ করিতেন। পদ্ধতি ছিল ঠিকই, কিন্তু ইহা সময়সাপেক্ষ হওয়ায় সম্রাটের দুই বেগম সহ স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ ইহার বিরোধিতা করেন। ইঁহাদের চাপে বাহাদুর শাহ সরাসরি যে আবেদনপত্র আসিত তাহাতেই স্বাক্ষর করিয়া দিতেন, কিন্তু আড়ালে বিভাগীয় কর্ম্মচারীদিগকে তাঁহার নিজের স্বাক্ষর অগ্রাহ্য করিতে নির্দ্দেশ দিতেন। প্রশাসন প্রহসনে পর্য্যবসিত হইল না কি?

মুঘল সাম্রাজ্যের এক বহু প্রাচীন প্রথানুসারে মনসবদারগণই সাম্রাজ্যের পরিবহন বাহিনীর (Royal Transport Corps) পশুদের ভরণপোষণের ভার

লইতেন। কৃষির অবনতির জন্য ঔরঙ্গজেবের সময় হইতেই জায়গীরের আয় অনিশ্চিত হইয়া যায়, জায়গীরও অপ্রচুর হইয়া পড়ে। জমি সংগ্রহ এক সমস্যা-সঙ্কুল ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু দাবীদার বহু। খাফি খাঁর ভাষায় 'এক আনার, শত বিমার', অর্থাৎ একশ রোগীর মধ্যে মাত্র একটী বেদানা বণ্টনের মত জমি বণ্টনও অপ্রাকৃত হইয়া পড়ে। মনসবদারগণ চরম দুরবস্থায় উপনীত হইলেন। তাঁহাদের বকীলগণ কাজে ইস্তফা দিলেন।

এই অবস্থার উপর্যুপরি কয়েকবার সংস্কারের চেষ্টা করা হইয়াছিল। কিন্তু সবই ব্যর্থ হইয়া যায়।

(ক) মুনিম খাঁ মনসবদারদের পশুসংরক্ষণের ভার হইতে অব্যাহতি দিলেন কিন্তু তাহাতে কেন্দ্রীয় রাজস্ব দফতরের উপর অধিক চাপ পড়িল। আগ্রা দুর্গে সঞ্চিত স্বর্ণ, রৌপ্য মুদ্রা ও নগদে ১৩ কোটী টাকা পাঁচ বৎসরে (১৭০৭-১২ খ্রী:) নিঃশেষিত হইয়া গেল। পূর্বের ন্যায় বাঙ্গলাদেশ হইতে প্রেরিত রাজস্বেই সাম্রাজ্যের ব্যয়ভার বহন করা হইত। রাজকীয় গোলন্দাজ বাহিনীর (ওয়ালা শাহী) বেতন ছয় বৎসর বাকী পড়িয়াছিল। সুতরাং মুনিমের সংস্কারে অবস্থার উন্নতি হয় নাই।

(খ) জাহান্দারের সময় উজীর জুলফিকার খাঁ ব্যয়সংক্ষেপ ও জায়গীর সমস্যা সমাধান করিবার চেষ্টা করেন। তিনি বলিয়া দিলেন যে যতক্ষণ না তদন্তের পর মনসবদারদের প্রাপ্য দাবী বা স্বত্ব সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় ততক্ষণ কোন মনসবদারকে জমি বিতরণের সনদ দেওয়া হইবে না বা পদমর্যাদা বৃদ্ধিও হইবে না। নির্দ্ধারিত সৈন্যসংখ্যা রাখিবার জন্য মনসবদারদের বাধ্য করিবার ও সৈন্য পরিদর্শনের নিয়মকানুন যাহাতে ঠিকমত প্রতিপালিত হয় তাহারও চেষ্টা তিনি করেন। কিন্তু এই কঠোর নিয়মানুবর্তিতা ও মিতব্যয়িতার প্রয়াস কেহই পছন্দ করিতেন না। সম্রাটের প্রিয় পাত্রগণ তাঁহাদেরই মনোনীত ব্যক্তিকে বাবজ্ ই মুকর্‌রর্ নিযুক্ত করাইয়া নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখিলেন। সম্রাট শুধু অকর্ম ক্রীড়নক মাত্র হইয়া রহিলেন।

জাহান্দারের সময় ইজারা বা রাজস্বের ঠিকা প্রথা (farming of revenue) জমীর স্থান সম্পূর্ণ দখল করিয়া সার্বজনীন হইয়া পড়ে। মুঘল সরকার রাজস্বের ঠিকাদার ও অন্তর্বর্তী দালালদের সহিত একটা ব্যবস্থা করিলেন। ইহারা খেয়ালখুশী মত কৃষকদের নিকট হইতে অন্যায় কর আদায় করিত। জায়গীরের আয় কাগজে কলমে বেশী থাকিত কিন্তু বাস্তবে কমিয়া যাওয়ায়

মনসবদারী প্রথা অবশেষে ভাঙিয়া পড়িল। জুল্‌ফিকারের আর্থিক পরিচালক ছিলেন তাঁহার ভূতপূর্ব দেওয়ান সত্তাচাঁদ। ইনি অন্যায় দাবী করিতেন ও ঘুষখোর ছিলেন। রাজধানীতে খাদ্য শস্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইল। ইহার প্রতিরোধ করিতে রাজকীয় বাজারের দোষী ব্যবসায়ী ও পদাধিকারীগণকে শাস্তি দিয়া বারংবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কোন ফল হয় নাই।

ফারুখসিয়ারের স্বাধীন আদেশ সত্ত্বেও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মন্ত্রীত্বকালে সর্বশক্তিমান আমলাদের প্রতিনিধি রতনচাঁদের অধীনে রাজস্ব ঠিকা বা ইজারা দেওয়ার সর্বনাশা প্রথা পুরাদমে প্রচলিত ছিল, এমন কি খালসা জমিও ঠিকা দেওয়া হইত যাঁহারা সর্বোচ্চ দর দিতে প্রস্তুত থাকিতেন তাঁহাদের। তিনি নবনিযুক্ত আমিলের নিকট হইতে চুক্তি বা লিখিত খাজনা—বিলি লইতেন এবং তাহার মহাজনের নিকট হইতে অর্থ লইতেন। কেহই রতনচাঁদকে বাধা দিতে ভরসা পাইত না। দেওয়ান ই তন্‌ ও দেওয়ান ই খালসা সম্পূর্ণ অকার্যকরী হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রীর মুনাফা বৃদ্ধি পাইল কিন্তু খালসা ও জায়গীর জমি হইতে রাষ্ট্রের পাওনা রাজস্ব হ্রাস পাইল।

জায়গীরদারগণের অবস্থারও অবনতি ঘটিল। কেননা তাঁহারা আয় ও ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখিতে পারিতেন না। ক্ষুদ্র জায়গীরদারগণই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। দেওয়ান ই তন্‌ লুৎফ্‌উল্লা খাঁ পঞ্চাশ হইতে এক হাজারী পদাধিকারীদের জায়গীরের পরিবর্তে নগদ বৃত্তি বা ভাতা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইহার পরিমাণ অত্যন্ত অল্প ছিল ও ইহা দেওয়াও হইত অনিয়মিত ভাবে। অনেক সম্ভ্রান্ত আমীরগণও সওয়ার রাখিতেন না এবং মুস্তফীদের যোগসাজসে মিথ্যা রিপোর্ট দিতেন।

পরোক্ষভাবে এই অবস্থায় প্রোৎসাহিত হইয়া বহুসংখ্যক মহাজন, ইজারাদার ও আড়তদারদের এক নতুন শ্রেণীর উদ্ভব হইল। ইহারা যে প্রাচীন আমীরগণকে স্থান করিয়া দিয়াছিল তাহাদের মনোভাব সম্বন্ধে খাফী খাঁ বলেন "রতনচাঁদের অধীনে বায়ূহা ও বেণে ব্যতীত আর কেহই আনুকূল্য লাভ করে নাই" ও "প্রত্যেক প্রদেশের আমীরগণ অপমান ও বিরক্তির মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন"। অন্য একজন সমসাময়িক লেখক খুশহাল্‌চাঁদ লিখিয়াছেন, "রতনচাঁদ রাজতন্ত্রের রীতিনীতির বদলে দোকানদারীর নিয়ম চালু করেন", অর্থাৎ সব কিছুই নীলামে চড়ান।

(গ) এই নব অভিজাতদের প্রতিকূলতা করিবার জন্য ফারুখসিয়ার এনায়েৎউল্লা

কাশ্মীরী নামে এক আলবগীরী আমীরকে দেওয়ান ই তন্ ও খালসা (সাম্রাজ্যের রাজস্ব মন্ত্রী) নিযুক্ত করিলেন। উজীরের সঙ্গে বোঝাপড়া না করিয়া তিনি এই পদে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। স্থির হইল যে এনায়েৎউল্লা উজীরের মারফতে না যাইয়া প্রত্যক্ষভাবেই সম্রাটকে তাঁহার প্রস্তাব পাঠাইবেন, উজীরও নিজে তাঁহার কাছারীতে উপস্থিত থাকিবেন ও রতনচাঁদকে ক্ষমতা ছাড়িয়া দিবেন না। এই ভাবে এনায়েৎউল্লা প্রশাসনকে তৎকালীন আবিলতা হইতে মুক্ত করিয়া ঔরঙ্গজেবের যুগের নিয়ম ও শৃঙ্খলার পুনঃস্থাপন করিয়া রাজস্ব বাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে অবলুপ্ত জিজিয়া কর পুনরায় ধার্য হইল। পদাধিকারীগণ বা অন্যান্য অযোগ্য ব্যক্তিগণ ন্যায্য পাওনার অতিরিক্ত বা ছলনা দ্বারা যে সমস্ত লাভজনক সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন তাহা তিনি হ্রাস বা পুনরধিকার করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু জিজিয়া হিন্দুদের কাছে ঘৃণনীয় ছিল। এবং সেই বিকৃত দরবারে অনেকেই বিশেষতঃ রতনচাঁদ তাঁহার বিরুদ্ধে শত্রুতাচরণ করিতে লাগিলেন। উজীর রাজস্ব আদায়ে ইজারা প্রথা উঠাইয়া লইতে অস্বীকার করেন এবং সরকারী অর্থ-ব্যবসায়কারী সব রাজস্ব পদাধিকারীদের রক্ষা করেন।

মহম্মদ শাহের আলস্যে ও অকর্মণ্যতায় সামরিক শক্তিহীনতা ও আর্থিক অনটন বৃদ্ধি পাইল। ভীতি-উদ্রেককারী কোন প্রভু বা রক্ষাকর্তা না থাকায় প্রত্যেক আমীরই যথেচ্ছভাবে সাধারণ রাজস্ব লইত, প্রত্যেক জমিদারই আশেপাশের জমি দখল করিত বা নিজ সীমানার বাহিরে ও প্রাণে বলপ্রয়োগ দ্বারা কর কিম্বা উৎকোচ আদায় করিত। মারাঠা আক্রমণের ফলে বাঙ্গলাদেশের বরাদ্দ রাজস্ব ১৭৪৬ হইতে বন্ধ হইয়া যায়। কোষ শূন্য হওয়ায় সম্রাট ও তাঁহার বংশ দারিদ্র্যে চরম দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। কেন্দ্রীয় শক্তি দুর্বল হওয়ায় প্রদেশগুলি আক্রান্ত হইল বা স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। সুতরাং মুঘল দরবার এবং সৈন্যবল উক্ত প্রদেশের রাজস্ব হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়িল। সৈন্যদলের বেতন বাকী পড়িল, এবং অভিযানের জন্য কোন ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হইল না। বিদ্রোহী গভর্ণর বা লুঠেরা জমিদারদিগকে সায়েস্তা করা সম্ভব হয় নাই। ধীরে ধীরে দরবারের দেউলিয়া অবস্থা দাঁড়াইতে লাগিল। তখন শক্তিশালী মন্ত্রী ও প্রিয় বেগমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, উর্বর জায়গীর, লাভজনক শহরবাজার ও অন্যান্য আয়-বহুল আকর দখলের জন্য উন্মত্ত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। সপ্তদশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যের কামধেনু সুরাট বন্দরের শুল্কের স্রোত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু রাজধানীর নিকটস্থ শস্য-বাজার হইতে যথেষ্ট

আয় হইত। যমুনা খাল হইতে বৎসরে ২৫ লাখ আদায় হইত, ইহা সফদর জঙ্গই লইতেন।

সাধারণতঃ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও শান্তিতম প্রদেশগুলিই খালসা ও সম্রাটের নিজী জমির (সর্ফ-ই খাস) জন্য আলাদা করা থাকিত। কিন্তু মহম্মদ শাহের রাজত্বে শক্তিশালী আমীরগণ, যেমন জাবিদ খাঁ, সফদর জঙ্গ ও ইমাদ উল্ মুল্ক,—এই সব স্থানের রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে লাগিলেন। সম্রাটের ভাগে পড়িয়া রহিল শুধু ক্ষুদ্রটুকু। তাঁহারা কৃষক ও ব্যবসায়ীদের লুঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সম্রাট, তাঁহার পরিবারবর্গ, নিজস্ব দাস ও রক্ষকগণ সকলেই অনাহারে ক্লিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। প্রত্যেক আমীর নিজের বর্তমান স্বার্থটুকু আঁকড়াইয়া রহিলেন, দেশের বা নিজের ভবিষ্যতের কথাও চিন্তা করিলেন না। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা এখন স্বাধীন রাজ্যে বৈভবশালী হইয়া রহিলেন। জাবিদ খাঁ, সফদর জঙ্গ ও সলাবৎ খাঁ (জুলফিকার জঙ্গ নীর বকশী) এই তিনজন আমীর ব্যতীত দরবারের বা রাজধানীর অন্য সকল আমীরেরই নিয়মিত আয় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। জমান টাকা খরচ হইবার পর দাস ও সৈন্য বরখাস্ত করিয়া তাঁহারা দারিদ্রের মধ্যে পতিত হইলেন। সাম্রাজ্যের সৈন্যবল একেবারেই বিনষ্ট হইল। যে কয়জন পাহারাদার ও গোলন্দাজ ছিল তাহাদের বেতন বহু বাকি বকেয়া রহিয়া গেল।

অহমদ শাহের সময় সৈন্যদের বেতন ১৪, ১৮, ৩৬ মাস বাকী পড়িল। অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া তাহারা বিদ্রোহ ও হাঙ্গামা করিতে লাগিল প্রত্যেক মাসেই। পানিপথের শাকির খাঁ বলেন, সম্রাটের গুদামঘরের ও কারখানার যাবতীয় জিনিষপত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থে বেতন মেটান হইল। নধাএগিয়ার (বিলাইতী) সৈন্যরা ও সম্রাটের প্রাসাদসৈন্য, উমীর, আমীর, সাহ, ব্যবসায়ী ও কারিগর দোকান হইতে জোর করিয়া জিনিষ কাড়িয়া লইয়া বিক্রয় করিল। আমীরদের শুধু পরিধানের বস্ত্র ও মৃৎপাত্র অবশিষ্ট রহিল।

(৬) বিচার পদ্ধতি

মুঘল সম্রাটদের আমলে তিনটি পৃথক বিচার সংস্থা ছিল। (১) ধর্মীয় আদালত (Court of Religious law) কাজীর অধীনে; (২) সাধারণ আদালত (Court of Common law), প্রাদেশিক শাসক, স্থানীয় পদাধিকারীগণ, উপজাতীয় প্রধানগণ ও caste পঞ্চায়েতের অধীনে; (৩) রাজনৈতিক মামলার আদালত,—সম্রাট বা তাঁহার প্রতিনিধির অধীনে।

কেন্দ্রে থাকিতেন প্রধান কাজী (কাজী উল্ কুজ্জাৎ), প্রদেশে কাজী। ধর্ম সংক্রান্ত সমস্ত মামলা (যেমন পারিবারিক কলহাদি, উত্তরাধিকার, waqf, বিবাহ ইত্যাদি) ইঁহাদের নিকট আসিত। কাজী আইনের ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন না। ব্যাখ্যাতা ছিলেন মুফ্‌তী (advocate-general ?)। ইনি ফতোয়া বা নজিরের (precedent) বিশেষজ্ঞ হইতেন।

সাধারণ বা ধর্মনিরপেক্ষ আদালতগুলি থাকিত সম্রাটের প্রতিনিধিদের অধীনে,—অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসক বা অন্যান্য স্থানীয় পদাধিকারী যেমন কোতোয়াল বা ফৌজদারের অধীনে। হিন্দু গ্রামবাসীদের জন্য থাকিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা পঞ্চায়েতের মোড়লের অধীনস্থ আদালত। ইঁহারা কাজীর অধীনে থাকিতেন না ও রীতিগত (customary) আইন অনুসারে বিচার করিতেন।

রাজনৈতিক মামলায় সম্রাট বা তাঁহার প্রতিনিধির বিচারকে Urf বলা হইত। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দোষ, শান্তিরক্ষা (law & order), বিদ্রোহ, দাঙ্গাহাঙ্গামা, চুরি ডাকাতি, খুন প্রভৃতি বিষয়গুলি ইহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মুঘল সম্রাট ছিলেন বিচারের উৎস, প্রথম অবস্থার আদালত (court of first instance)। আবার তিনি উন্মুক্ত আদালতে আপীলও শুনিতেন।

ইহা ব্যতীত সাম্রাজ্যে দান, ও অভাবগ্রস্ত পণ্ডিত বা ছাত্রদের সাহায্য প্রকল্পে কেন্দ্রে একজন সদর উস্ সুদুর (Sadr us Sudur) অর্থাৎ মুখ্য সদর ও প্রত্যেক প্রদেশে একজন সদর থাকিতেন। ইঁহাদের কর্তব্য ছিল ইসলামীয় আইনচর্চা ও জ্ঞানবৃদ্ধি ও প্রকৃত ধর্ম প্রচার করা। কখনও কখনও ইঁহারা কাজীরও কাজ করিতেন। ইঁহারা ধর্মের উদ্দেশ্যে জমি উপযুক্ত ব্যক্তিগণকে দিতেন ও অনুপযুক্ত ব্যক্তিদের জমি পুনরধিকার করিতেন। গোলাম হুসেন বলেন যে কাজীর দক্ষতা ও চরিত্র যাচাই করাও সদরের অন্যতম কর্তব্য ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই পদ অত্যাচার ও হিংস্রতার উৎস ভূমি হইয়া উঠিল। সহস্র সহস্র নিরীহ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ইঁহারা আত্মসাৎ করিলেন।

ফারুখসিয়ারের সময় নাগাদ বিচারপদ্ধতি একেবারেই ভাঙিয়া পড়িল। অন্যান্য পদের সহিত কাজী ও সদরের পদও প্রকাশ্যে বিক্রয় বা ইজারা দেওয়া হইত। গভীর নৈরাশ্যে গোলাম হুসেন বলেন, "আইনজ্ঞ ও বিচারে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ হইতে উধাও হইয়া যান; একই চিন্তা সকলের মনে,—যেন তেন প্রকারেণ অর্থপ্রাপ্তি। সকল শ্রেণীতে ইহাই ছিল একমাত্র উচ্চাশা...ধর্ম ও নীতির আদর্শ রক্ষা করা দূরে থাকুক, ইঁহারা দরিদ্র জনসাধারণের জীবন ও

সম্পত্তি নির্লজ্জভাবে নষ্ট করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তে অপরে সাহস পাইয়া অনুতোভয়ে অনুতপ্ত চিত্তে অন্যায় কাজ করিতে লাগিলেন। প্রতিকার অসম্ভব হইয়া পড়িল। মানুষের জীবন অতিষ্ট হইয়া উঠিল। বিশ্বে সকলেই যেন দৃষ্টিশক্তিহীন ; চিরন্তন অন্ধকার পৃথিবীকে ছাইয়া ফেলিল।"

কাজীর কর্তব্য ছিল নিরপেক্ষ ও নির্ভয়ভাবে আইন রক্ষা করা। তিনি বেতন ও জায়গীর ভোগ করিতেন। কোন পারিশ্রমিক বা ঘুষ লইলে তিনি সকলের চোখে পতিত হইয়া যাইতেন। কিন্তু এখন কাজীর পদেও ইজারা, উপ-ইজারা (lease এবং underlease) চলিতে লাগিল। এই সব অধার্মিক, ইসলামীয় নীতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, ধর্ম-ত্যাগী ও নাস্তিকদেরও অধম কাজীগণ বিবিধ উপায়ে মুসলমানদের উপর অত্যাচার করিত ও তাহাদের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত। সাধারণ লোক বিশ্বাস করিত যে কাজীর প্রতিনিধি না আসা পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মা বাড়ী ছাড়িবেনা। অশুচি গৃহস্বামীকে একঘরে হইয়া থাকিতে হইত। সুতরাং কাজীর পারিশ্রমিক আদায় করিতে তাহাকে পথে পথে ভিক্ষা বা কর্জ্জ লইতে হইত বা তৈজসাদি বিক্রয় করিয়া কপর্দকশূন্য হইতে হইত। কিশোরদের সুন্নতের ও কিশোরীদের বিবাহের সময়েও কাজীর পারিশ্রমিক না দিলে কার্যসিদ্ধি হইত না। ইহার জন্য গৃহস্বামী একঘরে হইতেন।

দরিদ্র, অরক্ষিত, দুর্বল লোক সদা সর্বদা প্রত্যেক বিষয়ে মন্ত্রী ও সম্রাটের নিকট যাইতে পারিত না। তাহাদের দুর্গতি অবিলম্বে উপশমের জন্য দারোগা ই আদালতের পদ সৃষ্টি হয়। তাঁহাকে ভোর ৪টা (daybreak) হইতে বেলা ৩টা পর্যন্ত আদলতে থাকিতে হইত ও ব্যক্তিনির্বিশেষে মামলা শুনিতে হইত। মামলা সহজ হইলে আপোষ করা হইত। গুরুত্বপূর্ণ হইলে লিখিত ঘটনা বিবৃতি (মুন্নৎহাল) সাক্ষী, বাদী, প্রতিবাদী সহ মন্ত্রী ও সম্রাটের নিকট উপস্থাপিত করা হইত সপ্তাহে দুইবার। প্রদেশে সুবাদার বা ফৌজদারের নিকট ইহার নিষ্পত্তি হইত।

কিন্তু এখন বিচারকার্য অর্থকরী পেশায় ও প্রহসনে পর্যবসিত হইল। পূর্বে এই পদে যোগদান করিতে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিও ইতঃস্তত করিতেন। অথচ এখন উৎকোচ গ্রহণের সুবিধা থাকায় এই পদের জন্যই মারামারি কাটাকাটি পড়িয়া যাইত। গবর্ণমেণ্টের নিকটও ইহা কৃপা ও পছন্দের ব্যাপার হইত। দারোগার ও অপরের বেতন এখন জরিমানা ও আনুষঙ্গিক আয় হইতে দেওয়া

হইত। সুতরাং ইঁহাদের পক্ষে অপর্যাপ্ত অর্থসংগ্রহ করা কঠিন হইত না। কেহই এই ব্যাপারে অনুসন্ধান করিত না।

জনসাধারণের জীবনযাপন প্রণালী ইসলামীয় নীতির অনুযায়ী করিয়া গড়িয়া তোলা ছিল মুহ্‌তসিব (Censor of Public Morals)-এর কাজ,—যেমন মদ্য বা মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, ব্যভিচার দমন ইত্যাদি। গোলাম হুসেন বলেন যে যাহাতে পাজার বজ্জাতরা (roadside romeos) পথচারী মহিলাদের অবমাননা না করিতে পারে বা পথে মাতলামী বা আনুষঙ্গিক আঘাত ও অপমান নিবারিত হয় তাহার প্রতিও ইঁহাকে দৃষ্টি রাখিতে হইত। এই সময়ে কোনও কোনও প্রদেশে ইনি বাজারে শস্য ও অন্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ, ক্রেতা বিক্রেতাদের কলহ নিবারণ, ওজন ও মাপের সঠিকতা পরীক্ষা করিতেন, যদিও ইহা পূর্বে ও তৎকালীন সময়ে কোনও কোনও স্থানে কোতোয়ালের কর্তব্যের সামিল ছিল।

এই সময়ে যদৃচ্ছাচার হইত। ইঁহারা অন্যায় কর লইতেন, একই সহরে, একই বাজারে দামের তারতম্য হইত, ওজন ও মাপের কারচুপি হইত। পথে বহু পানশালায় অসংযমী লোকের, যেমন অর্ধনগ্ন, মাতাল ভৃত্য, নাপিত, খালাসী সিপাহীদের, বিশেষতঃ ইংরাজদের,—ভিড় জমিয়া যাইত। ইহাতে জড়িত হইয়া না পড়িতে হয় সেজন্য ভদ্রলোকেরা কর্মব্যপদেশে বাজারের ভিতর দিয়া বা পথের উপর দিয়া যাতায়াত করিতে ইতঃস্তত করিতেন, ও যাত্রার সময় ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বিপমুক্ত হইবার চেষ্টা করিতেন।

(৭) গুপ্তচর বিভাগ

সাধারণতঃ বলা হয় যে মুঘল যুগে গুপ্তচর বিভাগে চার শ্রেণীর লোক নিযুক্ত হইতেন—ওয়াকিয়ানবীশ বা সংবাদদাতা, সোয়ানিনিগার, খুফিয়ানবীশ (গুপ্ত সংবাদদাতা) ও হরকারা (মৌখিক সংবাদদাতা)। কিন্তু এই ব্যবস্থা প্রথম থেকেই প্রচলিত হয় নাই, ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেন্দ্রে, প্রদেশে, সহরে, আদালতে সর্বত্রই গুপ্তচরেরা বিচরণ করিত। বিভিন্ন চরের বিবৃতিগুলি তুলনা করিয়া সত্যাসত্য যাচাই করা হইত। আবার গুপ্তচরের উপরও গুপ্তচর থাকিত। ওয়াকিয়ানবীশ প্রকাশ্যে কাজ করিতেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকিলে তাঁহাদের বিবৃতির যথার্থতা নিরূপণের জন্য সোয়ানিনিগার নিযুক্ত হইতেন। তিনিও দুর্নীতিপরায়ণ হইলে অত্যন্ত গোপনভাবে খুফিয়া-নবীশ নিযুক্ত হইতেন। স্থানীয় পদাধিকারীরাও ইঁহার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল

থাকিতেন না। ইহারা প্রত্যেকেই লিখিত রিপোর্ট পাঠাইতেন। হরকারা সাধারণতঃ মৌখিক খবর বহন করিলেও কখনও কখনও লিখিত বিবৃতি দাখিল করিতেন। গুপ্তচরদের রিপোর্ট পাঠাইবার ব্যবস্থাকে ডাকচৌকী বলা হইত। অশ্ব, বাহক ইত্যাদির দল ও আড্ডা থাকিত (relay)। প্রদেশের বিবৃতিগুলি শীলমোহর সম্বলিত হইয়া দারোগা ই ডাকচৌকীর নিকট আনীত হইত। তিনি তাহা না খুলিয়াই সম্রাটের জন্য উজীরের নিকট পাঠাইতেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে এই বিভাগের কর্মদক্ষতা অত্যন্ত নীচে নামিয়া গিয়াছিল। গোলাম হুসেন বলেন যে এই সময়ে এ সমস্ত পদের অস্তিত্ব আর ছিল না। গ্রামে, নগরে ও বড় বড় সহরে জমিদারের ভৃত্য, প্রিয়পাত্র ও আশ্রিত এমন কি গুপ্তচর বা এজেন্টগণই সরকারের প্রসাদ ও পরলাভ করিয়া নির্ভয়ে নানাবিধ অত্যাচার ও অন্যায় কর আদায় করিতে লাগিল। প্রতিবাদ করিবার বা শাস্তি দিবার কেহ ছিল না। চমৎকৃত পাঠকের মনে শুধু এই প্রশ্নই উঠিবে, এ কিরূপ প্রশাসন ?

(খ) প্রাদেশিক প্রশাসন

আকবর হইতে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও ঐক্যসাধনের যুগ। ঔরঙ্গজেবের উত্তর কালে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দী ছিল সঙ্কোচন ও বিভাজনের যুগ। আকবর মুঘল সাম্রাজ্যকে প্রথমে ১২ ও পরে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন। শাহজাহানের সময় সুবার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ২২। ঔরঙ্গজেবের সময় মুঘল সাম্রাজ্য সর্বোচ্চ বিস্তারলাভ করিলেও সুবার সংখ্যা ছিল ২১।

প্রাদেশিক প্রশাসন ছিল কেন্দ্রীয় শাসনেরই প্রতিরূপ ও ক্ষুদ্র সংস্করণ। সম্রাটের স্থলে থাকিতেন সুবাদার বা শাসনকর্ত্তা। ইহা ব্যতীত কেন্দ্রীয় সংগঠনের ন্যায় এখানেও দেওয়ান, বক্সী, সদর, কাজী গুপ্তচর ইত্যাদি থাকিত। সুবাদার অবশ্য বরাবর নিজে প্রদেশে সম্রাট হইবার প্রয়াস করিতেন। কিন্তু সুবাদার ও দেওয়ানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকায় ও মহান মুঘলদের আমলে প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের উপর নানাবিধ বাধানিষেধ থাকার ফলে ইহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার সুযোগ বিশেষ পান নাই।

কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজতন্ত্রের শিথিলতার ফলে অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইয়া গেল। এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেই সাম্রাজ্যের বহুল বিভাজন ও সঙ্কোচন

লক্ষিত হয়। নাদির শাহ, অহমদ শাহ আবদালী ও মারাঠাদের আক্রমণে বহু অঞ্চল হস্তচ্যুত হয়। আবার বিভিন্ন প্রদেশেও স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। পূর্বে সুবাদারগণ অল্প সীমিত কালের জন্য প্রদেশ শাসন করিতেন। কিন্তু এখন কয়েকজন উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দক্ষ সুবাদার অনেক বৎসর ধরিয়া প্রদেশ শাসন করেন। বাহিরে দুর্বল সম্রাটের প্রতি আইনগত বশ্যতা স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁহারা স্ব স্ব রাজবংশ স্থাপিত করেন,—বাংলায় মুর্শিদকুলী জাফর খাঁ (১৭১৩-২৭), দাক্ষিণাত্যে নিজাম উল্‌মুল্ক আসফ জাহ্ (১৭১৩, ১৭২৫-৪৮), অযোধ্যায় সাদৎ খাঁ (১৭২০-৩৯) এবং পাঞ্জাবে প্রথম সৈফ্‌দ্দৌলা দিল্লীর জন্য (১৭১৩-২৬)। মারাঠাগণ মালব ও গুজরাট যথাক্রমে ১৭৪১ ও ১৭৫৩ খৃঃ এ অধিকার করেন।

কয়েকজন প্রবর্তক—রাজপ্রতিনিধি (founder-viceroys) প্রশাসক হিসাবে কল্যাণকর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহারা ছিলেন দৃঢ় ও দক্ষ, দেশে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিতেন এবং জনসাধারণকে শুধু দস্যু ও বিদেশী হানাদারদের কবল হইতেই নয়, নিম্ন পদাধিকারীগণের অবৈধ অন্যায় দাবী হইতেও রক্ষা করিতেন। মুর্শিদকুলী তাঁহার বিচারে এরূপ নিরপেক্ষ থাকিতেন ও আদেশ পালন সম্বন্ধে এত দৃঢ় ছিলেন যে সালিমুল্লার ভাষায় কেহই অত্যাচার করিতে সাহস পাইত না। আসফ জাহ নিজাম খালেশ, বালাঘাট ও অন্যান্য অঞ্চল হইতে জমিদার ও কৃষকদের নিকট হইতে অবৈধ জিলাদারী কর অবলুপ্ত করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত তিনি উপকর (abwabs) সংক্রান্ত সম্রাটের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ রাখিতেন। জাকারিয়া খাঁ পাঞ্জাবের কারিগর ও অন্যান্য লোকদের সহিত প্রায় পারিবারিক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখিতেন। নাদির শাহ যে সমস্ত বন্দী ভারতীয়দের ইরাণে ক্রীতদাসের ন্যায় শ্রমিক হইবার জন্য লইয়া যাইতেছিলেন তাহাদের মুক্তি দিবার জন্য তিনি নাদিরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দৃঢ়, ন্যায়-পরায়ণ ও সতর্ক থাকিয়া তিনি প্রজাদের অত্যাচার ও আভ্যন্তরীণ দস্যুতা হইতে রক্ষা করিতেন। প্রজারা তাঁহাকে ভালবাসিত ও উপাস্য পাত্র বলিয়া মানিত।

নাদির শাহের আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাতে প্রাদেশিক প্রশাসনও সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া পড়িল। সরকারের অপযশের জন্য সাধারণের মনে আর কোন ভয় রহিল না। সুতরাং যে সমস্ত প্রদেশে কোন দৃঢ় সুবাদার ছিল না সেখানে শান্তি একেবারে উধাও হইয়া যায়। যে লুণ্ঠনমূলক প্রবৃত্তি মুঘল প্রশাসন ও মর্যাদা দ্বারা প্রতিহত

হইয়াছিল তাহা সাম্রাজ্যের সর্বত্রতন অঞ্চলেই জাগিয়া উঠিল,—সমস্তিপে জাঠ ও শিখগণ বহু গ্রাম দখল করিল (১৭৪০); সাসারামে পেশবার প্রতিনিধি দ্বারা আনীত অর্থ অপহৃত হইল (১৭৪৩); গঙ্গাযমুনা দোয়াবে আদি মহম্মদ রুহেলা লুটতরাজ ও নিজের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। কিন্তু শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে সম্রাটের যথোচিত সৈন্যবলও ছিলনা।

পুলিশ বিভাগ

মুঘল যুগে পুলিসী ব্যবস্থা তিনভাগে আলোচনা করা যাইতে পারে,—গ্রাম্য পুলিস, নগর পুলিস ও জেলা পুলিস। স্থানীয় অপরাধের জন্য স্থানীয় পদাধিকারীগণই দায়ী থাকিতেন। গ্রামে মুঘলেরা কোনই পুলিসী ব্যবস্থা করেন নাই। স্থানীয় সংস্থার উপর ইহা ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। চৌকিদার গ্রাম্য সংস্থার ভৃত্য হিসাবে কিছু জমি বা শস্যের কিছু অংশের পরিবর্তে এই কাজ করিত। মুঘল গবর্ণমেণ্ট কোনও দায়িত্ব গ্রহণ করে নাই। গ্রামের লোকেরাই নিজেদের প্রাণ ও সম্পত্তির সুরক্ষা করিত এবং তাহার জন্য দায়ী থাকিত।

নগরে পুলিস অফিসার ছিলেন কোতোয়াল। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত নাগরিকের জীবনযাপন প্রণালী ইনিই নিয়ন্ত্রিত করিতেন। জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, বাসগৃহের তালিকা, সান্ধ্য আইন, বেশ্যাবৃত্তি ও মদ্যাদি ব্যবহার নিষেধ, গুপ্তচরবৃত্তি, বেকার সমস্যা, হাট বাজার নিয়ন্ত্রণ, চৌর্য নিবারণ, খেয়াঘাট নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি নানাবিধ কার্য সম্পাদন ইনি করিতেন।

সরকার বা জেলার অধিপতি ছিলেন ফৌজদার। তাঁহার স্থান ছিল সুবাদারের নীচেই। তাঁহাকে দুর্বিনীত জমিদার ও দস্যুতস্করদের উৎখাত করিতে হইত। রাজস্ব আদায়ের সময় ফৌজদার সৈন্য ব্যবহার করিতেন। গোলাম হুসেন বলেন যে প্রয়োজনে নিকটবর্তী ফৌজদারগণও তাঁহাকে সাহায্য করিতেন ও বিভিন্ন প্রদেশের নাজিমগণও (সুবাদার) একত্রিত হইয়া, কেন্দ্রের আদেশ ব্যতীতও কাজ করিতেন। তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল জাহাঙ্গীরনগর বা ঢাকা। বাঙ্গালায় ১০টি সরকার ছিল,—ইসলামাবাদ-চাটগাঁ, সিলহেট, রংপুর, ঘোড়াঘাট, জালালগর-পুরানিয়া, রাজমহল-আকবরনগর, বাজশাহী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, বন্দরবন্দর-হুগলী। বিহারের রাজধানী ছিল পাটনা-আজিমাবাদ। সেখানে ৮টি সরকার ছিল,—শাহাবাদ, রোটাস, মুঙ্গের, বিহার, চম্পারণ, সারণ, ত্রিহুত ও হাজীপুর।

১৭৬৫ খ্রীঃ পর জমিদারদের ক্ষমতাবৃদ্ধির জন্য ফৌজদারগণ আদেশ দিতে কিম্বা

তাহাদের অত্যাচার হইতে সাধারণকে রক্ষা করিতে ভয় পাইতেন। অপহৃত দ্রব্য উদ্ধার করিলে ফৌজদারই তাহা লইতেন। গোলাম হুসেন বলেন যে এখন ফৌজদারগণ অত্যাচার বৃদ্ধি ব্যতীত আর কিছু করেন না। কারণ মহম্মদ রেজা খানের সঙ্গে তাঁহাদের ঐক্যতা ছিল। তিনি আরও বলেন যে ইংরাজরা ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য মোটেই উৎসুক ছিল না ও সাধারণের পক্ষে গবর্ণর হেস্টিংসের সহিত সাক্ষাৎ করাও দুরূহ ব্যাপার ছিল।

সূত্র নির্দেশ

[Bibliographies given in *Camb. History of India*, vol IV, Sarkar's *Fall of the Mughal Empere*, vols I & II Satish Chandra's Parties *and* Politics *of the Mughal Court 1707-40* may be used with profit. A few selected works are noted below.]

ORIGINAL SOURCES

a. Persian

1. Siyar ul Mutakherin by Ghulam Husain Tabatabai. Eng. Tr. by Raymond (Haji Mustafa). Covers 1118-94/1707-1782.
2. Bahadur Shahnamah by Nimat Ali Khan (Danishmand Khan). official history of Bahadur Shah's reign. Covers 1707-9.
3. Muntakhab ul Lubab by Khafi Khan. B. I.
4. Nadir uz Zamani by Khushhal Chand. A general history up to 17th year of Muhammad Shah's reign. 2 vols.
5. Jaipur State Records, Persian *farmans*, *hasbul hukm*, *Parwanas*. *Akhbarat* (news-letters), vakil reports & business papers (1707-23)—now in State Archives, Rajasthan, Bikaner.
6. Tarikh i Shahadat i Farrukhsiyar wa Julus i Muhammad Shah by Muhammad Bakhsh, Ashub, brother of Md. Shah. Extracts in E & D. VIII. 232.
7. Maasir ul Umara, A biographical dictionary of Mughal peerage by Shah Nawaz Khan. Eng. Tr. by H. Beveridge and Baini Prasad. 2 vols. B. I.
8. Tazkirah or Tarikh i Mubarak Shahi by Mirza Mubarakullah

(Iradat Khan). Comp. 1714. Covers 1707-13. Eng. Tr. by Jonathan Scott as Memoirs of Eradut Khan. 1794.
9. Mirat i Waridat or Tarikh i Chughtai by Muhammad Shafi Warid (Tehrani). Ends 1734.
10. Jangnama (of Jahandar & Farrukh siyar) by Nimat Khan Ali. Text and Tr. by W. Irvine (JASB. 1900).
11. Azam ul Harb by Kamraj. 1707 only.
12. Tazkira, by Shakir Khan son of Lutfullah Khan B. Sadiq (Panipati).
13. Tazkira, by Anand Ram Mukhlis. ends 1748. Ext. in E & D. VIII.
14. Bayan i Waqai by Kh. Abdul Karim Kashmiri.
15. Chahar Gulzar i Shujai by Harcharan Das (1784).
16. Imad us Sadat by Sayyid Ghulam Ali Naqvi. (1807)
17. Tarikh i Ahmad Shahi. Anonymous.
18. Mirat i Ahmadi by Ali Muhammad Khan. GOS. Baroda. 3 vols Eng. Tr.
19. Memoirs of Tahmasp Khan (Miskin), Muhakam ud daulah Itiqad Jang. 1780. E. and D. VII
20. Riyaz us Salatin by Ghulam Husain Salim. 1788. B. I. Eng Tr.
21. Salimullah. Tarikh i Bangalah (C. 1763).
23. Delhi Chronicle. a diary of events written in Delhi 1738-93 (Jadunath Sarkar in Proc IHRC. ii. 1921).

b. Marathi.

1. Aitihasik Patra Vyavahar. Ed. by G. S. Sardesai.
2. Selections from Peshwa Daftar. Ed. by G. S. Sardesai.

c. Hindi

1. Vamsh Bhaskar by Suraj Mal Mishran (1841)
2. Virvinod by Kaviraj Shyamal Das, 4 vols.
3. Sujan Charitra by Sudan (1745-53) or Life of Suraj Mal Jat.

d. English

1. Calendar of Persian Correspondence. (Govt. of India).
2. Orme, Robert. History of the Military Transactions . ... Indostan. London, 1803. vol I.

II. MODERN WORKS

1. Cambridge History of India. vol IV. Ed. by Richard Burn,
2. Irvine, William, Later Mughals. 2 vols. Ed. by Jadunath Sarkar, Cal. 1921-2. Reprint.
3. Keene, Henry George, (i) The Turks in India. Reprint 1972. (ii) A Sketch of the History of Hindustan, 1885. Reprint 1972.
4. Owen, Sidney J., The Fall of the Mogul Empire 1912 : 2nd edn. Chowkhamba Sans. Series, 1960.
5. Sardesai, G. S., A New History of the Marathas, 3 vols.
6. Sarkar, Jadunath, (i) Fall of the Mughal Empire, 4 vols Reprint. (ii) Bengal Nawabs. (As.Soc) (iii) Military History of India. (iv) Mughal Administration.
7. Satish Chandra, Parties and Politics at the Mughal Court, 1707-40, Reprint.
8. Srivastava, A. L, First two Nawabs of Oudh.
9. Saran, P., The Provincial Government of the Mughis 1526-1658 (1941).
10. Sharma, Sri Ram, Mughal Government and Administration, 1951/1965.
11. Qureshi, I. H. Administration of the Mughul Empire, 1966.
12. Ibn Hasan, Central Structure of the Mughul Empire. Reprint.
13. Sarkar, Jagadish Narayan, (i) Police System in Medieval India in Theory and Practice, (*Bihar Police Magazine*, 1954); (ii) News-Writers in Mughal India (in *Indian Press*. ed. by S. P. Sen)
14. Husaini, S. A. Q., Administration under the Mughuls, Second ed- 1962.
15. Wahid Husain, Administration. of Justice during the Muslim Rule in India, 1934.
16. Ahmad, M. B. Administration of Justice in Medieval India, 1941.

'ইক্‌মিক্‌ কুকার' প্রসঙ্গে

সুবীর রায়চৌধুরী

প্রবন্ধের নাম শুনে পাঠক হয়তো ভাবছেন যে 'ইক্‌মিক্‌ কুকার' থেকে 'প্রেশার কুকার'-এ বিবর্তন বিষয়ে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত হবে। না, রান্নার প্রসঙ্গের নামগন্ধও এতে নেই। 'ইক্‌মিক্‌ কুকার' কথাটা শুনলে আপনার মনে যেসব 'মুখরোচক' অনুষঙ্গ ভেসে ওঠে, তার কিছুই আপাতত আমার আলোচ্য নয়। 'ইক্‌মিক্‌ কুকার'-এর স্রষ্টা স্বয়ং ইন্দুমাধব মল্লিক বেঁচে থাকলে অবাক হয়ে যেতেন এই ভেবে যে বাঙলা দেশে বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে আজ ইক্‌মিক্‌ কুকারের মানে

১ পাতালপুরীর 'সন্ধ্যাভাষা'। ২ চুরির মোটা টাকা

এই অর্থপরিবর্তনে শুধু কি ইন্দুমাধব মল্লিকই অবাক হবেন, আমরা যারা ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দেও বেঁচে আছি এবং বাঙলা যাদের মাতৃভাষা, তারাও কি এই মানের সঙ্গে পরিচিত? তাহ'লে এটা কি বাঙলা শব্দ নয় কিংবা 'হুসেন-হুসেন'-এর (হাসান-হোসেন) মতো কোনো বিকৃত শব্দ?

'কুকার' ইংরেজি শব্দ হ'লেও বাঙলায় গৃহীত এবং সাধারণত মূল অর্থেই বাঙলায় ব্যবহৃত হয়। তবু ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক[১] যাদের বলেছেন পাতালপুরীর লোক অর্থাৎ যারা অপরাধজগতের অধিবাসী, সমাজবিরোধী, দুষ্কৃতিকারী তাদের মধ্যে এক বিশেষ গোষ্ঠীর কাছে পূর্বোক্ত শব্দটির মানে সম্পূর্ণ ভিন্ন অথচ তারা অনেকেই বাঙলাভাষী। এরকম কেন হয়?—কেন তারা অর্থকে বিকৃত করেছেন? তারা কি শ্রীমতী ম্যালাপ্রপ-এর শিষ্য নাকি এই অর্থ-পরিবর্তন তাদের অভিপ্রেত? অধিকাংশ বাঙলাভাষীই যদি তাদের ব্যবহৃত বাঙলা শব্দাবলি বুঝতে না পারেন, তাহ'লে তাদের বাঙলা বলার সার্থকতা কোথায়? কিংবা তারা হয়তো ভাষাকে সীমাবদ্ধ রাখতে চান নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে যাতে তাদের অভিসন্ধি 'অবাঞ্ছিত'রা বুঝতে না পারেন? যাকে আমরা 'স্ল্যাঙ' বলি সেগুলোও কি এরকম সাঙ্কেতিক? যদি তা-ই হয়, মূল শব্দভাণ্ডারের সঙ্গে তার যোগ কোথায়?

ইংরেজিতে যেসব শব্দকে 'স্ল্যাঙ' (রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা অনুযায়ী 'অপভাষা', সুকুমার সেনের মতে 'ইতর শব্দ') আর 'ক্যাণ্ট' (সুকুমার সেন যার বাঙলা করেছেন 'অপার্থ-ভাষা', ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের মতে 'পাতালপুরীর সঙ্কেতভাষা') ব'লে শ্রেণীবিভাগ করা হয়, তাদের মধ্যে প্রধান মিল হ'লো দুয়েরই উৎপত্তি মুখের ভাষায়। কিন্তু মুখে-মুখে সৃষ্ট হ'লেও শিক্ষিত ভদ্রসমাজের আদর্শ কথ্যভাষায় গোড়াতে 'স্ল্যাঙ' এবং 'ক্যাণ্ট' কারোরই প্রবেশাধিকার থাকে না। কোনো ব্যক্তির খেয়ালে বা কৌতুকে, কোনো দল বা শ্রেণীর ইচ্ছায়, কোনো পেশার প্রভাবে প্রতিদিনের ব্যবহারে জীর্ণ শব্দে অভিনবত্ব আনার চেষ্টা আছে স্ল্যাঙে। এই কারণে কেউ কেউ অপভাষাকে 'ইতরজনের কবিতা' বলেছেন। কবিতার চিত্রকল্পের মতো এ-ও বহু ব্যবহারে বাসি হ'য়ে যাওয়া শব্দে ও বাক্যে চমক আনে, অভিনবত্ব দেয়। যেমন কোনো মোটা মেয়েকে যখন 'ডবল ডেকার' বলা হয়, তখন সেটা আলঙ্কারিক প্রয়োগই। এটা স্বাভাবিক যে যিনি যে-পেশার লোক তার অপভাষায় সে-বৃত্তির অল্প-বিস্তর প্রভাব থাকবে, যেমন কারখানার কর্মীর ভাষায় নাট বল্টুর প্রসঙ্গ যতো সহজে আসবে, একজন চাষীর কথাবার্তায় ততো আসবে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপভাষার একটা প্রবণতা আছে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ার দিকে—কোনো ব্যক্তি যদি কোনো শব্দ তৈরি করেন, তিনি চাইবেন সেটা তার গোষ্ঠি বা শ্রেণীতে প্রচারিত হোক, গোষ্ঠি বা শ্রেণী চাইবে বৃহত্তর সমাজে তা ব্যাপ্ত হোক। অপভাষার এই ঊর্ধ্বমুখিতা লক্ষ ক'রে কেউ কেউ একে বলেছেন,—"ভবঘুরে ভাষা" "যা বৈধ (মার্জিত) ভাষার আশেপাশে ঘোরাফেরা করে এবং ফাঁক পেলেই সভ্যতার ভাষার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়ে"। এই অনুপ্রবেশ সব সময়ে চলছে।

এবং এখানেই অপভাষার সঙ্গে ক্যাণ্টের প্রধান পার্থক্য। ক্যাণ্ট হ'লো চোর ডাকাত খোচ্চোর বদমাশ বেশ্যা ভবঘুরে ইত্যাদি শ্রেণীর তৈরি শব্দাবলি। সুতরাং ক্যাণ্টেও পেশার ছাপ আছে, কিন্তু পেশার প্রয়োজনেই তারা নিজেদের শব্দাবলি বিষয়ে রক্ষণশীল। কেননা অপভাষার লক্ষ্য যদি হয় অভিনবত্ব, অপরাধজগতের শব্দাবলির অভিপ্রায় হ'লো গোপন রাখা। চোর ডাকাত পকেটমারদের সাঙ্কেতিক শব্দগুলি যদি জানাজানি হ'য়ে যায়, তাহ'লে তাদের ব্যাবসার প্রচণ্ড ক্ষতি হবে। অপরাধজগতের অধিবাসীরা নিজেদের মধ্যে অনেক স্ল্যাঙ ব্যবহার করে, কিন্তু তারা তাদের নিজস্ব শব্দগুলির সংরক্ষণ বিষয়ে বিশেষভাবে সচেতন। তবে চোর-ডাকাতদেরও মাঝে মাঝে বৃহত্তর সমাজের সংস্পর্শে আসতেই হয় এবং

সেই আদান-প্রদানে বহু গোপন শব্দ ফাঁস হয়ে যায়। তখন আবার নতুন প্রতিশব্দ তৈরি হয়। অপভাষা ভাতে উঠলে তা আদর্শ কথ্য ভাষায় গৃহীত হবে। অন্যদিকে অপার্থভাষার কোনো শব্দ বেশি প্রচলিত হ'লে তা অপভাষায় উন্নীত হবে, কিন্তু অপরাধ জগতের বুলি হিশেবে বর্জিত হবে। চোরাকারবারিরা যেমন প্রায়ই গোপন আস্তানা পালটায়, তেমনি এই গোপন ভাষায় আলাপীরা শব্দ পালটায় জানাজানি হ'য়ে যাবার আশঙ্কায়। কথার কথা ধরুন, এই 'ইক্‌নিক্ কুকার' শব্দটির মানে বেশি পরিচিত হ'য়ে গেলে অপরাধ জগৎ থেকে নির্বাসিত হবে।

কিন্তু তাই ব'লে অপার্থ ভাষা পুরোপুরি সাঙ্কেতিক ভাষা নয়। বাক্যের গঠনের দিক দিয়ে এটা মূল ভাষার অনুসারী। তবে এর প্রধান কতকগুলি শব্দ, ইংরেজিতে যাকে বলে 'কী ওয়র্ডস', সেগুলি সাঙ্কেতিক এবং এই সব শব্দাবলি বহুল পরিচিত হবার আশঙ্কা দেখা দিলেই বদলে যাবে। অপরাধ জগতের প্রধান কারবার পুলিশ, মেয়ে, মদ, বোমা ইত্যাদি নিয়ে। এগুলির যতো প্রতিশব্দ আছে, তুলনায় গাঁজা, কিংবা স্কুল-কলেজ প্রসঙ্গ নেই বললেই চলে। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁর 'অপরাধ-জগতের ভাষা'র ৪৫ পৃষ্ঠায় যে-তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখতে পাচ্ছি পুলিশ-এর প্রতিশব্দ ৪৭টি, বোমা-র ২৬টি, মেয়ে-র ২৪টি এবং মদ-এর ২৪টি। যেমন পুলিশ কী কী নামে অপরাধ জগতে পরিচিত ?

> কর্‌কোর্‌ । কোঠারি । কুত্‌তা । খোচর্‌ । খোচোর্‌ । খিল্‌লোচর্‌ । খোমোচোর্‌ । খেট্‌খেল্‌ । খেট্‌কেল্‌ । খাঁচুকেল্‌ । খাঁকুলেআল্‌ । চাঁদিআর্‌ । গোয়েন্দেট টুপির্‌ । চুপা (<চোখা) । চোক্‌ (রাতে যে পুলিশের হাতে টর্চবাতি থাকে । জুন্‌লি । ঝুড়ি । ঝাঁকাওলা । ঝাঁকামুটে । টিক্‌টিকি । ঠোলা । ডিঙ্‌গুর্‌ । চেলা । পপি । পপার্‌ । পোপার্‌ । ফাউআর্‌ । বিলা । মুদ্‌গা । মাছি । ম্যালেরিআ । মাচর্‌ । চামার্‌ । মুটিআ । রাজারাক্কা । রাজার্‌ ছেলে । রাবোন্‌-বিভিলোন্‌ । লোঠা (<ঠোলা) । লেপাই । লাল্‌জি । লাল্‌মিআ । লাঠি । সুপিস্‌ । সন্‌ডু । সুক্‌কর্‌ । হরমা । হন্‌ডর্‌ ।

এই শব্দগুলির সঙ্গে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'-এ প্রদত্ত ভূরিপ্রয়োগের তালিকা মিলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে কোন্‌ শব্দটা কতো

বেশি প্রচলিত। তাছাড়া পাঠক হয়তো লক্ষ করবেন যে ওপরের অনেকগুলি প্রতিশব্দই অপভাষায় পরিচিত। যে শব্দগুলি অপভাষায় যতো বেশি পরিচিত হবে, অপার্থভাষায় সেগুলির ব্যবহার ততো ক'মে যাবে।

অবশ্য গোপন ভাষায় কথাবার্তা বলার প্রয়োজন সবারই হ'তে পারে। এর জন্য নানা রকম যমক-শ্লেষের প্রয়োগ ছাড়াও অন্যান্য অনেক রীতি আছে। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা সেটা একভাবে করে, সাধু-সন্ন্যাসীরা হয়তো অন্যভাবে করেন। 'চর্যাপদ'-এর ভাষাও সন্ধ্যাভাষা। অনেক সময়ে নতুন শব্দ তৈরি ক'রে নয়, বহু পরিচিত গানের কলিকে সঙ্কেত হিশেবে ব্যবহার করা হয়। যেমন 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে সত্যানন্দ যখন মনের আনন্দে গান গাইছিলেন, 'ধীর-সমীরে তটিনী তীরে বসতি বনে বরনারী', তখন সিপাইদের মাথাতেও আসে নি যে এর মধ্য দিয়ে সঙ্কেতবার্তা প্রেরিত হচ্ছে। ঠগি দস্যুরা ঠগি না সাধারণ পথিক চেনবার জন্য একরকম সঙ্কেত ব্যবহার করতো। যেমন কোনো মুসলমানের সঙ্গে দেখা হ'লে বলতো, 'আউলে খান সালাম', আর হিন্দুকে বলতো 'আউলে ভাই রাম রাম'। সাধারণ লোকের কাছে এটা নেহাৎই ফুপলবার্তা। কিন্তু ঠগির কাছে এর অন্য মানে—ঠগি হ'লে এর প্রত্যুত্তরে পুরো বাক্যটা আবার বলবে। তাতেই অন্য পক্ষ বুঝতে পারবে যে দলের লোক। চর্যাপদে সাধারণ মানে আর আভিপ্রায়িক অর্থের পার্থক্যের কথা আমরা জানি। কিন্তু এরকম স্বার্থিক বাক্য বা বহুশ্রুত কবিতার লাইনকে সাঙ্কেতিক বাক্য হিশেবে ব্যবহার করা সাধারণ নিরক্ষর অপরাধীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে বিশেষ বিশেষ পরিবেশে তা-ও বিচিত্র নয়। এক সময়ে 'ক্যাণ্ট'কে ইংরেজিতে 'থীভ্‌স ল্যাটিন' বলা হ'তো—এই নামের একটা ইতিহাস আছে। রিফরমেশনের সময় বহু যাজক-পাদ্রি জীবিকা হারিয়ে সমাজবিরোধী হীন কাজে জড়িয়ে পড়েন। তারা অনেক সময় নিজেদের অভিপ্রায় গোপনের উদ্দেশ্যে ল্যাটিন শব্দ ব্যবহার করতেন। এভাবে অপরাধ জগতে বহু ল্যাটিন শব্দ চালু হ'য়ে যায় (দ্র "দি ল্যাঙ্গুয়েজ অব দি আণ্ডারওয়র্ল্ড", 'হিয়ার দেয়ার অ্যাণ্ড এভরিহোয়্যার', এরিক পার্টিজ, লণ্ডন, ১৯৫০)। যাই হোক, সাধারণ পেশাদার দৈনন্দিন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তৈরি করে সাঙ্কেতিক শব্দাবলি এবং সেগুলিই হ'লো ক্যাণ্ট।

এখন প্রশ্ন হ'লো এই সব শব্দাবলির সঙ্গে মূল ভাষার শব্দভাণ্ডারের যোগ কতোটুকু? উপভাষার সঙ্গে প্রধান ভাষার যোগ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ এবং শিক্ষিত-

অশিক্ষিত শহরে-গ্রাম্য সব শ্রেণীর লোকেদের ওপরই আঞ্চলিক ভাষার অল্প-বিস্তর প্রভাব থাকতে পারে। অন্যদিকে নানা কারণে নানা ভাবে ব্যক্তিত কথ্যভাষাতেও অপভাষার প্রভাব থাকে। একজন অশিক্ষিত গ্রাম্য ব্যক্তি হয়তো স্ল্যাঙ ব্যবহার করবেন অচেতনভাবে, তুলনায় একজন শহুরে শিক্ষিত ব্যক্তি সচেতনভাবে তার কথাবার্তায় দু-একটা অপভাষার নিদেশ দিয়ে দেবেন। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কারণটা বিবিধ—কখনো কথাবার্তায় স্বাতন্ত্র্যের জন্য, কখনো ভাবপ্রকাশের সংহতির জন্য, কখনো বা নিছক কৌতুকের জন্য, কখনো বা নেহাৎই অবহিত উদ্দেশ্যে। স্ল্যাঙবিশারদ এরিক পার্‌ট্রিজ স্ল্যাঙ ব্যবহারের ষোলো-সতেরোটি কারণ নির্দেশ করেছেন। সেই সব কারণগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ আপাতত নেই। তবু আমরা সবাই আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি অনেক তথাকথিত অভিজাত মজলিশের মধ্যমণি একটু হেসে শুরু করেন, আপনারা কিছু মনে করবেন না, আমার মুখটা একটু খারাপ। সেই মুখ খারাপ করার উদ্দেশ্যে তিনি আত্মসচেতনভাবে অনেক স্ল্যাঙ ব্যবহার করেন। তাছাড়া যৌন প্রসঙ্গ ইত্যাদি বিষয়ে স্থূল চিত্রকল্প প্রয়োগের একটা প্রবণতা আছে। তবে শব্দব্যবহারকালে আমরা যেমন ব্যুৎপত্তি বিষয়ে সচেতন থাকি না, তেমনি অপভাষার বহু চিত্রকল্পগুলিও অস্পষ্ট হ'য়ে আসে। এজন্য কথায় বলে, 'অপভাষা "জাতে" উঠলে তার জাত চ'লে যায়'। কেননা স্ল্যাঙের ব্যবহার ব্যাপক হ'তে হ'তে ক্রমশ আদর্শ কথ্যভাষায় গৃহীত হয়, তারপর একদিন বই এবং সাধারণ অভিধানেও স্থান পায়। কিন্তু তখন তাৎক্ষণিক অনুষঙ্গগুলি গৌণ হ'য়ে যায়। একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। 'কচু পোড়া খাও' কথাটির অনুষঙ্গ না জেনে আমরা হামেশাই ব্যবহার করি। এমন কি রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধানে কথাটির শ্রেণীবিভাগ আছে 'অবজ্ঞাসূচক', কিন্তু এই 'কচু পোড়া'র 'কচু' অণ্ডকোষের সাদৃশ্যে গঠিত (দ্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান')। আজকে শব্দের সেই অনুষঙ্গ বদলে গেছে। অবশ্য জীবিত ভাষার ক্ষেত্রে উল্টোটাও ঘটতে পারে। কোনো শব্দ এক সময়ে হয়তো নিঃসঙ্কোচে ভদ্রসমাজে ব্যবহার করা যেতো, কিন্তু এখন করা যায় না। যেমন 'মাগী'। বিদ্যাসাগর কতো অনায়াসে লিখতে পেরেছিলেন, 'আমি আদর করিয়া তোমায় মাগী বলিয়া আহ্বান ও সম্ভাষণ করিতাম ; তদনুসারে তুমিও মাগী শব্দে আত্মনির্দ্দেশ করিতে' (প্রভাবতী সম্ভাষণ)। আধুনিক কালে কোনো বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধাকে দূরের কথা নিজের স্ত্রীকেও মাগী ব'লে সম্বোধনের পরিণাম ভাবতে পারি না।

লীগ খেলায় দলের ওঠা-নামার মতো শব্দের ক্ষেত্রেও উন্নতি-অবনতি আছে। তার দ্বারা মূল ভাষার সঙ্গে অপভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই সূচিত করে। কিন্তু অপরাধ জগতের শব্দাবলির সঙ্গে কি সাধারণ ভাষার সেরকম কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে? কোনো জীবিত ভাষার শব্দভাণ্ডারে যতো শব্দ আসবে (তা সে যে উৎস থেকেই আসুক না কেন), ততোই তার সজীবতার প্রমাণ। অবশ্য এই আমদানির ফলে ভাষা যদি তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে তাহ'লে অন্য কথা। অপরাধ জগতের অধিবাসীরা পেশার তাগিদে সাঙ্কেতিক শব্দাবলি ব্যবহার করলেও তাদের প্রত্যেকেরই মাতৃভাষা আছে এবং স্বাভাবিকভাবে তাকে পুরোপুরি বর্জনের প্রশ্নই ওঠে না। তবে এই ক্যান্ট বিষয়ে সমাজের ওপরতলার অধিবাসীদের নানা কারণে কৌতূহল হতে পারে—পুলিশ এবং গোয়েন্দাদের জানবার দরকার হবে চোর ধরবার জন্য, ভাষাবিজ্ঞানীর আগ্রহ হবে ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার প্রয়োজনে, সমাজসেবীর ইচ্ছে হবে নিচুতলার জীবনযাত্রার সঙ্গে পরিচিত হবার তাগিদে, ঔপন্যাসিক-নাট্যকারের উৎসাহ হবে গোয়েন্দাগল্পে অথবা অন্যান্য রচনায় অপরাধ জগতের পরিবেশ জীবন্ত করে তোলবার জন্য। কিন্তু মূল ভাষার এজাতীয় শব্দের আমদানি চোরাই চালানের মতো—সোজা পথে সহজ ভাবে কোনো ক্যান্ট আসবার উপায় নেই, যদি না ভক্তি-প্রসাদের মতো ভাষাবিজ্ঞানীরা অনেক অধ্যবসায়ে এ ব্যাপারে অগ্রণী হন। তবে ভদ্র শিক্ষিত সমাজের ছেলেরা যখন 'মস্তান' হ'য়ে ওঠে, তখন তারাও অনেক সময়ে এই দুই জগতের মধ্যে সেতুর কাজ করে।

বাঙলা অপভাষারই সেরকম কোনো অভিধান সঙ্কলিত হয় নি, ক্যান্টের তো দূরের কথা। তবে রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ, যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুবলচন্দ্র মিত্র, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের অভিধানে অনেক ইতর, গ্রাম্য শব্দ স্থান পেয়েছে। বছর তিনেক আগে কুমারেশ ঘোষ 'আড্ডার অভিধান' (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ) নামে এ জাতীয় কিছু শব্দ সংকলন করেছিলেন, তবে বইটি উল্লেখযোগ্য শুধু প্রথম প্রচেষ্টা ব'লে। যাই হোক, দীর্ঘ এগারো বছরের শ্রম ও নিষ্ঠায় ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 'অপরাধ-জগতে শব্দকোষ : পশ্চিম বাঙলা' নামে অপার্থ ভাষার শব্দ সংকলন ক'রে আমাদের সবার কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। গত শতকে স্যর উইলিয়ম স্লীম্যান ঠগিদের ব্যবহৃত শব্দাবলির একটি তালিকা 'রামসিয়ানা' (১৮৩৩)* নামে প্রকাশিত করেছিলেন। তারপর দীর্ঘকাল এ বিষয়ে কোনো আগ্রহ চোখে পড়ে নি। আবার নতুন ক'রে

আলোচনার সূত্রপাত করলেন ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক। তাঁর শব্দকোষের সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে 'অপরাধ-জগতের ভাষা'। শেষোক্ত বইতে শব্দসংকলনের অভিজ্ঞতা এবং এগুলির ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত সাতটি প্রবন্ধের বিষয় হ'লো : 'পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগৎ', 'নিষেধ ও কুসংস্কার', 'ইঙ্গিত', 'ভাষার কারিকুরি', 'ধ্বনিতত্ত্ব' ও 'রূপতত্ত্ব'। আসলে দুটি বই পরিপূরক, তবে যাঁরা শুধু শব্দ-সংগ্রহে উৎসাহী, তাঁদের পক্ষে 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'ই যথেষ্ট। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক শব্দগুলি সংগ্রহ করেছেন কোনো লিখিত উৎস থেকে নয়—একেবারে অপরাধ-জগতের বাসিন্দাদের মুখ থেকে এগুলি সংকলিত। বাঙলা ভাষায় এজাতীয় কাজ প্রথম ব'লে তিনি আমাদের অভিনন্দনযোগ্য এবং দু-এক জায়গায় তাঁর সঙ্গে মতভেদ হ'লেও বইটির গুরুত্ব কমে না।

২

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের শব্দকোষে প্রায় তিন হাজার শব্দ আছে (অভিধানিকের হিশেব অনুযায়ী ২৯৫২। শব্দগুলি উল্লিখিত হয়েছে মোট ২৪৮৯৩ বার)। এদের তিনি প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন :

১ পেশাদার অপরাধীদের ব্যবহৃত গোপন উক্তি—এরকম শব্দের সংখ্যা ৯০৪।
২ পাতালপুরীতে ব্যাপকভাবে প্রচলিত—এরকম শব্দ হ'লো ১০৬৯।
৩ অপরাধজগৎ ও অন্যত্র যাদের প্রচলন রয়েছে—এরকম শব্দ ৯৭৮।

প্রতিটি শব্দের ভূরিপ্রয়োগের উল্লেখ থাকায় অভিধানের উপযোগিতা অনেক বেড়েছে। সংগৃহীত শব্দাবলির ভূরিপ্রয়োগের শতকরা হিশেব 'অপরাধ-জগতের ভাষা'য় পাওয়া যাবে। কৌতূহলী পাঠকের জন্য তালিকাটি নিচে দেওয়া হ'লো :

১	বার ব্যবহৃত শব্দ	৪%
২-৫		২১%
৬-১০		২৯%
১১-৪০		৩৬%
৫০	এবং তদূর্ধ্ব	১০%

এই শব্দ-সংগ্রহে তিনি ১৯৬০ থেকে ৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ২০২০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন, তাদের মধ্যে ১১৫৮ জন অবাঙালি, ৮৬২ জন বাঙালি। নারী-পুরুষ হিশেবে শ্রেণীবিভাগ হ'লো : পুরুষ ১৯৩৫, নারী ৩৯, হিজড়া ২৬। এদের মধ্যে ১৬১০ জন নিরক্ষর, ৩৯৩ জন সাক্ষর, ১৭ জন উচ্চশিক্ষিত। পেশাগত ভিত্তিতে 'তথ্য সরবরাহকারী'র শতকরা হিশেব হ'লো এইরকম :

১ ডাকাত ও তস্কর	১০·১৫%	১০ জালিয়াৎ	০·৮৯%
২ ছিনতাইকারী	১০·৬৯%	১১ পতিতা	০·৫৪%
৩ গন্ধাবাজ	১০·৮৯%	১২ পতিতার বাড়িওলা ও দালাল	১০·২১%
৪ চোর	১৬·১৯%	১৩ চোরাই কারবারি	৩·৮১%
৫ পকেটমার	১৬·০২%	১৪ সমাজবিরোধী	১৩.৬৬%
৬ চোরাইমালের ক্রেতা	২·২৩%	১৫ ইভ টিজর	৬·৯৩%
৭ তোলনবাজ	১১·২৪%	১৬ ভিখিরি ও তার দালাল	২·৫৭%
৮ ছেলেধরা	০·১৫%	১৭ রেলগাড়ি ভঙ্গকারী	১·০৯%
৯ ঠগ	০·৯৯%	১৮ হিজড়া	১·২৯%

২০২০ জন তথ্যদাতার মধ্যে ৪০০ জনেরও বেশি অপরাধীকে জিগগেশ করা হয়, তারা এজাতীয় শব্দ কেন ব্যবহার করে। এ বিষয়ে তাদের উত্তর হ'লো :

১।	কথাবার্তা গোপন রাখার উদ্দেশ্যে	৮৫
২।	ধরা পড়ার ভয়ে	৭৬
৩।	লঘু বুলি চটকদার এবং সহজে বোঝানো যায়	৭২
৪।	ব্যবহারে মজা লাগে	৬৯
৫।	ভাষা থেকে স্ল্যাঙ বাদ পড়লে কথা বলা কঠিন	৫১
৬।	ব্যবহারের কারণ জানা নেই	২৬
৭।	মেলামেশার ফলে ব্যবহার	১৮
৮।	উত্তর মেলেনি	১৫
		৪০৯

অপরাধ-জগতের শব্দকোষ' সংকলন প্রসঙ্গে ওপরে যে সব তথ্য প্রদত্ত হ'লো,

তার মধ্যে কৌতূহলী পাঠকের প্রথমেই যেটা দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটা হ'লো তথ্যদাতাদের অধিকাংশই হলেন অবাঙালি—২০২০ জনের মধ্যে ১১৫৮ জনেরই মাতৃভাষা বাঙলা নয়। বাঙলায় সংকলিত অপরাধ-জগতের শব্দকোষে অবাঙলা-ভাষীদের এই আনুপাতিক গরিষ্ঠতার কারণ কী? এ বিষয়ে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক গৃহীত সমীক্ষার ফল তাঁর ভাষাতেই বলা যাক :

> 'পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের অধিবাসী কারা? এখানে হিন্দী-ভাষীদের প্রাধান্য। অবাঙালিদের প্রায় সকলেই নিরক্ষর।...
>
> অশিক্ষিত বাঙালি এবং অ-বাঙালিদের ব্যবহারের শব্দভাণ্ডার অভিন্ন। তবে উচ্চারণ ভঙ্গী এবং ব্যবহৃত বাক্যগুলির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। পশ্চিম বাঙলার অপরাধ-জগতের পীঠস্থান কোলকাতায় বাঙলা হিন্দীর মিশ্ররূপ পাওয়া যায়।'
>
> [অপরাধ-জগতের ভাষা, পৃ ৩৯]

এখানে ভক্তিপ্রসাদ যা বলেছেন তা হ'লো অপরাধ জগতের শব্দভাণ্ডার অভিন্ন হ'লেও মাতৃভাষাভেদে অপরাধীদের মধ্যে উচ্চারণ এবং বাক্যের গড়নে পার্থক্য থাকে। তবে সাধারণভাবে এ-জগতে বাঙলাভাষীদের ওপর হিন্দির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

আগেই বলা হয়েছে ক্যাণ্টবিশারদদের মতে এ জাতীয় শব্দাবলি হ'লো 'ভোক্যাবুলারি', পুরোপুরি ভাষা নয়। ভক্তিপ্রসাদও স্বীকার করেছেন, 'অপরাধ-জগতের ভাষার বাক্যরীতির (syntax) নিজস্ব কোনো পদ্ধতি নেই। পশ্চিম বাঙলার ভাষায় বাঙলা ও হিন্দী বাক্যরীতির প্রভাব রয়েছে' (ঐ, পৃ ৪১)। একই কথা তিনি 'ধ্বনিতত্ত্ব' প্রবন্ধে বলেছেন, 'বাঙলাদেশের বাঙালি অপরাধী এবং অপরাধ-প্রবণদের লঘুভাষার বাক্যরীতি বাঙলা চঙ-এর। যদিও হিন্দীর প্রাধান্য অনস্বীকার্য' (ঐ পৃ ৭৫)। কিন্তু তার পরেই 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'-এর ভূমিকায় যখন তাঁকে বলতে শুনি 'পশ্চিম বাঙলার বিভিন্ন স্থানীয় উপভাষা, বিভাষা ও এই রাজ্যের পাতালপুরীর অবাঙালিদের ভাষার মিলিত প্রভাবে অপরাধ-জগতের ভাষার সৃষ্টি,' তখন সংশয় জাগে। তাহ'লে কি অপরাধ-জগতে বাঙলা ভাষারই পরিবর্তন হ'তে চলেছে? কেননা আরেক জায়গায় ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক স্পষ্টই বলেছেন,

'পশ্চিমবাঙলার অপরাধজগতের ভাষা বাঙলা, হিন্দী, ভোজপুরী, নগহী, উর্দু সব মিলিয়ে এক জগাখিচুড়ি। এই জগাখিচুড়ি ভাষা অপরাধীদের বড়ো প্রিয়—তাদের জীবনবেদ।' [ঐ পৃ ৭]

এই 'জগাখিচুড়ি ভাষা' যদি অপরাধ-জগতের 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হ'য়ে দাঁড়ায় তাহ'লে ঐ জগতে বাঙলা ভাষার অস্তিত্ব কীরকম জানতে ইচ্ছে করে। কেননা শুধু শব্দ নয়, পুরো ভাষাকেই রূপান্তরিত করছে এ অবস্থা কিঞ্চিৎ অভিনব। এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা না থাকার জন্য ভক্তিপ্রসাদের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যগুলি নানা সংশয়ের সৃষ্টি করে।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক তাঁর শব্দকোষের ভূমিকায় বলেছেন, 'অভিধানে উল্লেখিত শব্দের উৎস হচ্ছে অপরাধ-জগতের বাসিন্দারা'। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে অপরাধ-জগতের সংজ্ঞার্থ কী? সংকলক কোনো সংজ্ঞার্থ না দেওয়ায় কিছু সংশয়ের সৃষ্টি হয়। যেমন 'অপরাধ জগতের শব্দকোষ'-এ হিজড়াদের শব্দাবলি কেন? আভিধানিক কি মনে করেন সম্প্রদায় হিশেবে হিজড়ারা অপরাধ-জগতের অধিবাসী কিংবা সমাজবিরোধী? তিনি শব্দসংগ্রহের যে-পেশাভিত্তিক তালিকা দিয়েছেন তার মধ্যে কি হিজড়াদের আনো অন্তর্ভুক্ত করা যায়? অথচ তিনি 'অপরাধ-জগতের ভাষা'য় (ঐ পৃ ২২) স্পষ্টই বলেছেন, 'ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার জন্য অপরাধ এবং সমাজবিরোধী কার্যকলাপকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে' এবং এই শ্রেণীবিভাগে ১৮ নম্বর গোষ্ঠি হ'লো হিজড়া। অথচ হিজড়াদের পেশা বিষয়ে তিনি ঐ বইয়ের ৩০ পৃষ্ঠায় বলেছেন

'বিবাহাদি এবং হিন্দু-মুসলমানের নানান উৎসবে এরা নাচগান করে অর্থোপার্জন করে। তবে বাঙালি সমাজে এ সব রীতি অচল। কলকাতা, হাওড়া, আসানসোল প্রভৃতি শহরে অবাঙালি শ্রমিকদের হোলি উৎসবে হিজড়ারা নাচগান করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে এদের দর্শন মেলে।'

বলা বাহুল্য এসব বৃত্তির কোনোটিই সমাজবিরোধী বা অপরাধমূলক নয়। তবে লেখক কিছু পরে বলেছেন, 'এরা বিকৃত যৌন-সম্ভোগের ভাগীদার। বিকৃত যৌন-রুচি সম্পন্ন মানুষের কেউ কেউ হিজড়া সঙ্গ কামনা করে' (ঐ পৃ ৩১)। বিকৃত যৌন সম্ভোগের বেসাতিই যদি সম্প্রদায় হিশেবে হিজড়াদের উপজীবিকা

হয়, তাহ'লে অবশ্য অন্য কথা। কিন্তু লেখক তা বলেন নি। বরং অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'যৌন বিকৃতি এদের জীবনে এনে দিয়েছে "যৌনচেতনার" অভাব' (পৃ ৭৭)। সেজন্য চোর-ডাকাত, জালিয়াৎ-পকেটমারদের সঙ্গে এদের একই শ্রেণীভুক্ত করায় অনেকে আপত্তি করতে পারেন।

আরেকটি কথা। জাতি হিসেবে হিজড়ারা বাঙালি কিনা এ বিষয়ে লেখক অনুসন্ধানে যা জেনেছেন তা হ'লো, 'হিজড়াদের মধ্যে যতদূর শোনা গেছে কোন বাঙালি নেই। অথবা অতি অল্প বয়সে যারা বঙ্গ সমাজ ত্যাগ করে এদের দলে ভিড়ে গেছে তাদের বাঙালিত্ব মুছে গেছে-অথবা বাঙালি বলে নিজের পরিচয় দিতে লজ্জা পায়' [অপরাধ-জগতের ভাষা, পৃ ৩১]।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে বাঙলা ভাষায় সংকলিত 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'-এ এদের শব্দাবলি কেন, যদি অপরাধ-জগৎ এবং বাঙলা ভাষা কোনোটারই সঙ্গে এদের যোগ না থাকে? একটা সমর্থন পাওয়া যেতো যদি অপরাধ-জগতের বাসিন্দারা এদের ব্যবহৃত বহু শব্দ গ্রহণ করতো। কিন্তু সেরকম কোনো প্রভাবের কথা ভক্তিপ্রসাদ বলেন নি। সেজন্য সন্দেহ হয় নেহাৎই অভিনবত্বের জন্য হিজড়া গোষ্ঠির শব্দাবলি আলোচ্য গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের শব্দনির্বাচন পদ্ধতি এবং শব্দের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে কয়েকটি কথা বলতে চাই। ধরা যাক তিনি শব্দাবলির যে তিনটি শ্রেণী নির্দেশ করেছেন তার তিন নম্বরটি। ৩ চিহ্নিত শব্দ হ'লো 'অপরাধ-জগৎ ও অন্যত্র যাদের প্রচলন রয়েছে'। অন্যত্র কথাটি অস্পষ্ট—অন্যত্র মানে কোথায়? অপরাধ জগতের বাইরে অশিক্ষিত সমাজের কথ্যভাষায়? নাকি শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে কথ্যভাষায়? তা যদি হয় তাহ'লে অপরাধ-জগতের শব্দকোষে সেগুলি স্থান পায় কী যুক্তিতে? বহু শব্দ আছে যার কোনো শ্রেণীবিভাগেই নেই, যেমন,

	৫ টিপে জাওয়া	১০ পাতোলাবাজ
১ ছত্রিস্	৬ ঠান্‌ডা-পানি	১১ মনোস্
২ খুনো	৭ তুলোন্‌লাজ	১২ সোনে
৩ টিপ্‌কিবাজ	৮ পাতিদার	১৩ সোনার্ হোরিন্
৪ টিপ্‌নি	৯ পাতিলি	

অনুরূপভাবে প্রশ্ন ওঠে কী ভিত্তিতে তিনি অভিধানের শব্দাবলি গ্রহণ

করেছেন ? —অপরাধীদের মুখে যেসব শব্দই তিনি শুনেছেন, সেগুলোকেই তিনি হয় ক্যাণ্ট না হয় স্ল্যাঙ ব'লে ধ'রে নিয়েছেন ? কেমন কী ভিত্তিতে তিনি ধ'রে নিলেন নৌকা অর্থে 'ডোঙা'[১] শব্দটি 'পেশাদার অপরাধীদের গোপন উক্তি' ? রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা', জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ইত্যাদি অভিধানে শব্দটি পাওয়া যাবে। তেমনি মেথর অর্থে 'হাঁড়ি' শুধু কয়েদিদের শব্দ ? সাধারণ জ্ঞানের থেকে আমার প্রশ্ন, কোনো শব্দ যদি পঁয়ত্রিশ বছর আগে প্রকাশিত কোনো আদর্শ সাধারণ অভিধানে স্থান পায়, তবে তাকে কি বিশেষভাবে অপরাধজগতের শব্দ ব'লে চিহ্নিত করা ঠিক হবে ? অপরাধ জগতের শব্দাবলি তখনই দীর্ঘায়ু হ'তে পারে যখন ভদ্র নাগরিক সমাজের কথায় তার প্রবেশাধিকার থাকে না। আশ্চর্যের কথা এই যে 'অপরাধ জগতের শব্দকোষ'-এর অন্তর্ভুক্ত তিনটি শ্রেণীর শব্দ থেকেই অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেগুলি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস-এর 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' (২য় সংস্করণ, ১৯৩৭ খ্রী)-এ স্থান পেয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকগুলি আবার শুধু কথ্যভাষাতে নয়, লিখিত ভাষাতেও পাওয়া যায়। শব্দগুলির অর্থ বা ধ্বনি পরিবর্তন খুব সামান্যই ঘটেছে। এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিচে দেওয়া হ'লো

অপরাধ জগতের শব্দকোষ	বাঙ্গালা ভাষার অভিধান
১ **অগ্‌গল**[২] বিণ. সুমুখের।	**অগল** [আগল (দ্রঃ)। প্রা' বাং] বিণ. অগ্রসর
২ **আড়ি**[১] ক্রি. ১। বাধা সৃষ্টি করা। দ্র. আড়-বাধা ; আড়াল। হিন্দীভাষীদের প্রভাবে বর্তমানে বাঙালিরা বলে থাকে, যেমন, আড় দিয়ে চাড় মার্... ২। চোখে চোখে ইশারা।	**আড়ি**১ [অন্তরাল>আড়াল>; আ-অড্‌ (গমন করা)+ই (জ্ঞা°) ভাব বা সম্ভাবে যাওয়া ; মনের অন্তরালে যাওয়া] বি. আড় ; আড়াল।
	আড়ি৮ বিণ. বক্রদৃষ্টি ; উঁকি
৩ **আল্‌গা**[৯] বি. অপরিচিত ; নবাগত ; বহিরাগত ; বিদেশী।	**আলগা, আল্‌গা** [অলগ> । হিং অল্‌গা—পৃথক্‌ ; চিলা]...৭ [আলগ দ্রঃ] বাহিরের ; উট্‌কো

৪ **আলুবাজি**[১] বি. বাং.+ফা. মেয়ে পটানো।

৫ **ডোঙা**[৮] বি. নৌকা। <বা. ভিত্তি ; ভো ডোঙি।[জলচোর]

৬ **দণ্ড্‌গোল্**[১] বি. ১। সাক্‌রেদ। ২। ভিড়।

৭ **ধান্দা**[২] বি. চুরির সন্ধান।

৮ **ধান্ধা**[২] বি. দ্র. ধান্দা।

৯ **পেঁদি**[২] বি. পাছা।

১০ **বত্‌লা দেআ**[১] (দেয়া) ক্রি. প্রতিশোধ নেওয়া।

১১ **বদ্‌লা নেআ**[১] ক্রি. ১। প্রতিশোধ নেওয়া॥...

১২ **মট্‌কা**[১] বি. মাথা। মট্‌কা-মারা—ঘুমের ভান।

১৩ **রেলা**[১] বি.... ২। ভীড় ; জমায়েৎ।...

১৪ **রোস্‌নাই**[২] বি. ফা. ১। আলো॥...

১৫ **হাঁড়ি** বি. ১। মেথর ; পায়খানা পরিষ্কারকারী। [কয়েদী]

আলু[১] ২ [আলুর মত গোল বলিয়া] গুণ্ডকোষ। **আ' দোষ** লাম্পট্য চরিত্রদোষ

ডোঙা. ডোঙা [মুণ্ডারী শব্দ। তুল. সং দ্রোণী] বি. ক্ষুদ্র তরী তাল-বৃক্ষের গুঁড়ি দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষুদ্র নৌকা ; শালতি

দঙ্গল [হিং দঙ্গল্। দং ১ দ্রঃ] বি.... ২ জমায়েত ; ভিড় ; লোকারণ্য। ৩ অনুচরদল

ধান্দা[২] ধান্ধা...২ উপায় ; ফিকির

পেঁদ[সং পিণ্ড>হিং পেড়ু, পেঁড়ু, পেন্দা (সর্ব্ব নিম্নদেশ, তলদেশ)> পেঁদ। অশ্লীল। এর উচ্চারণে পাঁদ] বি. যোনি ; পায়ু।

বদলা [আ' বদ্‌লা] বি. প্রতিশোধ। ব' লওয়া শোধ তোলা ; প্রতিশোধ গ্রহণ করা।

মটকা[১] [সং মস্তক>হিং মস্তক> মটক। বি. শীর্ষ, চূড়...২ মস্তক। ম'ও মারা[২] ক্রি. ভাণ করা কপট নিদ্রার ছল করা।

রেলা...৩ জনতা ; ভিড় ; জমায়েৎ।

রোশনাই. রোশনি [ফা.] বি. আলোক আলোক উৎসব।

হাড়ি. হাড়ী [সং হড্ডিক>] বি....২ জাতি বিঃ। বঙ্গে এই জাতির এক শাখা আবর্জ্জনা মেথরের কর্ম্ম করিত।

কোটনি অর্থে অবশ্য নয়, তবে বেশ্যাবাড়ির অধিকারিণী হিশেবে 'বাড়িওয়ালি' কথাটিও বিশেষ পরিচিত। এছাড়া ধূর্ত অর্থে 'বুড়ো সালিক[২]', ধনী ব্যক্তি অর্থে 'সোনার-হোরিন্' অপরাধজগতের বাইরে বহু ব্যবহৃত—তার জন্য এমন কি মধুসূদন-প্রভাতকুমারও পড়বার দরকার হয় না। চশমাধারী অর্থে 'চারচোকো[৩]' ফিশফিশ ক'রে বলা অর্থে 'চেপে বলা', চাটুকার অর্থে 'দালাল[৩]' শিক্ষিত ব্যক্তিদের মার্জিত ভাষায় প্রায়ই ব্যবহৃত। আর 'ছিনতাই[৩]' তো খবরের কাগজের কৃপায় রীতিমতো সম্ভ্রান্ত। এখন আবার 'বিমান ছিনতাই'-এর কথাও প'ড়ে থাকি।

ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের শব্দকোষ যদি এরিক পারট্রিজের অপরাধ-জগতের অভিধানের মতো ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে সংকলিত হ'তো, তাহলে হয়তো এই সব শব্দের অন্তর্ভুক্তির একটি যৌক্তিকতা খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু ভক্তিপ্রসাদ গত এক দশকের মধ্যে প্রচলিত বুলিকে গ্রহণ করেছেন এবং আগেই বলা হয়েছে তাঁর শব্দ-সংগ্রহের উৎস মুখের ভাষা। পারট্রিজ তাঁর অভিধানে গৃহীত শব্দাবলির মধ্যে কোন্‌টি আর এখন স্ল্যাঙ বা ক্যাণ্ট নেই, তারও নির্দেশ দিয়েছেন। দু-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে :

asker, 'a professional beggar', is neither C.[ant] nor even S.[lang] : it is S.[tandard] E.[nglish]

right!, all — In ordinary English, this phrase came into gen. use in the 1830's ; but originally it was C., which it seems to have been ca. 1805-30.

আসলে শুধু শব্দনির্বাচন নয়, সামগ্রিকভাবে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের অভিধান-সংকলনের পদ্ধতি কী সে সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে। যেমন তাঁর স্বতন্ত্র শব্দ নির্দেশের (হেড-ওয়ার্ডস) নীতি কী, বানানের রীতিই বা কী, অর্থনির্দেশের পদ্ধতি কীরকম, সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা না থাকায় পাঠকের অসুবিধা হয়। সমস্যাগুলি একটু বিস্তারিতভাবে তোলা যেতে পারে।

সমার্থক, প্রায়-সমোচ্চারিত এবং একই শ্রেণীভুক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যদি অভিধানে স্বতন্ত্রভাবে নির্দেশিত হয়, তাহ'লে অকারণে অভিধানের কলেবর বেড়ে যায়। যেমন 'চলন্তিকা'য় পাখি, পাখী ; পাটনি/পাটুনী ; পাঠন,-না ; এই ভাবে দেখানো হয়েছে। ভক্তিপ্রসাদ ধ্বনি-অনুসারী বা ধ্বনিনীয় (ফোনীমিক) বানানের আগ্রহে কোনো শব্দের উচ্চারণে সামান্য একটু পার্থক্য থাকলেই স্বতন্ত্রভাবে

নির্দেশের পক্ষপাতী—যেমন 'গরম্' আর 'গরোম্' ; 'তুলোম্বাজ্' আর 'তোলম্' ; তোলম্বাজ' ' 'ফন্‌ডাকার্' আর 'ফান্‌ডাকার্' ; 'ফেউ' আর 'ফেও' ; 'চড্ডা' ' আর 'চোড্ডা' ইত্যাদি বহু শব্দই আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। অথচ 'খোচর্', খোচের্', 'খোঁচর্' একসঙ্গে নির্দেশিত। আবার 'ডবোল-ডেকার্' ' শব্দটি দুবার (একবার বাঙলা, আরেকবার রোমান হরফে) দু-জায়গায় আছে। এর ফলে আপাতভাবে অভিধানের শব্দ-সংখ্যা বেড়ে যায়, কিন্তু পাঠকের বিশেষ সুবিধা হয় না।

সাধারণ পাঠকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে 'গরম্' আর 'গরোম্' জাতীয় শব্দ কেন আলাদা ? এই প্রসঙ্গে আভিধানিকের অনুসৃত বানানরীতি বিষয়ে কিছু বলা দরকার। তিনি 'ওষুধ্' শব্দটি নির্দেশ ক'রে বন্ধনীর মধ্যে 'ওষুধ' শব্দটি লিখে দেন সম্ভবত সাধারণ পাঠকের কথা ভেবে। তেমনি 'ওভিসার্' আ এনা'র বন্ধনীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি 'অভিসার আয়না'। এরকম কিছু কিছু শব্দের প্রচলিত উচ্চারণ বা বানান বন্ধনীর ভেতর নির্দেশিত, আবার বহু শব্দের নেই, যেমন 'মাথা নএ্‌লা,' 'আনোন্‌দোনাজার' ইত্যাদি। 'নয়লা' যখন 'নএ্‌লা' হয়, তখন সাধারণ পাঠকের নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা হয় ? আসলে তাঁর অনিয়মীয় পদ্ধতি বিষয়ে কোনো আলোচনা না থাকায় অনেকের মনে ধাঁধা লাগে। ভক্তিপ্রসাদ তাঁর 'অপরাধ-জগতের ভাষা'য় 'ধ্বনিতত্ত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে অপভাষায় প্রাপ্ত ১৫১ প্রকার যুক্ত ব্যঞ্জন এবং ব্যঞ্জনধ্বনির সমাহারের কথা বলেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর অনুসৃত বানানপদ্ধতি সম্পর্কে বিশ্লেষণ থাকলে পাঠকের উপকার হ'তো। কেননা তাঁর নিজের 'অ' এবং 'ও' বিষয়ে সঙ্গতির অভাব লক্ষ করা যায়, যেমন, 'পঙ্‌গত্', 'সন্‌ভু', 'আতপ্' কিন্তু 'দর্‌গোন্'। এছাড়া আভিধানিকের নিজের বানানেও সারূপ্যের অভাব বিশেষভাবে চোখে পড়ে। যেমন 'পাঞ্জাবী' কিন্তু 'বাঙালি' ; 'বাড়ি' অথচ 'শাড়ী', 'গাড়ী'; 'মেয়াদী', 'জুয়াড়ী', 'কয়েদী' কিন্তু 'চৈতরি', 'চাকরি'।

অর্থনির্দেশের বেলাতেও এ জাতীয় সমস্যা দেখা যায়। আসলে আগেই স্পষ্ট হওয়া দরকার যে 'বিশেষ অভিধান' কি শুধু বিশেষজ্ঞদের জন্য নাকি এর পাঠক সাকর থেকে বিদ্বান সবাই হ'তে পারেন ? আমার ধারণা, এ ক্ষেত্রে সাধারণ অভিধানের যা নীতি বিশেষ অভিধানেরও তা-ই হওয়া উচিত। অভিধানের অন্তর্ভুক্ত শব্দগুলির বর্ণনা বা সংজ্ঞার্থ সহজ এবং আদর্শ ভাষাতে না দিলে অভিধানের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'-এর সংকলক

অনেক সময়ে ভুলে গেছেন যে এই অভিধানের সম্ভাব্য পাঠকেরা কেউ অপরাধ-জগতের অধিবাসী নন। তাঁর কয়েকটি শব্দের অর্থনির্দেশ লক্ষ করা যাক :

জনা[২] বি. গরম এলাকা।
নোতুন বেলা[৩] বি. উলটি ভাষা।
বাঁস্[৩] বি....[২] । যে বাঁশ দেয়।

সাধারণ পাঠকের কাছে পূর্বোক্ত শব্দগুলির কোনো অর্থনির্দেশই স্পষ্ট হবে না। কেননা প্রথম দুটি শব্দে গরম এলাকা, উলটি ভাষা ব্যবহার ক'রে মানে বলা হয় নি, প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে। তা-ও 'গরম এলাকা' ব'লে কোনো শব্দ নির্দেশিত নেই, 'এলাকা গরম্' আছে। তেমনি 'পিরামিড'[২]-এর মানে যখন বলা হয় 'বিয়ার জাহাজ', তখন বোঝা শক্ত অর্থনির্দেশে এই আলঙ্কারিক বর্ণনার সার্থকতা কোথায়। দু-এক জায়গায় আবার ইংরেজিতে মানে দেওয়া আছে, যেমন

চিপ্‌লি[১] toilet *cloth* (?)

এই প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক শব্দের পরিচয় পাচ্ছি, 'আস্‌তো[২]' যার চার নম্বর অর্থ হচ্ছে 'সি. আই. এ.-র দালাল'। 'আস্‌তো' শব্দটির বহু মানে থাকায় ভুরিপ্রয়োগ থেকে বোঝা সম্ভব নয়, ঐ অর্থে আভিধানিক শব্দটির ব্যবহার কতোবার পেয়েছেন। অপরাধ জগতে নিরক্ষরদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠ—সেখানে কী প্রসঙ্গে এই অর্থের অনুপ্রবেশ ঘটলো তা জানতে কৌতূহল হয়। আশা করি পরে আভিধানিক এই শব্দের উৎস বিষয়ে আলোকপাত করবেন।

আমি সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'শব্দকোষ' বিষয়ে আলোচনা করলাম। কেননা তিনি যে-বিষয়ে পথ দেখালেন আশা করি অদূর ভবিষ্যতে আরো অনেকেই এ সম্পর্কে উৎসাহী হবেন। আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে তো বটেই, সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাতাত্ত্বিক, লেখক-সাংবাদিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর পাঠকের কাছে বইটি বিশেষ মূল্যবান। শোনা যায় এরিক পার্‌ট্রিজ-এর 'এ ডিকশনরি অফ দি আণ্ডারওয়র্ল্ড, ব্রিটিশ অ্যাণ্ড আমেরিকান' (১৯৫০) অভিধানটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এতোই জনপ্রিয় হয় যে বোস্টন পাবলিক লাইব্রেরীর এরাগারিক বইটি সব সময়ে সিন্দুকে তালাচাবি বন্ধ ক'রে রাখতেন চুরি হ'য়ে যাবার আশঙ্কায়। ভক্তিপ্রসাদের শব্দকোষের এরকম গতি হ'লে আশ্চর্য হবো না।

১। **অপরাধ জগতের শব্দকোষ : পশ্চিম বাঙলা**, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, আশ্বিন ১৩৭৮, দাম পাঁচ টাকা।
অপরাধ জগতের ভাষা, ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, আশ্বিন ১৩৭৮, দাম পাঁচ টাকা।

২। এই শব্দগুলি 'অপরাধ-জগতের ভাষা'য় উল্লিখিত হ'লেও 'শব্দকোষ'-এ স্থান পায় নি। অন্যদিকে 'চোক্'কে ওপরের দৃষ্টান্তে পুলিশের প্রতিশব্দ বলা হয়েছে, অথচ 'অপরাধ-জগতের শব্দকোষ'-এ অর্থনির্দেশ করা হয়েছে 'পুলিশের হাতের টর্চলাইট' ব'লে।

৩। ভক্তিপ্রসাদ মল্লিকের 'অপরাধ-জগতের ভাষা'র ৩৮ পৃষ্ঠায় বলা আছে, 'ভারতবর্ষের অপরাধ-জগতের ভাষার রীতিনীতি তো দূরের কথা, সামান্য শব্দতালিকাও আমাদের হাতে নেই।' অনুরূপ মন্তব্য তিনি আরো দু-এক জায়গায় করেছেন। কিন্তু এ ব্যাপারে স্লীম্যান-এর 'রামসিয়ানা'র ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপেক্ষা করা অসম্ভব। ভক্তিপ্রসাদ কোথাও 'রামসিয়ানা'র উল্লেখ না করলেও 'শব্দকোষ'-এর ভূমিকায় এক জায়গায় লিখেছেন, 'ঠগীদের ব্যবহৃত বুলি অপ্রচলিত, তাদের ব্যবহারের কিছু কিছু শব্দ, যেমন, 'ঠোলা', 'ধুর', 'সিট্', 'গনা' প্রভৃতি প্রাচীন অর্থসহ আজও পাতালপুরী ও অন্যত্র বিচরণ করছে'। এর মধ্যে 'গনা' শব্দটি ভক্তিপ্রসাদের অভিধানে স্থান পায় নি। তবে 'ধুর' (স্লীম্যান-এর বইতে আছে 'ধুরে'), 'সিট' ইত্যাদি শব্দের মানের বদল ঘটেছে, যেমন

RAMASEEANA

DHURAE The share of the booty assigned to the leaders before the general division. It is generally the tenth article if there are ten or more of the same kind; or one anna in the rupee upon the value, if there are not...

অপরাধ-জগতের শব্দকোষ

ধুর্[১] বি. ১। লোক; প্রভাবিত ব্যক্তি॥ পাটনা জেলায় 'ধুর্' অর্থে বলদ বোঝায়। ২ মুরশোর পুলিশ॥ তু. ধূর্ত। ৩ নয়া বা শিক্কানবিস পকেটমার।

SYT Term used by the Berar Thugs, for *phool* or parole of rendezvous. Other Thugs of the south call it *maulee*.

সিট্ ২ বি. নেয়ে। এ শব্দটি ভারতবর্ষের অপরাধ-জগতে একটি পুরাতন বুলি।

থানা বা পুলিশ অর্থে 'ঠোলা' অবশ্য সেযুগেও ছিলো, এখনও আছে।

তিব্বত-বাণিজ্যনীতির পরিপ্রেক্ষিতে কোচবিহার ও ভুটান

অরবিন্দ দেব

ইংরেজ ব্যবসায়ী-পরিব্রাজক রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৩ খৃষ্টাব্দে কোচবিহার রাজ্যে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর বিবরণে পর্ব্বত-রাজ্য ভুটানের গিরিবর্ত্মের ভিতর দিয়ে তিব্বত এবং সুদূর চীন ও তাতার দেশের সঙ্গে কোচবিহারের বাণিজ্য-সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। যে বাণিজ্যসম্ভার পার্ব্বত্য পথে কোচবিহারে আনীত হত তার মধ্যে রেশমজাত দ্রব্য, মৃগনাভি, কম্বল, নানাবর্ণের মূল্যবান পাথর, চামর, জাফরান ও এলাচ জাতীয় মসলা অন্যতম। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে ইঁকেন সেসেল্লা কোচবিহারের বাণিজ্য—সমৃদ্ধির এক মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন। তা ছাড়া কোচবিহার রাজ্যের সরকারী ঐতিহাসিক হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক ডাচ্ লেখক ওয়েসেলকে লিখিত পত্রে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তোরসা নদীর বাণিজ্যিক উপযোগিতার বর্ণনা আছে।

অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নেপালের রাজা পৃথ্বিনারায়ণের নেতৃত্বে গুর্খা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। নেপালের মধ্য দিয়ে তিব্বত-বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সিকিম, ভুটান ও আসামের পথে তিব্বত দেশে বাণিজ্যিক অনুপ্রবেশের নতুন প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। দেওয়ানী হস্তান্তরের যুগে (১৭৬৫খৃঃ) ভুটান রাজ্য শুধু যে ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ সমভূমি গ্রাস করে কোচবিহারে প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হয়েছিল তা-ই নয়, এই সময়ে ভুটান দেশের বাণিজ্য রংপুর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচরাজশক্তি তখন জীবনীশক্তি হারিয়েছে। উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীদের ষড়যন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যের শাসনব্যবস্থা তখন বিপর্যস্ত। নাজীরদেও দেওয়ানদেও দলীয় কলহে লিপ্ত। ভুটান প্রকাশ্য আক্রমণে কোচবিহার জয় করতে অগ্রসর হল। ভুটান-রাজ দেশী সিদরিঙ (বগল বর্ণিত দেবধুপুর) মহারাজা বৈর্যেন্দ্রনারায়ণকে বন্দী থেকে বন্দী করে পার্ব্বত্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত করলেন (১৭৭০ খৃঃ)। তাঁর প্রতিনিধি পেনতু টোমা কুমার রাজেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করে প্রত্যক্ষভাবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগলেন। ১৭৭২

খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রনারায়ণের মৃত্যুর পর নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণ ভূটীয়াশাসনের বিরোধিতা করে ধরেন্দ্রনারায়ণকে সিংহাসনে স্থাপন করলেন। দেবী সিদরিঙ কালবিলম্ব না করে কোচবিহার আক্রমণ করলেন। বৈকুণ্ঠপুরের রাইকত দর্পদেব সসৈন্যে ভূটিয়া পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। কোচবিহারে সামরিক অভিযান পরিকল্পনা নিঃসন্দেহে ভূটানরাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে রচিত হয়েছিল। এই পরিকল্পনার গুরুত্ব অনুধাবনীয়—(১) ডুয়ার্সের সমভূমিতে ভূটানী কর্তৃত্ব নিরাপদ করা, (২) কোচবিহার রাজ্যে পূর্ণ ভূটানী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা এবং (৩) ভূটান-রংপুর বাণিজ্য নিরাপদ ও সম্প্রসারিত করা।

অনুর্বর পার্বত্যরাজ্যের প্রয়োজনের দিক থেকে কোচবিহার অভিযান সিদরিঙ কর্তৃক গৃহীত নীতির বাস্তবধর্মিতাই প্রকাশ করে। আবার ভূটানের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার সমসাময়িক বঙ্গদেশের দ্রুত পটপরিবর্তন সম্পর্কে ভূটানী শাসকের অজ্ঞতার পরিচয় দেয়। পলাশীর যুদ্ধ-প্রসূত পরিবর্তনের ঢেউ হিমালয়ের পাদদেশে পৌঁছতে বিলম্ব হয়েছিল। সম্ভবতঃ সিদরিঙ দেওয়ানী হস্তান্তরের সংবাদও শোনেন নাই। রংপুরের রাজস্ব ও শাসনব্যবস্থা ইংরেজশক্তির করায়ত্ত হয়েছে। কোচবিহারে ভূটানী কর্তৃত্ব রংপুরের নিরাপত্তা সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে চিন্তিত করল। নাজীর খগেন্দ্রনারায়ণের আহ্বানে ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-কোচবিহার চুক্তি সম্পাদিত হল। এই চুক্তি ভূটানী পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে কোচবিহারে ইংরেজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। ক্যাপ্টেন জোন্স সসৈন্যে কোচবিহার আক্রমণ করে রাজধানী অধিকার করলেন। প্রথম ভূটানযুদ্ধে (১৭৭২-৭৪ খৃঃ) সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের সহায়তায় ভূটানী বাহিনী দুয়ার অঞ্চলে প্রতিরোধ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত রেখেছিল। এই বিরোধিতা শান্তিচুক্তি সম্পাদনে বৎসরাধিককাল বিলম্ব ঘটায়। তৃতীয় পঞ্চেনলামা পলডেন ইয়েশীর প্রস্তাবেই ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ-ভূটান শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ভূটানী ও সন্ন্যাসীদের যুগ্ম প্রতিরোধ বিনষ্ট না হওয়া পর্যন্ত শান্তি চুক্তি সম্পাদন অসম্ভব ছিল। এই বিষয়টি আজও যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি। অথচ সমসাময়িক 'গোপন' দলিল পত্রে এই প্রতিরোধ-কাহিনীর বিশদ তথ্য সন্নিবেশিত আছে।

তৃতীয় পাঞ্চেনলামার আত্মজীবনী থেকে লুকিয়ানো পেটেক যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তাতে দেখা যায় নেপালী পতিনিধি ব্রহ্মচারী ভগিরথী ও জয়সমাম থাপা এই চতুর লামা-রাজনীতিবিদ্‌কে ইংরেজ-ভূটান যুদ্ধে শান্তি স্থাপনে অগ্রণী

হতে উৎসাহিত করেছিলেন। তা ছাড়া তৎকালীন লামা সরকারের ক্ষমতা সংকুচিত করবার বাসনাও তৃতীয় পাঞ্চেনলামাকে উত্তরমান ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে প্রেরণা দিয়েছিল। তৃতীয় পাঞ্চেনলামার পত্র ও শান্তিপ্রস্তাব তিব্বত-বাণিজ্যের অপরিসীম সম্ভাবনা সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসকে প্রবুদ্ধ করে উত্তরহিমালয় বাণিজ্যে ইংরেজ- উদ্‌যোগ-পর্বের সূচনা করল। ইংরেজ লেখকদের মতে শান্তিপূর্ণ আলোচনা ও কূটনীতি দ্বারা তিব্বত-বাণিজ্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনের প্রথম চেষ্টা হয়েছে। এই ধারণা প্রশ্নাতীত নয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রথম ভুটান যুদ্ধের সামরিক কীর্তিকলাপই পার্বত্যদেশে বণিকের 'মানদণ্ড' দেখা দেওয়ার প্রথম পদক্ষেপ।

প্রথম ভুটান যুদ্ধের সফলতা অনস্বীকার্য। এই যুদ্ধের ফলে কোচবিহারে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপিত হল। দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধিন্ত পরাজিত হয়ে তিব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। তাঁর বিস্তারনীতি ব্যর্থ হওয়ায় সমতলভূমিতে ভুটানী আক্রমণ প্রশমিত হল। স্বভাবতই ওয়ারেন হেষ্টিংসের পক্ষে ভুটানের প্রতি সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করা সহজ হল। ভুটানী পরিকল্পনার বিকল্প হেষ্টিংসের তিব্বত-বাণিজ্য পরিকল্পনা এক নতুন দিগন্তের আভাস দিল। ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তর বাংলার রপ্তানী বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে নতুন পথে তিব্বত পশ্চিম চীনে বাণিজ্য বিস্তারের উদ্‌যোগ ওয়ারেন হেষ্টিংসের বিচক্ষণতার পরিচায়ক।

শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবার অব্যবহিত পরেই (১৭৭৪ খৃঃ) প্রথম ইংরেজ বাণিজ্যদূত জর্জ বগল কোচবিহার ও ভুটানের পথে তিব্বত যাত্রা করলেন। তৃতীয় পাঞ্চেনলামার সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে ও পরে বগল অর্ধ বৎসরকাল ভুটানে অতিবাহিত করেছিলেন। পরবর্তীকালের ইংরেজ দূত টার্নার, পেম্বারটন ও ইডেনের তুলনায় বগলের প্রচেষ্টা অধিকতর সফলতা লাভ করেছিল। তাসি-চ-জঙ্গ (বগল-বর্ণিত তাসিসুডন) থেকে (১১ই অক্টোবর, ১৭৭৪) লিখিত পত্রে বগল ভুটান রংপুর বাণিজ্যের যে বিবরণ দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, এই বাণিজ্য পরিচালনা করতেন দেবরাজা ও তাঁর মন্ত্রীবর্গ এবং প্রাদেশিক শাসকগণ। বস্তুতঃ হিমালয়ের পর্বতরাজ্যে রাজকর্মচারীদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা এক উল্লেখযোগ্য বিষয়। এই পত্রে রংপুর থেকে সংগৃহীত মিহি পশমবস্ত্র, মসলা, নীল ইত্যাদির অধিকাংশ তিব্বতে রপ্তানী হত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পশ্চিম ভুটানের শাসনকর্তা পারপেনলপ্ দিনাজপুরে ব্যবসায় সম্প্রসারণের

অনুমতি চেয়ে বগলের কাছে আবেদন করেছিলেন। ভুটানে অবস্থানকালে বগলকে লিখিত ওয়ারেন হেস্টিংসের পত্রগুলি তাঁর তিব্বত বাণিজ্য পরিকল্পনা ও এই বাণিজ্যে ভুটানের ভূমিকার বিবরণ দেয়। বাণিজ্যদূতকে হেস্টিংস ভুটানী রাজকর্মচারী ও দেবরাজার সঙ্গে আলোচনায় সাবধানতা অবলম্বন করতে বলেছেন। দেবরাজা ও রাজকর্মচারীগণ যাতে সন্দেহপরায়ণ না হন সেজন্য তাঁদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ অবাধে পরিচালনা করা যাবে এই প্রতিশ্রুতি দিতে আদেশ দিয়েছেন। ভুটানের সমৃদ্ধির এক সম্ভাবনাময় রূপরেখা বগল অঙ্কন করেছিলেন। তিব্বতের চালানী বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র যবে ভুটানের পারো নগরী। স্বভাবতঃই পশ্চিম ভুটানের পারপেনলপ ও প্রভাবশালী রাজকর্মচারীবৃন্দ আপ্লাবিত হয়েছিলেন। সমতলভূমির সঙ্গে বাণিজ্য এঁরাই প্রধানতঃ নিয়ন্ত্রণ করতেন।

সরকারী গ্রন্থকার এচিসন্ বগলের সাফল্য সম্পর্কে যে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ক্লড্ হয়াইট তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। বঙ্গদেশের সঙ্গে ভুটানী বাণিজ্যের ক্ষেত্র বগল নিঃসন্দেহে প্রসারিত করেছিলেন। এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যে বিধি-ব্যবস্থার প্রস্তাব তিনি দিয়েছিলেন ভুটানের দেবরাজা দরজি সিন্‌গি তা গ্রহণ করেন। ভুটানের আমদানী দ্রব্যের লাভজনক ব্যবসায় রাজকর্মচারীরা পরিচালনা করতেন। এই দ্রব্যগুলির মধ্যে চন্দন কাঠ, রঙীন চামড়া, নীল, তামাক, সুপারী ও পানের ব্যবসায় প্রধান। ভুটানী ব্যবসায়ীদের করমুক্ত বাণিজ্যের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। হিন্দু ও মুসলমান ব্যবসায়ী ভুটানের মধ্য দিয়ে নিরাপদে তিব্বতে যাতায়াত করতে পারবেন। অনুরূপ ভুটানী ব্যবসায়ীরা নিরাপদে রংপুর ও বঙ্গদেশের অন্যত্র যেতে পারবেন। ব্যবসায়ীদের উৎসাহ দান ও তাদের নিরাপত্তা এই দুই উদ্দেশ্যই বগল সম্পাদিত চুক্তির দ্বারা পূর্ণ হয়েছিল।

ভুটানরাজ্যের সঙ্গে এই বাণিজ্যচুক্তির অস্তিত্ব পরবর্তীকালে বিভিন্ন সূত্রে প্রমাণিত হয়েছে। স্যামুয়েল টার্নার এর প্রশংসা করেছেন। তৃতীয় পাঞ্চেনলামার আকস্মিক মৃত্যু ও ওয়ারেন হেস্টিংসের অবসর গ্রহণের পর চীন-নেপাল যুদ্ধ (১৭৯২ খৃঃ) তিব্বত-বাণিজ্যের বৃহত্তর পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দেয়। এই ঘটনাবলীর ভুটানে বগল-মিশনের সঠিক মূল্যায়ন ব্যাহত করেছে।

প্রথম ভুটান যুদ্ধ বঙ্গদেশের উত্তর সীমান্ত নিরাপদ করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস একই সময়ে ভুটানের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে কৃতকার্য হয়েছিলেন। ভারতীয় রাষ্ট্রবেষ্টনীর মধ্যে ভুটানের অবস্থান নিশ্চিত করবার এটাই প্রথম ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। কল্পনাচাতুর্যে ওয়ারেন হেস্টিংসের উত্তরপূর্ব

সীমান্ত নীতি এক অনবদ্য মর্যাদার অধিকারী। ফরেস্ট তাঁর 'নির্বাচিত' দলিল সঞ্চয়নে মন্তব্য করেছেন যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের ভারত ত্যাগের পর (১৭৮৫ খৃঃ) তাঁর উত্তর হিমালয় বাণিজ্যনীতি পরিত্যক্ত, তাঁর কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ইতিহাস বিস্মৃত এবং তিব্বত ও ভুটান মিশনগুলির মূল্যবান দলিলপত্র বিনষ্ট হয়েছে।

'কোচবিহারের ইতিহাস' লেখক খান চৌধুরী আমানত উল্লা আহমেদ ইংরেজ-ভুটান চুক্তির (১৭৭৪ খৃঃ) বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। দুয়ার (ডুয়ার্স) অঞ্চলে কোচবিহাররাজের বিস্তীর্ণ ভূভাগ ভুটানকে প্রদান করা হয়েছিল। সীমা নির্ণয়ে ভূমিসমীক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। ভুটানের দেবরাজের পক্ষে নাভাপন নামক একজন ভুটিয়া কর্মচারী ও কোম্পানীর পক্ষে হররাম সেন চেকাখাতা, লক্ষ্মীদুয়ার, ও মরাঘাট অঞ্চলের তালুকগুলির সীমা স্থির করে দিয়েছিলেন। কোচবিহারের কোন প্রতিনিধি এই কার্যে অংশগ্রহণ করেন নি। মরাঘাট ও চামুরচীকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে ভুটান ও কোচবিহারের দীর্ঘ দ্বন্দ্ব ইউরোপে শার্লমাস-লোরেন সংক্রান্ত ঐতিহাসিক বিরোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুতঃ ভুটানের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে ওয়ারেন হেষ্টিংসের 'অসাধারণ' আগ্রহ কোচবিহার-ভুটান সম্পর্কের অবনতি ঘটিয়ে উত্তরপূর্ব ভারতে বারবার বিপর্যয় ঘটিয়েছে।

তিব্বত-বাণিজ্যের প্রোথায় হেষ্টিংস ভুটানকে যে সব অঞ্চল প্রদান করেছিলেন তাতে জয়ন্তী ও আমবাড়ী ফালাকাটার হস্তান্তর এক অভূতপূর্ব ঘটনা। এই অঞ্চলগুলি বৈকুণ্ঠপুর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জয়ন্তীর বিখ্যাত শিবমন্দির কোচবিহাররাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। রায়বংশী (কোচজাতি) অধ্যুষিত এই অঞ্চল হস্তান্তরের কারণ নারখানের গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে। আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভুটানে দ্বিতীয় ইংরেজ-মিশনের নেতৃত্ব করেন। দেবরাজা তিব্বতের চালানী বাণিজ্যের উপর যাতে শুল্ক বৃদ্ধি না করেন ও বঙ্গদেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির সর্তগুলি পালন করেন এই উদ্দেশ্যে হ্যামিলটন উপরিউক্ত ভূভাগ হস্তান্তরে সুপারিশ করেছিলেন। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে ভুটান আমবাড়ী ফালাকাটা ও ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তী লাভ করে। বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক এবং মানবিক অধিকার অগ্রাহ্য করবার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তৃতীয় পঞ্চেনলামার অনুরোধে কলিকাতার অপর তীরে খুদ্রুফিতে (ভোটবাগান) ওয়ারেন হেষ্টিংস মঠ স্থাপনের জন্য ১০০ বিঘা জমি দান করেছিলেন। গৌরদাস বসাক (১৮৯০খৃঃ) এই সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য উদ্ধার

করেছেন। অধুনা বিনয় ঘোষ মহাশয়ও এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছেন। হেষ্টিংসের 'তিব্বত-বাণিজ্যের মতলব' এ ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট।

কোচবিহারের রাজবংশে মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (১৭৮৩-১৮১৯) এক উল্লেখ-যোগ্য চরিত্র। কোম্পানী সরকারের সঙ্গে তাঁর রাজোচিত দৃঢ় ব্যবহার সকলেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'নারায়ণী' মুদ্রা ও রাজ্যের অসামরিক শাসন ব্যবস্থার অধিকার নিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে তিনি দীর্ঘ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছিলেন। বৈকুণ্ঠপুরের রাইকতদের সহায়তায় তিনি দুয়ার অঞ্চলে চামুরচী ও রংধামালী ভুটানী কবল থেকে মুক্ত করেন। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে মরাঘাট সীমান্তে কোচ ও ভুটানী সংঘর্ষে কোচবিহারের ইংরেজ কমিশনারের হস্তক্ষেপে সাময়িক বিরতি হয়েছিল। প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানের পর কমিশনার ডিগবি মরাঘাট অঞ্চলে কোচবিহারের কর্তৃত্বের পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে কমিশনার স্কট এই রায় বাতিল করে গার্ণ মরাঘাট ভুটানীদের প্রত্যর্পণ করেন। মনে হয় ইংরেজ গুর্খা যুদ্ধে ভুটানীদের নিরপেক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ মরাঘাটের উর্বরভূমি হস্তান্তরিত হয়েছিল।

কমিশনার স্কট ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত বসুকে ভুটানে প্রেরণ করেন। ভুটান-কোচবিহার সীমানা বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য তিনি ভুটানে গিয়েছিলেন। ভুটানে ইংরেজ-গুর্খা যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্কটকে অবহিত করবার দায়িত্ব তাঁর উপর ন্যস্ত হয়েছিল। এই যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকবার জন্য দেবরাজকে সম্ভবতঃ তিনি প্রভাবান্বিত করেছিলেন। কৃষ্ণকান্ত বসুর সঙ্গে যে রামমোহন রায় ভুটানে গিয়েছিলেন এবং যার কথা দেবরাজা তাঁর পত্রে উল্লেখ করেছেন তিনি পরবর্তী-কালের স্বনামধন্য রাজা রামমোহন ব্যতীত আর কেউই নন। কৃষ্ণকান্ত বসু লিখিত ভুটানের বিবরণ তথ্য সমৃদ্ধ। ভুটানী ব্যবসায়ী তিব্বত থেকে চা, স্বর্ণ রৌপ্য ও রেশমদ্রব্য আমদানী করত। নিঃসন্দেহে এই চা ও রেশম চীনদেশে উৎপন্ন। এই ব্যবসায়ীরা তিব্বতে প্রধানতঃ শস্য রপ্তানী করত। রংপুর ও কোচবিহার থেকে ভুটানী ব্যবসায়ীরা পান ও সুপারী, গরাদিপত্র, তামাক' শুকনা মাছ ও মোটা সুতীবস্ত্র সংগ্রহ করে পার্বত্য অঞ্চলের আমদানী-বাণিজ্য অব্যাহত রেখেছিল। চৈনিক বিরোধিতায় তিব্বত-বাণিজ্য উন্মুক্ত না হলেও ভুটানের সঙ্গে দুয়ার সমভূমি, কোচবিহার ও রংপুর বাণিজ্যের সমৃদ্ধির কথাই কৃষ্ণকান্ত বসুর বিবরণে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কম্বল ও টাট্টুঘোড়ার ব্যবসায়ে ভুটানী রাজকর্মচারীদের একচেটে অধিকারের বিষয়টিও কৃষ্ণকান্ত বসু উল্লেখ

করেছেন। আবার ভুটানী রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রকৃতিও তিনি উদ্‌ঘাটন করেছেন। দেবরাজা ও অমাত্যকুল অভিজাত শ্রেণীর ক্রমবর্দ্ধমান প্রাধান্য এবং টংসা ও পারপেনলপের গুরুত্ব অনুধাবনীয়। পূর্ব ও পশ্চিম ভুটানের শাসনকর্তা টংসা ও পারপেনলপের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং বড়গড়ই যে ভুটানের অরাজকতার প্রধান কারণ কৃষ্ণকান্ত বসুই বোধ হয় প্রথম এই বিষয়ে আলোকপাত করেন।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ও আসামে ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কামরূপ ও দরঙ্গ জেলার উত্তরের দুয়ার অঞ্চলে ভুটান সীমান্ত ও আসাম সীমান্ত সান্নিধ্য লাভ করায় ইংরেজ-ভুটান সম্পর্কে এক নতুন অধ্যায় শুরু হল। ভূমিরাজস্ব, যুদ্ধনিয়ন্ত্রণ, বকেয়া কর ও অনির্নীত সীমান্ত এই সম্পর্কের অবনতির অন্যতম কারণ। সমসাময়িক দলিলপত্রে প্রতীয়মান হয় যে সীমান্ত নিরপত্তা ছাড়াও ইংরেজশক্তির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভুটানের ধর্ম এবং দেবরাজা ও রাজকর্মচারীশ্রেণীর সহায়তায় তিব্বতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করা। উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে গভর্ণর জেনারেলের এজেণ্ট ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর এক পত্রে লিখেছেন 'চীন সরকারের প্রভাব এবং ঈর্ষা আমাদের তিব্বত ও ভুটানের বাণিজ্য থেকে বহিষ্কৃত করেছে। এই দুই দেশের লামা এবং অধিবাসীগণ এটি সমর্থন করেন না। চৈনিক বিরোধিতার জন্যই ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে দেবরাজার সঙ্গে বর্জ বগল-সম্পাদিত বাণিজ্যচুক্তির পূর্ণ সুযোগ আমরা গ্রহণ করতে পারি নি।' ওই বছরই ভুটানে একটি নতুন মিশন প্রেরণের বিষয়টি আলোচিত হয়। ভারত সরকারের পররাষ্ট্রীয় বিভাগের দলিল পত্রে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন তিব্বতের দলাইলামাকে লিখিত এক পত্রের খসড়া আছে। তিব্বতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহে এটি রচিত। পত্রখানিকে বাংলায় অনুবাদ করলে এরূপ দাঁড়ায় :—

'আসামসীমান্তের উদ্বেগজনক ঘটনাবলী যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে প্রত্যক্ষ আলোচনার দ্বারা তার সমাধানের উপায় নির্ণয় করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে আমি ভুটান সরকারের কাছে এক দূত প্রেরণ করেছি।

ভুটানে ব্রিটিশ রাজদূতের উপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করে আমি আপনার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ও সহযোগিতার আশ্বাস দিচ্ছি। দীর্ঘ ৫৩ বছর পূর্বে আপনার সভায় ব্রিটিশ রাজদূত প্রেরিত হয়েছিল। এটা স্বাভাবিক যে এই দীর্ঘ কালের ব্যবধানে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় বিভিন্ন বিষয়ে সন্দেহ ও মতানৈক্যের অবকাশ হয়েছে।

যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের প্রথম সোপান দীর্ঘদিন পূর্বে স্থাপিত হইয়েছিল আমার একমাত্র ইচ্ছা তা আবার পুনরুজ্জীবিত হোক। আমি বিশেষ আনন্দিত হব যদি আপনি ভুটানে উপস্থিত আমার দূতকে আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় আপনি প্রীত হবেন।'

সম্ভবতঃ ভুটানে প্রেরিত রাজদূত পেম্বারটন (১৮৩৮খৃঃ) অনুরূপ পত্র সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু দলাইলামাকে তা প্রেরণ করবার সুযোগ হয়নি। এই চিঠিতে পূর্ববর্তী যে রাজদূতের উল্লেখ রয়েছে তা স্যামুয়েল টার্ণারের তিব্বত ভ্রমণের বৃত্তান্ত, যদিও টার্ণার সাহেব রাজধানী লাসায় যেতে সক্ষম হন নি। তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের এক নতুন আগ্রহ চিঠিখানার বিষয়বস্তু। জর্জ বগলের ভাষায় এই সম্পর্ক 'সদাসময়েই' বাণিজ্যিক সহযোগিতার প্রয়োজনে বিবর্তিত হয়েছে। ভুটান থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পেম্বারটন আসামদুয়ার অধিকারের পক্ষে মত প্রকাশ করলেন তিনি তাঁর প্রতিবেদনে বলেছেন এই দুয়ারগুলি নিয়ন্ত্রণে রেখে ভুটান সরকারকে সর্ত্ত গ্রহণে বাধ্য করা যেতে পারে এবং ভুটানের সাহায্যে তিব্বতের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে।

পেম্বরটন মিশনের ব্যর্থতা সরকারী পর্যায়ে স্বীকৃত। টমাস পেনলপের বিরোধিতায় ভুটানের সঙ্গে সন্ধিসম্পর্ক স্থাপন ও ভুটানের স্থায়ী ইংরেজ প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হল। ভুটানের সহযোগিতায় তিব্বত প্রবেশের আশা অবিশ্বাসের প্রাচীর লঙ্ঘনে অসমর্থ হয়েছিল। বস্তুতঃ কোচবিহারে ইংরেজ-প্রভুত্ব, নেপাল ও সিকিমের আয়তন হ্রাস এবং আসাম অধিকার ভুটানীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে এক ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। কোচবিহার-সীমান্তে নিরবচ্ছিন্ন ভুটানী তৎপরতা এই প্রতিক্রিয়ার প্রত্যক্ষ ফল। আবার ভুটানরাজের রাষ্ট্রব্যবস্থায় অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধ দুয়ার সমভূমিতে দীর্ঘকাল অশান্তি ঘটিয়েছে এবং তাতে ভুটান-কোচবিহার-রংপুর বাণিজ্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পেম্বারটন এই বাণিজ্যে রপ্তানী ও আমদানীদ্রব্যের যে মূল্যমান দিয়েছেন তা এই অবনতির পরিমাপ নির্দ্দেশ করেছে। উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের ব্যয় সংকোচ নীতিও এই বাণিজ্যের অবনতির জন্য দায়ী। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বেন্টিঙ্কের নির্দেশে রংপুর ও দিনাজপুরে ভুটানী ব্যবসায়ীদের শুল্ক সংক্রান্ত ও আবাসিক সুযোগসুবিধা প্রত্যাহৃত হয়। দার্জিলিঙের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ক্যাম্পবেলের উদ্যোগে তিস্তালিয়ায় এক 'মেলা'র প্রচলন হয় ও ভুটানী ব্যবসায়ীদের এতে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। পরবর্তীকালে

তিস্তানিয়া রংপুরের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় এবং প্রত্যাশিত সরকারী সমর্থনের অভাবে তিস্তানিয়ার মেলা গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে।

ভুটানের কেন্দ্রীয় সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের উপায় না থাকায় তিব্বতের চালানী বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয়ে পড়ল। উত্তরপূর্ব সীমান্ত আবার অবহেলিত হওয়ায় অনিশ্চয়তা ও অশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে লাগল। কোচবিহার-ভুটান বিরোধ চাকলাক্ষেতি অঞ্চলে এক বিপজ্জনক পরিস্থিতির উদ্ভব করলে দার্জিলিঙ থেকে ক্যাম্পবেল দুয়ার চাকলাক্ষেতি পরিদর্শন করেন। ক্যাম্পবেলের পত্রাবলীতে উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তের অনিশ্চয়তাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক 'কলঙ্কজনক' অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্যাম্পবেল সীমান্তের উচ্চপদস্থ ভুটানী রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনার দ্বারা শান্তিরক্ষার চেষ্টা করলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ক্যাম্পবেল ভুটান-সীমান্তের দায়িত্বভার পরিত্যাগ করলে কর্ণেল জেনকিন্স তাঁর স্থলাভিষিক্ত হলেন। জেনকিন্স্ ভুটানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি ও বিস্তারবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। সীমান্তের জমিদার ও প্রশাসনের দোষত্রুটির বিষয়ে জেনকিন্স এই অভিমত পোষণ করতেন যে ভুটানীদের ন্যায় কোচবিহার ও বৈকুণ্ঠপুরের প্রশাসনের কীর্তিকলাপও অরাজকতার জন্য সমভাবে দায়ী। দুয়ার অঞ্চলে অরাজকতা ও অনিশ্চয়তার আলোচনায় দুয়ারযুদ্ধের ঐতিহাসিক রেনী অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিকিম অভিযান সফল হবার পর টুমলং সন্ধির দ্বারা সিকিমরাজ্য অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করেছিল। ভুটানে ইডেন মিশনের ব্যর্থতার পর ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে দুয়ারযুদ্ধ আরম্ভ হয়। তৎকালীন বড়লাট জন লরেন্স-এর সঙ্গে ভারতসচিব চার্লস্ উড্-এর অপ্রকাশিত পত্রাবলীতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ভুটানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের রণকৌশল গ্রহণের বিবরণ রয়েছে। এই কৌশল পূর্ণ সফলতা লাভ করেছিল। পারপেনলপ্ ও পশ্চিমভুটানের শাসকবৃন্দ সমভূমি ও কোচবিহারের লাভজনক বাণিজ্য থেকে বঞ্চিত হবার সম্ভাবনায় আতঙ্কিত হলেন। এঁদের প্রভাবে দেবরাজাও শান্তিপ্রস্তাব সমর্থন করলেন। সিনচুলার সন্ধিদ্বারা (১৮৬৫খৃঃ) ভুটান দুয়ারভূভাগ হারিয়ে অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করল। তিব্বত দ্বার তখনও রুদ্ধ।

পটুয়া সমাজের রেখাচিত্র এবং ইসলামীকরণ সম্পর্কে একটি অনুমান ১

বিনয় ভট্টাচার্য্য

লোকসংগীত ও লোকচিত্রের খ্যাতি নিয়ে পটুয়া সমাজ বাংলাদেশে খুবই পরিচিত। চিত্রকলা সম্পর্কে যাঁরা অনুসন্ধিৎসু তাঁদের কাছেও পটুয়া শিল্পরীতি এক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। শিল্পাচার্য্যদের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, যামিনী রায়, অর্দ্ধেন্দু গাঙ্গুলী ও বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় নানা আলোচনার মধ্যে শিল্পজাত হিসেবে বা সহজিয়া শিল্পি হিসেবে পটুয়াদের স্থান অনেক উচ্চে তুলে ধরেছেন। এর ফলে পট শিল্প ও শিল্পরীতি বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্যের অন্যতম প্রকরণ হিসেবে পরিগণিত হতে লাগল। আধুনিক শিল্পকলায় এই ট্র্যাডিশনাল চং বা রীতি ও কৌলিন্য পেতে লাগল যার চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করল যামিনী রায়ের আঙ্গিকে ও অঙ্কন রীতিতে। গুরু সদয় দত্ত বীরভূমের কালেক্টর থাকাকালে পটুয়াদের সম্পর্কে আকৃষ্ট হন এবং কিছু পট ও সংগীত সংগ্রহ করেন। তাঁরই চেষ্টায় এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েণ্টাল আর্ট এর অর্দ্ধানুকূল্যে ১৯৩২ সনে 'সম্ভবতঃ প্রথম গণশিল্পের প্রদর্শনী' কোলকাতায় করেন এবং ঐ শিল্প মেলায় সংগীত সহযোগে পট প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করা হয়। এই সময়ে মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় তিনি কয়েকটি প্রবন্ধও প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে শান্তিনিকেতন মেলায়ও অন্যান্য লোকসংগীতের সাথে পট প্রদর্শন ও পটুয়া সংগীতের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৩৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গুরুসদয় দত্তর সম্পাদনায় পটুয়া সংগীত প্রকাশ করেন। এতে বীরভূম জেলার পটুয়াদের কাছ থেকে সংগৃহীত ২৯টি গান এবং সাতটি পটচিত্র স্থান পেয়েছে।

কিন্তু বহু আলোচিত পটশিল্পিদের সমাজ জীবন সম্পর্কে কোন বিস্তারিত কেন বলতে গেলে কোন আলোচনাই দেখা যায়না। ১৯০১ সালে প্রকাশিত L.S.S.O' Malleya বীরভূম District Gazetteer এ মাত্র পটুয়াদের সম্পর্কে সামান্য উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে (১৯৫৭) বিনয় ঘোষের পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থে পটুয়াদের সম্পর্কে যৎসামান্য উল্লেখ আছে। তবে এই স্বল্প

১ এই প্রবন্ধটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত পটুয়া সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

আলোচনার মধ্যেও পটুয়াদের উৎপত্তি সম্পর্কে তিনি মূল্যবান ইংগিত করেছেন। এছাড়া ১৯৫১ সালের সেন্সাসেও একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে।

১৯৫৪ সালে জে. বি. এস হলডেন এর অর্থানুকূল্যে এবং অধ্যাপক নির্মল বসুর তত্ত্বাবধানে মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি সাবডিভিসনে জাতিগত পেশা (Traditional occupation) থেকে বিচ্যুত জাতিদের পুনর্বাসনের সমস্যা নিয়ে কাজ করার সময় নানকরচক, কুমীরমারা, ইত্যাদি গ্রামের পটুয়াদের সংস্পর্শে আসি এবং পটুয়াদের সম্পর্কে সাধারণ সমীক্ষা চালাই। সেই সময় লক্ষ্য করেছিলুম পটিদার বা পটুয়াদের মধ্যে হিন্দু সমাজের মধ্যে একান্ত হয়ে যাবার বাসনা রয়েছে। ১৯৪৬ সাল থেকে বঙ্গীয় চিত্রকর উন্নয়ন সমিতির প্রচেষ্টায় এবং ভারত সেবক সমাজ সঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভার সহযোগিতায় ১৯৫১ সালের সেন্সাসে পটুয়াদের হিন্দু বলে তালিকাভুক্ত করার আবেদন প্রচার করা হয়। টাকাপুরায় একটি শুদ্ধি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে পটুয়া ও হিন্দুরা একত্রে ভোজনাদি করে। কিন্তু ১৯৫৪ সালে ঐ অঞ্চলের পটুয়া অধিবাসীদের কাছে শুনেছি ভোজ সভার পর অনেক হিন্দু নাকি গলায় আঙ্গুল দিয়ে বমি করেছেন। ১৯৫৭-৫৫ সাল পর্যন্ত সেখানকার হিন্দুরা পটুয়াদের সাথে আর কোন সহযোগিতা রাখেন নি কোন বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান পটুয়াদের সঙ্গে হয়নি। কোন মুসলমান পরিবারের সংগেও বৈবাহিক বা অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠান চলেনি। ফলে পটুয়ারা না-হিন্দু-না-মুসলমান এই পর্যায়ই থেকে যান।

১৯৬৫ ও ১৯৬৭ সালে আমার ছাত্রদের নিয়ে গ্রাম সমীক্ষা করার সময় বীরভূম জেলার পাঁকুর হাট ও পুরন্দরপুর গ্রামে পটুয়াদের সংস্পর্শে আসি এবং জাতি কি জিজ্ঞাসা করায় তারা দৃঢ়ভাবে জানায় যে তারা মুসলমান এবং কোনও কালে হিন্দু ছিলনা। তাদের পূর্বপুরুষ পট দেখাতেন তবে বর্তমানে পট দেখানো বা আঁকা এ সব 'হিন্দুয়ানী' একেবারে ছেড়ে দিয়েছেন। নামের মধ্যেও যথেষ্ট পরিবর্তন দেখলুম। পুরন্দরপুরে সুকুমার ছাড়া আর সবার মুসলমানী নাম। পুরন্দরপুর স্কুলে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলুম বর্তমানের ডিগরীধারীদের নাম ১৯৪১ সালের রেজিষ্ট্রীতে রয়েছে, দিগ্বিজয় চিত্রকর পিতার নাম অনাই চিত্রকর নয় অনু চিত্রকর। সমাদীশ চিত্রকরের কাছে লেখা চিঠি ১৯৫২ পর্যন্ত শ্যামাধীশ চিত্রকর। এরপর সাংস্কৃতিক দোদুল্যমানতার (Interoultural oscillation) সমস্যা নিয়ে পটুয়া সমাজের মধ্যে কাজ শুরু করেছি। ইতিমধ্যে বীরভূমের ৪০টি গ্রাম ছাড়াও

কোলকাতা, ২৪ পরগণা, মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান ও হুগলীর কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করি।

বর্তমানে বলা যায় পটুয়া সমাজ মোটামুটি দুটো ভাগে বিভক্ত। মেদিনীপুর, কোলকাতা ২৪পরগণা ও হুগলীর পটুয়াদের একাংশ হিন্দু বলে পরিচয় দিতে উৎসুক এবং ১৯৬১ সালে সেন্সাসে হিন্দু বলে অনেকে লিখিয়েছেন। কিন্তু বীরভূম, বর্দ্ধমান ও মুর্শিদাবাদের সামান্য কয়েক ঘর ছাড়া সকল পটুয়া মুসলমান বলে পরিচয় দিচ্ছেন এবং মুসলমানদের সংগে একাত্মা হয়ে যাবার সক্রিয় প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক ভাবে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংগে মিশে যাবার আগ্রহ ও এই দিকে নেতৃত্ব দিতে উৎসুক প্রধানতঃ মুসক মুসতীরা ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী রাজনৈতিক পটুয়া কর্মিদের মধ্যেও এর বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম দেখা যায় না। এঁরা ১৯৬১ বিশেষ করে ১৯৭১ সালের সেন্সাসে মুসলমান বলে লিখিয়েছেন।

এই ইসলামীকরণ বা পটুয়া সমাজে কবে থেকে মুসলমানী রীতি চালু হয়েছে সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এই বিষয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের অবকাশ আছে। কালিদাসের কাল যদি পঞ্চম শতাব্দী ধরা হয় তা হলে তখন থেকে অর্থাৎ অভিজ্ঞান শকুন্তলা নাটকে, সপ্তম শতাব্দীর বানভট্টের হর্ষচরিতে এবং অষ্টম শতাব্দীর ভবভূতির উত্তর রামচরিত নাটকে পটুয়া ও পট প্রদর্শনের উল্লেখ আছে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানান ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পটুয়ারা হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তা উদ্ধার করে তিনিই বঙ্গীয় চিত্রকর সমিতির স্মারকলিপি রচনায় সহায়তা করেন।

পটুয়াদের নাম নানা আচার এবং বিশেষ করে তাঁদের বসতি অনুশীলন করে আমার মনে হয়েছে তাঁরা কোন 'ট্রাইব' থেকে সুদূর অতীতে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁরা ছিলেন অন্ত্যেবাসী। আমার দেখা অর্দ্ধ শতাধিক গ্রামের মধ্যে মাত্র তিনটি গ্রামে মুসলমান বসতির সংলগ্ন পটুয়া বসতি। এর দুটি মুসলমান গ্রামের মধ্যে ও অপরটি ইটাগুড়িয়া ও জুনদপুর এই দুই মুসলমান ও হিন্দুগ্রামের মধ্যে থেকে গ্রাম দুটিকে দ্বিধা বিভক্ত করছে। বাকী সব গ্রামেই পটুয়াদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী হিন্দু আর সবগুলি পটুয়া বসতিই গ্রামের প্রান্ত ভাগে অবস্থিত। আমি যত পটুয়া হিন্দু এবং মুসলমানদের সংগে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি, অভিমত সংগ্রহ করেছি তাদের প্রত্যেকের মতে কোন এক সুদূর অতীতে এঁরা হিন্দুই ছিলেন। তবে বৃদ্ধ পটুয়ারা বলেন যে তাদের জানা

চার পাঁচ পুরুষ আগেও মুসলমানদের মত কবর দেওয়া হত এবং খতনা বা মুসলমানী করা হত। অবশ্য কবর দেবার প্রথা অনেক হিন্দু এবং আদিবাসীদের মধ্যেও রয়েছে।

জাতিস্রষ্টা সম্পর্কে এঁটো তুলি দিয়ে শিবের ছবি আঁকার কাহিনী মেদিনীপুরে ১৯৫৪ সালে শুনেছি। হুগলীতে শুনেছি বীরভূমে ও মুর্শিদাবাদে শুনেছি। এই কাহিনী 'ছবিলাল' চিত্রকরের কাছ থেকে গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ও নিয়েছেন। চিত্রকর সমিতির প্রচার পত্রেও তাই আছে। তফাৎ শুধু ভাষার সামান্য হেরফের। কেবল মুর্শিদাবাদের পাঁচথুবি গ্রামে একটু ভিন্ন লোক কাহিনী শুনলাম—তা অতি সংক্ষেপে এই রকম—কোন এক মুনির দুই পটুয়া পুত্র ছিল। তিনি গরু বধ করে গরুর বিভিন্ন অংশ জোড়া দিয়ে আবার তাকে জীবন্ত করতেন। একদিন বড়পুত্র গরুর একখানা হাড় ও মাংস লুকিয়ে রাখে ফলে গরুর পাঁজরের হাড় ও মাংস ঠিক জোড়া লাগে না। মুনি বড় পুত্রকে হাড় মাংস আনতে বল্লেন। কিন্তু আনতে গিয়ে বড়পুত্র কেবল হাড় রসুন আর মাংস পেঁয়াজ হয়ে গেছে। সেই থেকে মুনির শাপে পটুয়াদের 'বড় থাক' মুসলমান ও 'ছোট থাক' হিন্দু হয়ে গেল। এই ধরনের হাবিল কাবিল দুই ভাইয়ের গল্প অবশ্য আমি কোড়াদের মধ্যে কাজ করার সময়ও শুনেছি—বড়ভাই হাবিলের বংশধর হলেন মুসলমান এবং ছোটভাই কাবিলের বংশধর হলেন হিন্দু। যাই হোক ঐতিহাসিক কোন তথ্যই পাইনি কেবল একটা আবছা কাহিনী মেদিনীপুর থেকে মুর্শিদাবাদ অবধি শুনেছি যে বর্গীদের হাঙ্গামার সময় সংখ্যা লঘু ও দরিদ্র পটুয়ারা আত্মরক্ষার জন্য মুসলমানদের আশ্রয় নেয় ও সেই থেকে মুসলমান হয়। সমাদীপ চিত্রকরের কাছে আর একটি কাহিনী শুনেছি যে জিজিয়া কর বসানর পর দরিদ্র চিত্রকররা কর মুক্তির জন্য নবাবের কাছে মুসলমান বলে কবুল করে। জিজিয়া কর থেকে মুক্তি পাবার জন্য কত হিন্দু মুসলমান হয়েছিলেন অথবা হননি ঐতিহাসিকগণ গবেষণা করে তার সত্যতা যাচাই করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে বীরভূমের পটুয়ারা ঠিক কোন সময়ে এবং কি কারণে মুসলমান হয় এই নিয়ে বীরভূমের ইতিহাস রচয়িতা ও সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছি। তিনি বলেন যে চিত্রকর বা পটুয়ারা চাণক্যের গুপ্তচর ছিলেন (মুদ্রা রাক্ষস নাটকে এর উল্লেখ আছে) এবং মুসলমানদের আগমন কালে তাঁরা মুসলমানদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করেছিলেন। সেই থেকেই তাঁরা পতিত। কিন্তু এর কোন

ঐতিহাসিক নজীর তিনি দিতে পারেন নি। আমিও ঐতিহাসিক বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করে কোন নজীর সংগ্রহ করতে পারিনি। আমার অনুমান পটুয়ারা হিন্দু সমাজের গভীরে সম্পূর্ণ মিশে যাওয়ার (cultural assimilation) পূর্বেই মুসলমানদের সংস্পর্শে আসে এবং নবাবী আমলে মুসলমান শাসকগণ পটুয়াদেরকে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচারে উৎসাহিত করেন। সংখ্যালঘু পটুয়া সম্প্রদায় রাজশক্তির আনুকূল্য লাভের আশায় ইসলামের কীর্তি কাহিনী নিয়ে পট ও সংগীত রচনা করেন। যার প্রমান আজও যথেষ্ট পরিমানে সংরক্ষিত গাজীর পটে পাওয়া যায়। তখন থেকেই পটুয়ারা মুসলমানী আচার ব্যবহার শিখতে আরম্ভ করে এবং মুসলমানী নাম গ্রহণ করে। অনুসন্ধান করলেই দেখা যাবে সকল পটুয়ার দুটি নাম যেমন সুকুমার। খোদাবক্স, কবল। কানাই, রসময়। রসুল বক্স, নরেন। সুর মহম্মদ, সুকুমার। সুকুর, কুমারেশ। কোরবান ইত্যাদি। হিন্দুগ্রামে পট দেখানো সাপ খেলা মনোহারী জিনিস বিক্রি, গরুর কীর্তন, গো চিকিৎসা যখন করতে যায় তখন হিন্দু নাম ব্যবহার করে এবং হিন্দু বাড়ীতে আহার গ্রহণ করে। আবার মুসলমান গ্রামে যখন যায় (ইদানীং পট একেবারেই দেখায় না) তখন মুসলমানী নাম ব্যবহার করে। কথা বার্তায় পানি, বেহস্ত, হালাল ইত্যাদি শব্দ ও ব্যবহার করে। মুসলমান বাড়ীতেই খাদ্য গ্রহণ করে।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অনুষ্ঠানে হিন্দু মুসলমান দুই আচারই পালন করেন। কয়েকটি পরিবার হিন্দু আচার প্রায় বর্জন করেছেন। সাধ ভক্ষণ, অন্নপ্রাশন বেশীরভাগ ক্ষেত্রে পালন করা হয়। প্রতি ক্ষেত্রেই সিন্নি দেওয়া হয়। কোন কোন সময়ে 'কালীর থানে মানত' করা হয়। গর্ভাবস্থায় কোন বিশেষ নিয়মকানুন পালন করতে হয়না বা কোন খাদ্য বস্তু নিষিদ্ধ নয়। জন্মের সময় ধাত্রী এবং নাপিত আসে। উভয়কে নতুন কাপড় বা গামছা, পয়সা ও সিধে দিতে হয় অন্নপ্রাশনে অনেক ক্ষেত্রে বোষ্টা এসে সিন্নি খাওয়ান এবং নামকরণ করে যান। মুসলমানী বা খতনা করার নির্দিষ্ট সময় নেই তবে ৭।৮ বছরের মধ্যেই করা হয়। এই সময় মুসলমান হাজম আসেন। দু তিনটি গ্রামের জন্য একজন করে হাজম থাকেন। তাঁকেও যথাসাধ্য দক্ষিণা দিতে হয়। সম্ভব হলে এই উপলক্ষ্যে মিলাদ শরীফ করা হয়। মুসলমানদেরকে নিমন্ত্রণ করা হয় ও তাঁদেরকে বাড়ীতে নিয়ে রান্না করার জন্য সিধে দেওয়া হয়।

বিবাহের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হিন্দু শাস্ত্র বা হাদিস উল্লিখিত আদর্শ সম্পর্কে তাঁদের বিশেষ কিছুই জানা নেই। বিবাহ করতে হয় তাই করা। মেয়েদের

বিবাহের বয়সের সীমা ১৪ বৎসর উত্তীর্ণ দেখতে পাওয়া যায়না। ৬।৭ বৎসরের মেয়েদের বিয়ে প্রচুর হয়। ছেলেদের বিয়ে মোটামুটি ১৬-১৮ বৎসরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। দেনাপাওনা নিয়ে মুরুব্বিদের মধ্যে আলোচনার পর পঞ্জিকা দেখে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। তিনটি পরিবার বল্লেন শুক্রবার বা রবিবার তাঁরা পছন্দ করেন। বাকীদের মধ্যে বার নিয়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হতে দেখা যায় না। বিয়ের ৩।৪।৭ দিন আগে গায়ে তেল হলুদ দিয়ে পাকা দেখা হয়। বিয়ের দিন পর্যন্ত তেল হলুদ পাত্র পাত্রীকে মাখান চলে। সধবারা এই কাজ করেন বিধবারা করতে পারেন না। নিমন্ত্রণ করা হয় হাতে পান সুপারি অথবা শুধু সুপুরি দিয়ে। পাত্রের বাড়ীতে বিবাহ হয়। দিনে বা রাতে যে কোন সময় বিয়ে হতে পারে। বিয়ের দিন ছয়লা বাঁধা হয় এবং পুকুল (ঘট) ভরা হয়। এই কাজটি পাত্র এবং পাত্রীর বড় ভগ্নিপতিকে করতে হয়। নিজের ভগ্নিপতি না থাকলে নিকটতম আত্মীয় সম্পর্কিত ভগ্নিপতি, না থাকলে পাতানো ভগ্নিপতিকে দিয়ে এই কাজ করাতেই হবে। ভগ্নিপতিকে এজন্য টাকা কাপড় ইত্যাদি দেওয়া হয়। ভগ্নিপতি একজন সাক্ষী হিসাবে ও বিয়ের সময় থাকেন। পুকুল ভরার ঘট ও ডালা নিয়ে নিকটস্থ বাগ্দী বাড়ী থেকে কারা আনে। ডালায় থাকে নতুন কাপড়, তেল সিঁদুর, হরিতকী, দুর্বা, পান সুপুরি, হলুদ, কড়ি, লোহার ছুরি, প্রদীপ। ছয়লার চারদিকে পাত্রকে ঘোড়ায় চড়ে ৭বার প্রদক্ষিণ করতে হয় তারপর বসতে দেওয়া হয়। এসবের পর কাজী আসেন। কাজী না হলে বিবাহ হয় না। কাজী এসে 'সাদি কবুল' করান। তাঁর সামনে দেন মোহর বাঁধা এবং কাবিলনামা মুখে বলা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কাগজে কলমে কাবিলনামা রাখা হয়। সাদি কবুল করার পর কাজী পাত্র পাত্রী উভয়কে একই গ্লাস থেকে সরবৎ খাওয়ান। বাসরের জন্য কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই। তবে জিয়াগমন ও অষ্টমঙ্গলা পালন করা হয়। বীরভূমের স্থানীয় হিন্দুদের মত বধূর কাঁখে জলভর্তি কলসী দিয়ে বধূবরণ করা হয়। পণপ্রথা আগে ছিল না। গত ৫।৬ বৎসর যাবৎ পণপ্রথা প্রবল আকার ধারণ করছে। সাইকেল, ঘড়ি ও ১৫০-৩০০ টাকা নগদ প্রায় বাধ্যতা মূলক হয়ে যাচ্ছে। অবস্থা ভেদে এই দাবী আরও বেশী। অবশ্য পণপ্রথা বীরভূমে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক হারে বাড়ছে। এই পণপ্রথার কুফল পটুয়া সমাজে ফলতে শুরু করেছে। এইজন্য গত বছর একটি আত্মহত্যা হয়েছে। এবং প্রতি ঘরে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়ছে। অবিবাহিতা বয়স্কা কন্যা রাখা পটুয়া সমাজে খুবই নিন্দনীয়।

তালাক বা বিবাহ বিচ্ছেদ খুব সাধারণ ব্যাপার। চিঠি দিয়েও তালাক দেওয়া যায়। আমি একজন পুরুষের বেশী পক্ষে ৭বার ও মহিলার ৫বার তালাক দেওয়ার নজীর পেয়েছি। বিধবা বিবাহের সংখ্যাও প্রচুর। এমন পরিবার নেই বল্লেই চলে যেখানে বিধবা বিবাহ বা তালাক দেওয়া পুরুষ বা স্ত্রীর বিবাহ হয়নি। বিবাহ সাধারণতঃ মামাতো, পিসতুতো খুড়তুতো ভাইবোনের মধ্যে হয়। তবে নিজের মা, মাসী, পিসি, বোন, ছাড়া আর সব রকম আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যে বিবাহ চলে এবং বিবাহ প্রধানতঃ আত্মীয় সম্বন্ধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

জানাজা বা মৃতদেহ সংকার স্থানীয় মুসলমানদের চেয়ে ভিন্ন নয়। মৌলভীকে ডাকতেই হয়। তিনিই কাফনের (কবরের) সব ব্যবস্থা করেন। জানাজা নামাজ তিনিই পাঠ করান। ৪০ দিনের মধ্যে 'কানবারকরার' বা শ্রাদ্ধের দিনে মৌলবী আবার আসেন কোরণশরীফ পাঠ করেন। সেই দিন তিনি সিধে নতুন বিছানা, কাপড় টাকা ও যার উপর বসে কোরাণ পাঠ করলেন সেই নতুন চাটাই নিয়ে যান।

বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে যদিও পটুয়ারা বলেন ডাহা অর্থাৎ মহরম, বকরীইদ, ইদুজ্জোহা, সবেবরাত প্রধান তথাপি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখেছি দুর্গাপুজা, সরস্বতীপুজা ও বিশ্বকর্মা পুজায় ঠাকুর প্রতিমা দেখতে যান। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রণাম করতেও দেখেছি। পট এবং মূর্তি গড়ার কাজ সকলে করেন না বীরভূমে বর্তমানে সারধা গ্রামের বাঙ্কু পটুয়া এ কাজে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। তিনি প্রায় সারা বছর পট এবং মূর্তি গড়েন। তাঁদের কেউই মূর্তি গড়ার ধ্যানমন্ত্র জানেন না তবে কোন ঠাকুরের কি কি প্রয়োজন তা নিখুঁতভাবে করে যেতে পারেন। এ শিক্ষা পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পাওয়া। দশহরার পর এবং বিশ্বকর্মা পুজার সময় সমস্ত যন্ত্রপাতিকে স্নান করান হয়, তেল সিঁদুর মাখান হয় এবং তিন দিন সমস্ত যন্ত্রপাতিকে বিশ্রাম দেওয়া হয়। এ ছাড়া গরুকে পিঠে খাওয়ান, তেল সিঁদুর মাখানর নির্দিষ্ট উৎসব আছে। গরু কোরবানী করেন বলে সকলেই বলেন কিন্তু ইদের দিনে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগদান করে দেখেছি যে এখনো সকলে গো কোরবানী করেন না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মুরগী কোরবানী করেন। কাটা মাংস খাওয়ায় আপত্তি আছে। জবাই করা মাংস না হলে একে হারাম বলেও উল্লেখ করেন। শূকর, পাঁঠা, কাছিমের মাংস হারাম বলে গণ্য করেন।

পট সংক্রান্ত প্রচলিত কাহিনীগুলো ছাড়া হিন্দুধর্ম সম্পর্কে পটুয়াদের ধারণা খুব কম। ইসলাম সম্পর্কেও একই কথা খাটে। ইসলামী লোকাচার ছাড়া

ধর্মীয় জ্ঞান খুব কম। তবে কোরাণ এবং হাদিসের নির্দেশাবলী জানার আগ্রহ খুব বাড়ছে। কলমা তৈয়ব, কলমা শাহাদাৎ ও কলমা তৌহিদ অনেকেই বেশ জানেন। তবে বেশীর ভাগ কলমা তৈয়ব জানেন। কলমা তমহিদ ও কলমা রদ্দে কোফর জানা একজন পটুয়াকেও পাইনি। অজু সকলেই জানেন তবে কি কি কারণে 'ওজুর পানি না পাক' হয় তা জানা নেই। জল না থাকলে ধুলো দিয়ে ওজু করা যায় একথা সবাই জানেন কিন্তু কোন কোন অবস্থায় জল ছাড়া ওজু করা যায় তা জানা নেই তায়াম্মোমের নিয়েত জানা নেই কিন্তু প্রণালী প্রায় সকলেই জানেন। নামাজের ছুরা ফাতেহা ছাড়া অন্য ছুরাগুলো জানেন এমন লোক পাইনি। পাঁচ ওয়াক্ত নমাজের কথা এবং কোন সময় কয় রাকাত নামাজ পড়তে হয় তা প্রায় সকলেই জানেন। মাত্র দুটি পরিবারকে বাড়ীতে নিয়মিত নামাজ পড়তে দেখেছি। বাকী সকলেই ঈদের দিন ময়দানে গিয়ে নামাজ পড়েন।

সংগৃহীত তালিকা থেকে দেখা যায় পটুয়াদের পেশা প্রায় ৩৬ রকমের। এর মধ্যে সাপ ধরা ও সাপ খেলান প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছে। এই পেশাকে খুব নীচু চোখে দেখা হয়। ৪।৫ বছর আগে থেকে পটুয়া সমাজে বহু সভা ও নির্দেশ জারি করে একে বন্ধ করার চেষ্টা চলেছে। যাঁরা গোপনে এখনও সাপ ধরেন তাঁদেরকে একঘরে করে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য পঞ্চায়েতী সভায় জরিমানা দিয়ে জাতে ওঠা যায়। পট তৈরী এবং নূতি গড়াও নিন্দনীয় এবং বর্জনীয় বলে গণ্য হচ্ছে। এর একটি কারণ পট তৈরী বা নূতি গড়া প্রকৃত ইসলামীয় রীতি সম্মত নয়। মুসলমানগন এই কাজকে নীচু চোখে দেখেন। দ্বিতীয় কারণ সারাদিন ঘুরে ঘুরে গান গাওয়ায় খুব পরিশ্রম হয় কিন্তু সেই তুলনায় উপার্জন কম হয়। নূতিগড়ার কাজ কুমোর সূত্রধর ইত্যাদি হিন্দুরা করছেন। দড়ির খেলা তুকতাক প্রায় উঠে গেছে বলা চলে। পট না দেখিয়ে শুধু মসিরা বাজিয়ে গরুর গান করা এখনো চলছে তবে তাও কমে যাচ্ছে। সানা বাঁধা, গোচিকিৎসা, রাজমিস্ত্রির ও শিক্ষকতার কাজ খুব সম্মানের বলে গণ্য হচ্ছে। বেশীর ভাগ লোক এই পেশাগুলি গ্রহণ করেছেন। মেয়েদের মধ্যে প্রধানতঃ তালাই (তালপাতার চাটাই) বোনা এবং মনোহারী জিনিসপত্র মাথায় করে ফিরি করা প্রধান জীবিকা। জীবিকা অর্জনের জন্য সারাদিন নারী পুরুষ নানা রকমের কাজ করছেন। এমন কি বৃদ্ধ বৃদ্ধারাও গরুর ওষুধ তৈরী বা মনোহারী জিনিস নিয়ে হাটে বসছেন। এত সব সত্ত্বেও প্রায় সকলের নিয়মিত জোটেনা কিন্তু ভিক্ষা করতে কাউকে

দেখিনি বা কেউ ভিক্ষা করে একথা শুনিনি। পট দেখানোকে অবশ্য ওরা ভিক্ষা করা বলে।

সমাজতাত্ত্বিক দিক থেকে পটুয়াদের ধর্মীয় এবং সামাজিক পরিবর্তনের গবেষণায় যে সত্য উদঘাটিত হয় তা হিন্দু মুসলমান সমাজ সংগঠনের মধ্যে যে রূপান্তর চলছে তা থেকে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন নয়। পটুয়ারা হঠাৎ বিশ্লিষ্ট সংস্কৃতির কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বয়ম্ভূ জাতিও নয়। অনেক ভাঙা গড়ার মধ্য দিয়ে পটুয়া সমাজ আজকের এই অবস্থায় এসেছে। বেদে, চিত্রকর, পটুয়া, পটিদার, মাল পটুয়া, বাসকাটা পটুয়া, দুরে বা দুরী ইত্যাদি সবই অতীতের একটি জাতিরই খণ্ডাংশ এঁদের আপাতঃ বিচ্ছিন্নতা থাকলেও এঁদের মধ্যে একটি অন্তঃশীলা প্রবাহ চলছে। বর্তমানে প্রকারান্তে ইসলামীকরণের প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আবার এরা এক হয়ে যাচ্ছেন। পটুয়া জাতি বর্তমানে একটি সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন এবং বাইরে থেকে পটুয়াদের যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তার চেয়ে দ্রুততর ভাবে পটুয়া সমাজের মধ্যে ভাঙন ও মিলনের প্রক্রিয়া চলছে। মনে হচ্ছে আগামী চার পাঁচ পুরুষের মধ্যে পটুয়াদের দুই অংশ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠির মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। এই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য দিক হোল মুসলমান পটুয়াদের পেশার ও নামের পরিবর্তন হিন্দু পটুয়াদের পদবীর পরিবর্তন যেমন পাল মালাকার প্রভৃতি আর উভয় অংশের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহের ব্যাপ্তি। শিক্ষা ব্যক্তির মনে আত্মবিশ্বাস এনে দিচ্ছে এবং তারই ফলে দোদুল্যমানতার (cultural oscillation) মনোভাব কমে যাচ্ছে।

ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণ (acculturation) প্রক্রিয়ায় বহু আদিবাসী গোষ্ঠি যে ভাবে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত (Hinduisation) হয়েছেন। সেই ভাবেই পরবর্তী ধাপে ইসলামীকরণ (Islamization) ঘটেছে। পটুয়া সমাজ সংগঠন বিশ্লেষণ করে এবং জোলা, বাজিকর, কোড়া ইত্যাদি কয়েকটি ছোট ছোট গোষ্ঠি সম্পর্কে যে সামান্য অনুশীলন করেছি তাতে আমার এই অনুমান আরও দৃঢ় হয়েছে। বিহার বাংলা সীমান্ত অঞ্চলে অনেক বৃদ্ধ হিন্দু বলেছেন যে পটুয়াদেরকে আগে আমরা পাহাড়ী মাল বলতাম। এখনও পটুয়াদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে অস্পষ্টভাবে মাল পাহাড়ীয়া সংস্কৃতির কিছু কিছু চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে অনুমান করা যায় যে সম্ভবতঃ সুদূর অতীতে পটুয়ারা মাল পাহাড়ীয়া অঞ্চল থেকে বিভিন্ন দিকে যাযাবরের মত ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করে হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রবেশ করে (অবশ্যই এই সম্পর্কে সিদ্ধান্তে আসার পূর্বে আরও ব্যাপক ও গভীর অনুসন্ধানের প্রয়োজন)। থাকে থাকে বিভক্ত হিন্দু সমাজের একেবারে

তলার দিকেই তাঁদেরকে থাকতে হয়। কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাঙ্গীকরণ (assimilation) ঘটে যাবার পূর্ব্বেই তাঁরা মুসলমানদের সংস্পর্শে আসেন ও ইসলামী রীতিনীতি ধীরে ধীরে গ্রহণ করতে থাকেন। স্বাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়া অতি দীর্ঘকাল থেকে চলে এবং ধীরে ধীরে নিম্নমানের সংস্কৃতি উন্নততর সংস্কৃতির বা ক্ষমতাবান জাতির সংস্কৃতির মধ্যে বিলীন হয়ে যায়। পটুয়াদের ক্ষেত্রে এই প্রক্রিয়া আরও বিলম্বিত লয়ে ঘটতে থাকল কারণ। হিন্দু সমাজের মধ্যে তারা অনেকখানি প্রবেশ করে। বিশেষ করে অর্থনৈতিক দিক থেকে হিন্দু সমাজে তাঁদের বাজার অনেক ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল, ফলে নবাবী আমলে বেশী ক্ষমতাশালী মুসলমান সমাজে প্রবেশ করলেও পটুয়ারা হিন্দুদের বাজার ছাড়তে পারলেন না। ইতিমধ্যে নবাবী আমল শেষ হয়ে যায়। ফলে মুসলমান রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও শেষ যায়। হিন্দু সমাজে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করাও আর সম্ভব হল না। এই অবস্থায় পটুয়ারা দীর্ঘকাল না-হিন্দু, না-মুসলমান পর্যায়েই থেকে গেল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রাক্‌কালে হিন্দু মুসলমানের বিরাট দাঙ্গার সময় আত্মরক্ষার প্রশ্নটি আবার প্রবলভাবে দেখা দেয় তখন থেকেই এটা তাঁদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে ভারতবর্ষ হিন্দুপ্রধান রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে। তখন এঁরা হিন্দু সমাজে মিশে যাওয়াই আত্মরক্ষার পক্ষে লাভজনক মনে করেন এবং হিন্দু সমাজীকরণ (Hinduisation) আন্দোলন সুরু হয়।

স্বাধীনতার পর কালক্রমে দেখা গেল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে ভারতবর্ষে সংখ্যালঘুদেরও রাজনৈতিক রক্ষাকবচ রয়েছে অতএব মুসলমান হলেও নিরাপত্তার অভাব হবে না। বৃত্তির দিক থেকেও হিন্দু সমাজের উপর আর নির্ভর করা চলে না। এই অবস্থায় হিন্দু সমাজে থাকার অর্থ হল নীচু জাতি হিসেবে থাকা এবং অস্পৃশ্যতা জনিত সামাজিক পীড়ন ভোগ করা। হিন্দু সমাজীকরণ আন্দোলন অথবা হিন্দু আচার নিয়ম ইত্যাদি দীর্ঘকাল পালন করা সত্বেও হিন্দু সমাজে প্রবেশের বাধা দূর হয় না। যেমন তাঁদের কোন কাজে হিন্দু পুরোহিতরা আসেন না। কেউ মারা গেলে হিন্দুদের মধ্যে ছোঁয়াছুয়ির ব্যাপারেও প্রবল বাধা। অথচ এই সমস্ত ছোট ছোট গোষ্ঠির একটি গ্রামে বাস খুব কম। চার পাঁচ এমন কি একঘর পটুয়ার বাস আছে এমন গ্রামের সংখ্যাই বেশী। পনর কুড়ি ঘর বাস মাত্র তিন চারটি গ্রামে। মৃতদেহ সৎকারের কাজে বহু লোকের সহায়তা দরকার। "হিন্দুরা কখনো কখনো ভাল মন্দর খোঁজ খবর করলেও কেউ মারা গেলে আমাদের বাড়ীতে ঢোকে না। মুসলমানরা এ সময়ে আমাদের খুব সাহায্য করেন কারণ তাঁদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ির বাধা নেই।" এই মন্তব্য আমাকে

গ্রামের পর গ্রামে ঘুরতে হয়েছে। আমার উপস্থিতকালে কানাচী গ্রামের ফড়িং পটুয়ার মৃত্যু হয় রামপুরহাট হাসপাতালে। মৃতদেহ সেখান থেকে বহন করে আনার সময় হিন্দুরা তাঁদের গ্রামের মধ্য দিয়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যেতে আপত্তি করেন। ফলে বৃষ্টির মধ্যে গ্রামের বাইরে মাঠের মধ্য দিয়ে নিয়ে আসতে হয় (রামপুরহাট থেকে কানাচীর দূরত্ব মেঠো পথে আট মাইলের কম নয়)। স্থানীয় মুসলমানেরা উপস্থিত থেকে সৎকার কার্যে সহায়তা করেন। ছুৎমার্গ না থাকায় মুসলমান সমাজে প্রবেশের এই সুবিধা ছাড়াও মসজিদে সকল মুসলমানের সমান অধিকার ও মর্যাদা এই সকল হিন্দু সমাজের অবজ্ঞাত ও অবহেলিত তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতিদের বহল পরিমানে আকৃষ্ট করে। এরই ফলে দেখতে পাই দীর্ঘদিন হিন্দু ও ইসলাম সংস্কৃতির মধ্যে নিরাপত্তার আশায় দোদুল্যমান অবস্থায় থাকার পর ইদানীংকালে পটুয়া সমাজের অধিকাংশই ইসলাম ধর্মের আশ্রয়ই দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে গ্রহণ করছেন। সামান্য কয়েকঘর মাত্র যাঁরা হিন্দু সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাঁদের জীবিকার নিশ্চিত আশ্বাস পেয়েছেন (যেমন কালীঘাটের পটুয়ারা, বীরভূমের অনন্ত মালাকার) তাঁরা হিন্দুয়ানী ত্যাগ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। অনুসন্ধানের ফলে দেখতে পেয়েছি বীরভূমের পটুয়াদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনেরও বেশী শেষ পর্যন্ত ইসলামের আশ্রয়েই সামাজিক নিরাপত্তা খুঁজে পাচ্ছেন।

ভারতীয় প্রতি সেন্সাসে (১৮৮১-১৯৪১ ; ৭৫'১-৬৯'৭) দেখা যায় হিন্দু সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এই তথ্য এবং বর্তমান অনুসন্ধান থেকে অনুমান করা যায় যে ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্মের প্রসারের পিছনে ধর্মান্তকরণ (Prosolytezation) একমাত্র এবং প্রধান কারণও নয়। অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ দ্বারা উপর—নীচ স্তরে বিভক্ত হিন্দু সমাজে তথাকথিত নীচু জাতির উপর সামাজিক চাপের ফলে হিন্দু সমাজের একাংশ পাশাপাশি বসবাসকারী বৃহৎ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সাম্যের ও মর্যাদার আশায় মিশে গিয়েছে। ভাই, ধুলিয়া, তেলী, নাই, রাজপুত ধোবা, মনিহার, জোলা, মোমিন ইত্যাদি জাতিগুলি এককালে এই ভাবেই হিন্দু সমাজের নীচের স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে যে মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। এখানে খুব সঙ্গত ভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে জোলা, মোমিন, পটুয়া ইত্যাদি যাঁরা হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর থেকে গিয়ে ইসলামকে গ্রহণ করলেন তাঁরা কি মুসলমান সমাজে যে কোন মুসলমানের সঙ্গে সমমর্যাদার অধিকারী অথবা সামাজিকভাবে তাঁদের চলাচলে কোথাও কোন বাধা নেই। এর উত্তরে দেখতে পাই যে মুসলমানদের মধ্যেও সামাজিক মর্যাদার পার্থক্য অনুসারে

সৈয়দ, শেখ, মোবল, পাঠান, মোলা, মোমিন, পটুয়া ইত্যাদি উপর থেকে নীচে পর পর থাক বা স্তরভেদ আছে। বিশেষত হিন্দু সমাজের নিম্নস্তর থেকে যাঁরা মুসলমান হলেন তাঁরা মুসলমান সমাজেরও সেই নিম্নেই থেকে যান। যে কোন মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ খাওয়া দাওয়ার চল এদের মধ্যে অবাধ নয়। কিন্তু কেউই অচল অচল নয়, অস্পৃশ্য নয় এবং মসজিদে এঁদের সকলেরই মর্যাদা সমান। মৃত্যু হলে সকল মুসলমানই মৃতের কবরে মাটি দেন। ফলে দেখতে পাই যে আজকের পটুয়া সমাজ এবং ছোট ছোট তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুগোষ্ঠির সঙ্গে পাশাপাশি বসবাসকারী মুসলমান সমাজের সঙ্গে সামাজিক মিলন হিন্দুদের চেয়ে বেশী। এই সামাজিক মিলনের ফলেই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ ঘটছে এবং ধর্মান্তর ঘটেছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে পটুয়া ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ এবং ভারতবর্ষের নানা অঞ্চল থেকে না-হিন্দু না-মুসলমান স্তরের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর তথ্য এবং সংবাদ আমার কাছে আসছে ইসলামীকরণের সংবাদও পাচ্ছি। ভবিষ্যতে এই সব গোষ্ঠি সম্পর্কে পর্যালোচনা করার ইচ্ছে রইল।

পরিশিষ্ট—১

ওঁ নমঃ বিশ্বকর্ম্মণে

আমরা চিত্রকর জাতি হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত, হিন্দুসমাজে যত গুলি জাতি আছে তাহাদের মধ্যে চিত্রকর জাতিও একটি, হিন্দুসমাজে শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী যেমন ব্রাহ্মণের ঠাকুর দেবতার পুজা শাস্ত্রালোচনা, কুম্ভকারের হাঁড়ি কলসী নির্মাণ, স্বর্ণকারের অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাই পেশা, সেইরূপ চিত্রকর জাতিরও ঠাকুর দেবতার প্রতিমূর্তি নির্মাণ, নানাবিধ শিল্প ও চিত্রকার্য পেশা; চিত্রকর জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে দশম অধ্যায়ে একটি উপাখ্যান আছে, ব্রাহ্মণ বেনী ভগবান বিশ্বকর্মার ঔরষে গোপকন্যাবেনী ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে চিত্রকর জাতির আদিপুরুষের জন্ম, ব্রাহ্মণ বেনী বিশ্বকর্মার সন্তানরূপে জন্ম উল্লেখ করিয়া পুরাণ আমাদের চিত্রকর জাতিকে বিশেষ গৌরবান্বিত করিয়াছেন। গত দুই হাজার বৎসরের অধিক ধরিয়া চিত্রবিদ্যায় ও নানা সুকুমার শিল্পে হিন্দুজাতি যে বিশেষ উন্নতি দেখাইয়াছেন তাহার মূলে এই চিত্রকর জাতি, পরলোকগত বাংলার শ্রেষ্ঠ কবি ৺সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আমাদের চিত্রকর জাতির গৌরব গাহিয়াছেন, আমাদেরই কোন সুপটু

পটুয়ার লীলায়িত তুলিকায় অঙ্কিত চিত্র অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে অবশ্যই ; প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য যথা বাণভট্ট, মুদ্রারাক্ষস প্রভৃতি গ্রন্থে আমাদের চিত্রকর জাতির উল্লেখ পাওয়া যায়। হিন্দু জনসমাজে হিন্দু জনসাধারণের মধ্যে ধর্মভাব বজায় রাখিতে ও প্রসার করিতে আমাদের চিত্রকর সমাজ বিশেষ সাহায্য করিয়া আসিতেছে। ছবি আঁকা, নক্সা করা, সাজানো, সমাজের মনকে ধর্মের দিকে টানিয়া লওয়া, জীবনের সমস্ত উৎসবের দিক সুন্দর ও শোভন করিয়া তোলা আমাদের জাতির কার্য। এহেন চিত্রকর জাতি কোন এক কারণে হিন্দুসমাজ হইতে পৃথক হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ মতে চিত্রকর জাতি ব্রাহ্মণের নির্দিষ্ট চিত্রের নিয়ম ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন তাই ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দেন তাহাতে চিত্রকর সমাজ পতিত হন ও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যজমানত্ব হারান। মুসলমান রাজত্বের প্রথমে যখন সনাতন ধর্মের প্রভাব কমিয়া যায় তখন এই চিত্রকর জাতি নিজহাতে অঙ্কিত মনসামঙ্গল, সাবিত্রীব্রত, রামবনবাস প্রভৃতি পট দেখাইয়া সাধু সন্ন্যাসীর বেশে দ্বারে দ্বারে গান গাহিয়া হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইয়া রাখিয়াছিল। বাবু গুরু সদয় দত্ত প্রণীত পটুয়া সঙ্গীত পুস্তক পড়িলে ইহার ভাষ্যল্য প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমাদের হিন্দু সমাজের নব জাগরণের ফলে চিত্রকর জাতির মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পুরুষের গরিমাময় কৃতিত্ব স্মরণ করিয়া আমরা চিত্রকর জাতি হিন্দু সমাজে নিজেদের যোগ্য স্থান লইবার জন্য বদ্ধ পরিকর হইয়াছি এবং শুদ্ধি হইয়া ব্রাহ্মণ পুরোহিত দ্বারা নিজেদের পূজা শ্রাদ্ধাদি কার্য করিতে চাহি। এই জন্য সদাশয় হিন্দু জনসাধারণের নিকট ঐকান্তিক প্রার্থনা।

গত ১লা অগ্রহায়ণ হিন্দু মহাসভা কর্তৃক শুদ্ধি হইয়াছে। ২২শে অগ্রহায়ণ হরিদ্বারের নিকটবর্তী বড়িয়া গ্রামে ভারত সেবাশ্রম কর্তৃক কতকগুলি শুদ্ধি হইয়াছে। এবং মেদিনীপুর জেলায় আকুবপুর গ্রামে ১০ই অগ্রহায়ণ ভারত সেবাশ্রম, হিন্দুমহাসভা, আর্যসমাজ ও গ্রামের হিন্দু মহোদয়গণের সাহায্যে শুদ্ধি হইয়াছে। ২২শে অগ্রহায়ণ শিকুর গ্রাম হিন্দু জনগণের সাহায্যে শুদ্ধি হইয়াছে। আরো অন্যান্য কতকগুলি গ্রামে শুদ্ধি হইবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছে। এ বিষয় হিন্দুদিগের একবার লক্ষ্য করিয়া দেখা কর্তব্য, কারণ অনেকে এখন শুদ্ধি হয় নাই। তাহারা ধর্ম, জাতি ও নাম ভাঁড়াইয়া হিন্দুদিগের পবিত্র মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মন্দির অপবিত্র ও দেবদেবীর

মুক্তি গঠন করে। অতএব হিন্দুসহোদরগণ যদি এদিকে একটু কৃপাদৃষ্টি করেন তাহা হইলে ইহারা ধর্মের উপর এতদূর অনাচার করিতে পারেনা।

তাং ৩ইপৌষ
সন ১৩৫৩ সাল

বিনীত—রজনী কান্ত চিত্রকর
সাং আকুরপুর, পোঃ সুতাহাটা
জেলা মেদিনীপুর

পরিশিষ্ট—২

আগামী লোক গণনা ও চিত্রকর সমাজ

লোক-গণনা আরম্ভ হইয়াছে। আপনি কি নামে পরিচয় দিবেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকার চিত্রকরগণকে "বর্ণ হিন্দু" বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছেন তাহা আপনি জানেন কি? এই শুভ সুযোগ ছাড়িবেন না আপনি আচারে ব্যবহারে যাহাই থাকুন তাহাতে ক্ষতি নাই। কিন্তু সরকারী রেকর্ডে "বর্ণহিন্দু" বলিয়া নিজের নাম লিখাইয়া রাখুন। তাহাতে ভবিষ্যতে খুব মঙ্গল হইবে। এই সুযোগ এখন যদি গ্রহণ না করেন তবে চিত্রকর জাতির উন্নতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কাজ আরও দশ বৎসর পিছাইয়া পড়িবে। ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করুন! ভুল করিবেন না।

বিজ্ঞ চিত্রকরগণ অজ্ঞ চিত্রকরগণকে উক্ত বিষয় বুঝাইয়া দিন।

সূত্র

শুক্ল সময় দত্ত—পটুয়া সংগীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৩৯

Sir H. Risley—The people of India, 1915

L. S. S. O' Malley—The District Gazetteer of Birbhum, 1901

নির্মলকুমার বসু—হিন্দু সমাজের গঠন। বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ

Nirmal Kumar Bose—Hindu Methods of Tribal Absorption, 1942

T.C. Das—Assimilation, Integration ; Acculturation (Journal of Social Research, no. III. 1960)

Kingsley Davis—The Population of India and Pakistan, Princeton University, 1951

A. Mitra—Tribes and Castes of West Bengal Census, 1951)

Abdul Karim—Social History of the Muslims in Bengal (Down to A. D. 1538) Asiatic Society, East Pakistan, 1959

A. K. Nazmul Karim—Changing Society in India and Pakistan GeoffreyCumberlege, Oxford University Press, Pakistan, 1956

বিনয় ঘোষ—পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি। ১৯৬৭

বিনয় ভট্টাচার্য্য—The Marriage Customs among the Patuas of Birbhum. (Proc. Indian Science Congress, 1971)

Patuas – A study on Islamization
(59th proceedings of Indian Science Congress, 1972)

লোক কথায় পটুয়া জাতির উৎস। (লোক সংস্কৃতি, ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৭৮

In Search of the Concept of Cultural Oscillation.
Seminer on 'Anthropology To day', 1972

[এই বিষয়ে যাঁদের সংগে আলোচনা করেছি তাঁদের নাম কৃতজ্ঞতার সংগে স্বীকার করছি।

অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু, অধ্যাপক দীনেন্দ্রনাথ বসু, স্বর্গত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ সুরজিৎ সিংহ]

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশনাল প্ল্যানিং

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
জয়শ্রী প্রকাশন ২০২ পৃষ্ঠা. মূল্য ৬৲

ন্যাশনাল প্ল্যানিং প্রবর্তনে সুভাষচন্দ্র কী করেছিলেন তার সম্পর্কে ধারণা এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। গ্রন্থকার মুখবন্ধে লিখেছেন "ব্যক্তি জীবনে তিনি গান্ধীজী বা তাঁর ভক্তদের তুলনায় কম আধ্যাত্মিক মানুষ ছিলেন না কিন্তু জাতীয় জীবনের পক্ষে ঐহিক সমৃদ্ধির প্রয়োজনকে তিনি কখনো অগ্রাহ্য করতে পারেননি।" চরকা, গোরুর গাড়ি, বৈদিক তাঁত ও প্রাচীন শাস্ত্রের আধ্যাত্মিকতার হাত হতে নিষ্কৃতি লাভের প্রয়োজন ও শিল্পায়ন সম্পর্কে সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় প্রত্যয় এখানে উপস্থাপিত করা হয়েছে, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গঠনের ইতিহাস, প্ল্যানিং সম্পর্কে সুভাষ চন্দ্রের বক্তব্যের অপরেখা ও প্ল্যানিং আন্দোলনের ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় আমরা এখানে পাই, তার প্রতিক্রিয়া ও পরিণতি সম্পর্কেও মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। নেহেরুকে প্ল্যানিং এর পথপ্রবর্তক বলে যাঁরা তাঁর গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করেন এই বই পড়লে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নেহেরুর ভূমিকার মূল্যায়ন এই অতিকথার ওপর নির্ভর করে না।

নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

Form IV

Neme of Newspaper : ITIHAS
Language Bengali

1. Place of Publication 302 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta 9.

2. Periodicity Quarterly.

3. Printer's Name Shri Nalin Roy.
   Whether citizen of India Indian citizen
   Address Auto-Print & Publicity House, 49, Baldeopara Road, Calcutta-6.

4. Publisher's Name Shri Somendra Chandra Nandi
   Whether citizen of India Indian citizen
   Address 302 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta 9.

5. Editors' Name (1) Shri Ramesh Chandra Mazumdar, (2) Shri Narendra Krishna Sinha, (3) Shri Amalesh Tripathi.
   Whether citizens of India All Indian citizens.
   Address (1) Shri R. C. Mazumdar, 4 Bipin Pal Road, Calcutta 26 , (2) Shri Narendra Krishna Sinha, 85-A Ekdalia Road, Calcutta 19 (3) Shri Amalesh Tripathi, Govt. Housing Estate, Gariahat Road, Calcutta-19.

6. Name & Addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding more than 1% of the total capital Calcutta Historical .Society, 33/1 Amherst Street, Calcutta 9.

I, Somendra Chandra Nandi, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated
9.6.73

Signature of Publisher.
Somendra Chandra Nandi

The box office is just a tenth part of our activities

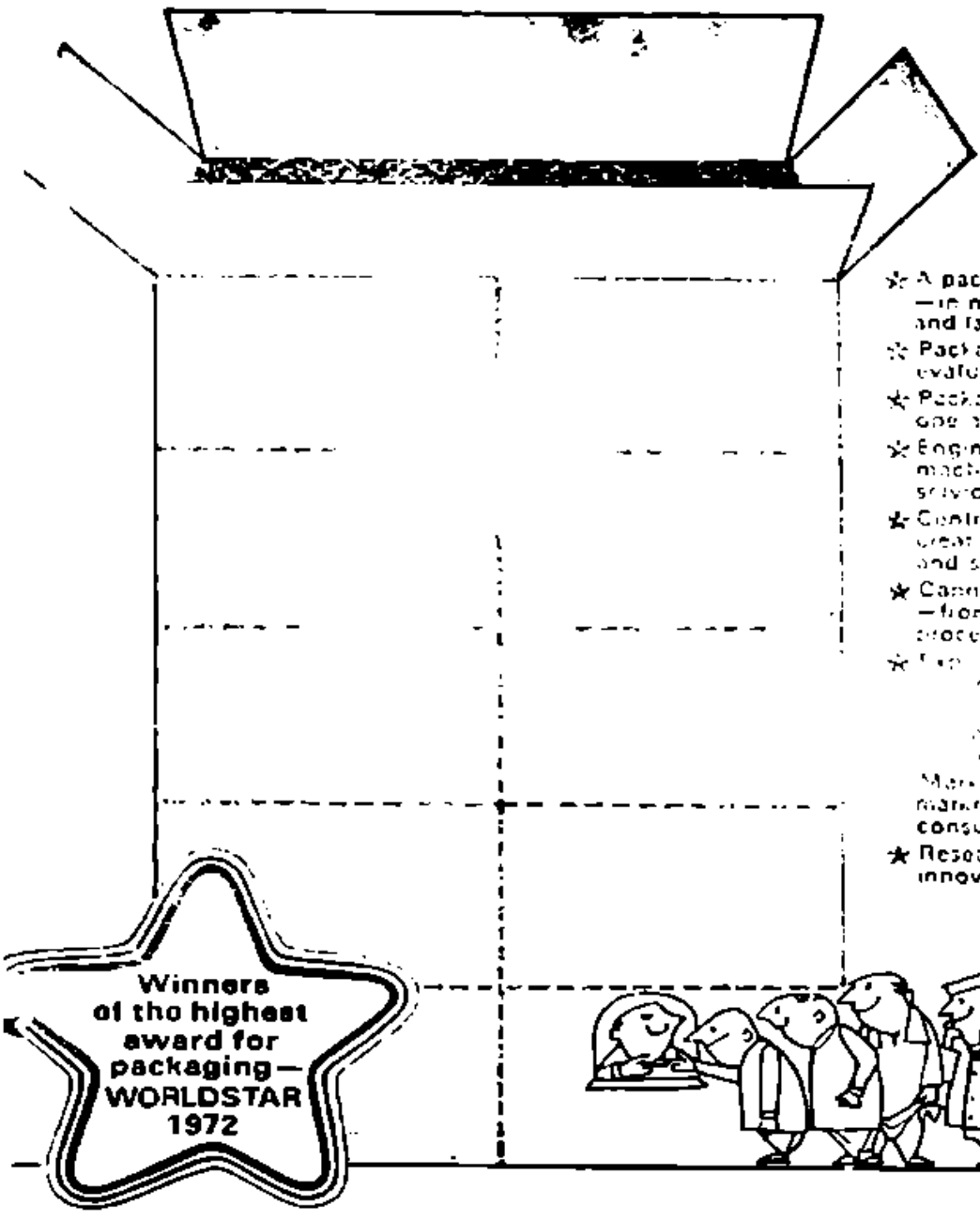

- ★ A package for every need — in metals, paper, plastics and laminates.
- ★ Package selection, development evaluation and testing.
- ★ Packaging machinery for operational efficiency.
- ★ Engineering services — from machinery adaptations to service engineering.
- ★ Central Design Service for creativity in packaging shapes and surface designs.
- ★ Canning Advisory Service — from cannery layouts to process control.
- ★ Experimental Kitchen for canning concepts.
- ★ Advisory Service on product formulations and facilities.
- ★ Marketing Services — from market intelligence to consultancy.
- ★ Research & Development for innovations in packaging.

Winners of the highest award for packaging — WORLDSTAR 1972

things are happening at Metal Box

—much more than metal boxes